# জগদীশ সুন্দর গল্প

সম্পাদক : সুধীর রায়চৌধুরী

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯

## সূচিপত্র

## দিবসের শেষে

রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার—বাড়ির পুবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে,—গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে-সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে, দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ শিরশির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না, কিন্তু এই এতো বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই—তার চোখ-কান এ-সব দেখিতে শুনতে শেখে নাই। সে যে চাক্‌রান জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান, রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইতো না, এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কিন্তু লোকে সে-কথা বিশ্বাস করে। দু-ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আম-কাঁঠালের কালে আম-কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারানী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এতো করিয়াও নারানীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে-যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ এক সময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে—তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারানীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই—এম্‌নি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে-কথাটি বলিয়া বসিলো তাহা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য। নারানী তাহাকে হাত ধরিয়া খেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল—নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলো, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

নারানী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলো, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

'কী ক'রে জানলি?'

পাঁচু বলিলো, 'তা জানিনে।'

ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারানী প্রথমটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেলো। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলিয়াছে;—একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল; আর-একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে, পাগল ছেলে!

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিলো। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেলো তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্‌শির কথাটা, অধর বক্‌শি সে-বার নৌকা যাত্রা করিবার ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যা-বেলায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল,—প্রাঙ্গণে লাফাইয়া-লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলই চিৎকার করিয়াছিল—ও কে? ও কে? ···সে-দিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতো আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সে-দিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,—'রতি, রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।'

কথাটা বর্ণে-বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোর কণ্ঠে শাসন করিয়া দিলো, 'খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আন্‌বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।'

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ—নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল ছল শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই।—এই নদী, কামদা, তার দুই তীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী—চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লি-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিলো, 'আয়, নেয়ে আসি।'

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলো; মায়ের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'আমি আজ নাইবো না, মা।'

'কেন রে?'

'ভয় করছে।'

নারানী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলো, 'পাঁচু নাইবে না আজ।'

রতি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'কেন, কী হয়েছে?'

'হয়নি কিছু।'

'তবে?'

'নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।'

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিলো, 'না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতোজনে হাসলে।'

গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে-ঘষিতে রতি পাঁচুগোপালের উদ্ভট উক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে তো হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমির? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কী হইতে পারে! চৌধুরী বাবু বলিয়াছিলেন, 'না কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস্; কুমিরে যদি নেয় তো তোকেই নেবে—'

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, 'বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক হবে।'

হলধর রাজবংশীবাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল ; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল, 'রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ ? তাতে আবার জেতে নাপিত !'

ইত্যাদি বিরক্তিকর বিদ্রূপে মনে-মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বক্‌শির এই শ্রেণীর ভুলের দরুন সদ্য-সদ্য নিধনপ্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সংকল্প করিয়া রতি বাড়ি আসিয়াছিল।

নারানী পাঁচুকে বলিলো, 'যাও, বাবা, নেয়ে এসো। সঙ্গে বড়ো একটা মানুষ যাচ্ছে—ভয় কিসের ?' বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিলো। মনে-মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিলো।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছটফট করিতো, আজ সে দাঁড়াইয়া নির্বিবাদে তেল মাখিলো, এবং বাপের গামছাখানা হাতে করিয়া তার পিছন-পিছন ঘাটে আসিলো।

স্নানার্থিগণের উঠা-নামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল—তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিলো। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে।···দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতো বড়ো একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না ; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। —এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কতো হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে ! ···রতি শিহরিয়া উঠিলো। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলো—নদীর নিষ্কম্প বক্ষে একটি বুদ্‌বুদও কোথাও নাই।···ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দুটি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌-প্রান্তে মিশিয়াছে—সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতোন ! প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া দূর-দূরান্তে স্থানে-স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।—নদীর দুই তীর নির্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিলো।···

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'ওটা কী ?'

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল—একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুশ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিলো, 'শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।'

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন, বাবা ?

'খাবে ব'লে'। ওরা বড়ো রুই-কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিলো না—জলের ভিতর তো অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায় ?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেলো। তখন তাহার মনে পড়িলো, কামদায় কুমির ভাসিতে এ-গ্রামের কেহ কখনো দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখনও পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের ?

ঝপ্‌ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিলো ; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইলো এবং একহাতে তার ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিলো, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইলো, তারপর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলো।

রতি আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে ?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি, বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো ?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'না'।

নারানী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারানী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলো। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে-ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারানীর চোখে পড়িলো তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নাই। নারানী গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেলো। হাঁকিলো, 'পাঁচু ?'

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধহয় এক দৌড়ে বাড়ি যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ির সীমানার বাহিরে যাইতে

পারে নাই। মায়ের ডাক শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়োসড়োভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্তি দেখিয়া নারানীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিলো।

ব্যাপার এই—

নারানী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা ছোটো একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইয়াছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার ঠিক পদ্ধতিটা জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ়রসে সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধুলায় গড়াগড়িও দিয়াছে; কাজেই ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা।

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলো।

পাঁচু মার খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেলো—এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদে এবং নারানীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেলো। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা তেম্‌নি তার—হয়েছে কী?'

নারানী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো!'—বলিয়া সে এম্‌নিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা হ'লে তো হবে?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিলো—সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিলো।··· রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা আমার ঘট?'

উভয়েই ফিরিয়া দেখিলো, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিলো, 'নিয়ে আসি, বাবা?'

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই

একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো। ...মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে-দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিলো।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।...জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।

কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।

## 'পয়োমুখম্'

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে; কিন্তু কলাপই বলুন, মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমনি ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।...মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।...

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আরম্ভে একটু বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

...সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তার নিজের অলঙ্কারের কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্তু হইয়া উঠে নাই।—

তা না হোক...

মেধা মানবজাতির পৈতৃক সম্পত্তি নয়; আর, ভগবান গৃহবিবাদে শালিশি করিতেও বসেন নাই যে, মামলা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির

তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! কিন্তু মেধা না থাকার পিছ্‌টানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আর হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশি বলা হয় না।

...তাই ষোলো-সতেরো বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই—সম্মত হইয়াছে।

শুভস্য শীঘ্রম্—

সেই দিনই কাঠের সিন্দুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুগ্ধবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দুখানাকে চিনিতো—

তাহাদিগকে উঠানের রৌদ্রে পিঁড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুশি হইলো না।—

...বই দুখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফশ করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিলো, তার মান কেহ রাখিলো না। ·

কথাটা কানে যাইবার পর কৃষ্ণকান্ত বক্রদৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—ভূতনাথ সরিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।...

এবং সে অবসর তখনই মিলিলো।...

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে দেখছি—ঠিক সেই রকম।'—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন, 'কী রকম?'

'এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—'

'কে?'

'কোনো গেরস্ত। একটা গল্প বলছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আনতে। দোকানি দিলে; ছোঁড়া গুনে বললে, "মোটে পাঁচখানা?" দোকানি খেপে উঠে বললে, "পাঁচখানা নয় তো কি পঁচিশখানা দেবে? ঘিয়ের দর জানিস্ আজকাল?"...ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে চ'লে এলো।... বাড়িতে বললে, "কীরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা এনেছিস্ এক পয়সায়?" ছোঁড়া বল্লে, "তাই দিলে, মা। বল্লুম, তা দোকানি তেড়ে উঠলো;" বললে, "ঘিয়ের দর জানিস আজকাল?"...শুনে গিন্নির হাত গালে উঠে গেলো; অবাক হ'য়ে

বললেন, "কী বজ্জাত দোকানি গো! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কী!…" বলিয়া তুমুল শব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 'তোমার ভুতোর বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মতো, কার্য-কারণ সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।'

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতার উদ্দেশ্যে স্বামীর এই বিদ্রূপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, 'কী, করেছে কী?'

'বলছে, পড়বো কোবরেজি, তাতে ব্যাকরণের কী দরকার?'

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন, 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যাঁটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত… ব্যাকরণের পর সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি, তারপর শাস্ত্র—'

ভূতনাথ মনে মনে বলিলো,—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন—ভূতনাথের কচুর কথাটা টেরও পাইলেন না; বলিতে লাগিলেন, 'কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে ব্যকরণে ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে দরকার।' ইত্যাদি।

দরকারি কথার কতো ভাগের কতো ভাগ তার কানে গেলো তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিতে পারিলো না।—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া ছিলো, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ বন্ধ হইতেই সেদিককার কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেলো।…

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছের পাতা, ও-গাছের মূল, এটার ছাল, ওটার কুঁড়ি, এই নিয়ে তো কোবরেজের কারবার; তা করতে মুগ্ধবোধ প'ড়ে কী হবে?—বলিতে-বলিতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তার সর্বশরীরে প্রকাশ পায়।

মাতঙ্গিনী বলিলেন, 'আমি তো কিছু জানিনে রে।'…

যাহা হউক, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিলো;—এবং পবিত্র শাস্ত্রসৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সে জীবনের এমন একটা দরকারি কাজ শেষ করিয়া আনিলো যাহার ফল-প্রতিফল দুটোই নিরেট। …দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্বণের চাইতে তা ঢের সংক্ষিপ্ত ও সরস,—

উদ্দেশ্যও উচ্চদরের—

শুধু সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথায় নরকনিবারক পুত্রলাভ।…ভূতনাথ বিবাহ করিলো; তখন তাহার বয়স সতেরো বৎসর কয়েকমাস মাত্র—

স্ত্রী মণিমালিকা ন-বছরের—

পণ সর্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতোগুলি টাকা আদায় হয় না···

বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন···বৈবাহিক মহলে প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রীগোলক-কৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র···ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে।···আরো বলিলেন,—দু-তিনটি পাশকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ-বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্বেদের দিকে দেশের নাড়ির টান যথার্থই ফিরিয়াছে; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না; দু-তিন বছরেই—ইত্যাদি।··

তাই সাতশত টাকা পণ।

কৃষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত, রসায়ন, অরিষ্ট, আসব···বিবিধ রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। কৃষ্ণকান্ত কাছে-কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান, তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান।···পথে আসিতে-আসিতে বুঝাইয়া দেন—রোগলক্ষণ; কোন রসাধিক্য কোন রোগের হেতু, কী ভাবে তার বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি।···পিত্ত শ্লেষ্মা বায়ুর কোনটা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কী ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।···এমনি সব ভুয়োদর্শনের কথা।

ভূতনাথ গাছ-গাছড়া, ফল-মূল কিছু-কিছু চিনিয়াছে; তাহাদের গুণাবলি ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের সঙ্গেও কিছু-কিছু পরিচয় ঘটিতেছে।

মণি ছোট্টোটি

স্বামীর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে রাগায়, কাঁদায়, আবার খিলখিল করিয়া হাসায়ও।···মাঝে-মাঝে মণি যখন বাপের বাড়ির কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সদুপদেশও দেয়; বলে, 'এই তোমার আপন বাড়ি—'

কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতোটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না;—বলে, 'ধেৎ। এ তো তোমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়ি—'

ভূতনাথ বলে, 'তা বটে। কিন্তু তুমি যখন বড়ো হবে তখন বুঝবে, সে-বাড়ি তোমার দাদা-বৌদির, এই বাড়িই তোমার ; তারপর ছেলেপিলে হ'লে—'

মণি এবার লজ্জা পাইয়া হাসে···

বলে, 'ধেৎ।'

মণির দুবারকার দুটি ভৎ'সনায় কতো তফাৎ ভূতনাথ তা বোঝে— খুশি হইয়া উঠিয়া যায়।

ভূতনাথের ছোটো ভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'তুমি বৌদি না ছাই।' বলিয়া বুড়ো আঙুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে, 'বললুম দুটো আম ছাড়াও, নুন-লঙ্কা মেখে খাই ; তখন কথাই কওয়া হ'লো না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়াগের হাসি হচ্ছে। এই বয়সেই শিখেছো ঢের!'

মণির কিন্তু মনেও আসে না যে, এই বয়সে দেবনাথও শিখিয়াছে ঢের!

'বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছিগে।' বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণির জ্বর হইল।

উজ্জ্বল মণি ম্লান হইয়া গেলো।

কৃষ্ণকান্ত নাড়ি দেখিয়া বড়ি দিলেন ; তাহাতে জ্বর ছাড়িলো বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইলো না···

শেষ রাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দু-টার সময় মণির নাড়ি ছাড়িয়া গেলো। সিঁথিভরা সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলো।

মাতঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, 'হ্যাঁ গা, এক ফোঁটা ওষুধও তো দিলে না···'

কৃষ্ণকান্ত বড়ো বিজ্ঞ ; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'দিলেও ফল হ'তো না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি।'

আয়ুর্বেদের এই চরম দিব্যদৃষ্টির বিষয় মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকান্তের এতো দিনের স্ত্রী হইয়াও বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছিবার নয়।

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মতো অনুক্ষণ সে পায়-পায় ঘুরিতো। সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন! মণির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিতো···এই ম্লান, এই উজ্জ্বল···পরক্ষণেই সে 'মা' বলিয়া ঘেঁষিয়া আসিতো।

মাতঙ্গিনীর বুক ফাট ফাট করে।

ভূতনাথও কাঁদিলো বিস্তর; কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মতো অসহ্য হইয়া রহিলো।

সংসারে শোকতাপ আছেই—

আবার 'ভগবদেচ্ছায়' মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে। দিন-দিন দূরত্ব বাড়িতে-বাড়িতে মণির শোক কৃষ্ণকান্তের 'ভগবদেচ্ছায়' গৃহ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলো।

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিলো।

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন, 'স্বয়ং শিব দুবার বিবাহ করিয়াছিলেন।' কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কিনা তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।

এবার পণ, পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা···কিছু লোকসান গেলো।

মণি মরিয়া পাত্র হিশাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে; বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—

কিন্তু বৌটি এবারে আরো ভালো···

চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে—

যেন 'বালার্কসিন্দুরশোভিত' উষা···সেইদিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর চোখের পলক পড়িতে চাহে না···অনুপমা শ্বশ্রূর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।

মাতঙ্গিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া যান·· যেন তাঁর চতুর্দিকেই খর রৌদ্র···তার ঝাঁঝে চক্ষু পীড়িত হইয়া ওঠে···তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারংবার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিলো।

তাই একদিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া মাতঙ্গিনী মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন ; কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়াইয়া গেলো।

বৌমার খাশকামরায় যাইয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'বৌমা, তোমার আর বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না বাপু।'

অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানিকে আর চোখের আড়াল করছিনে। কিন্তু বৌমা অন্তর্যামিনী নয়।

শাশুড়ির অভিলাষ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দুটি তুলিয়া সোজা মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিলো, এবং মাতঙ্গিনীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আহ্লাদ ঘূর্ণিবায়ুর মতো আবর্তিত হইতে-হইতে কোথায় যে মিলাইয়া গেলো তার চিহ্নও রহিলো না। সে দৃষ্টির অর্থ যে কী—প্রাণভরা কিন্তু অপ্রকাশিত আশার পরেই এ যে কতো কঠিন নিরাশ্বাস—উগ্র মনের কতোখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিষ্পলক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুত্তলি।

মাতঙ্গিনীর প্রাণ বধূর সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলো।

মাতঙ্গিনী শামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'কিছু মনে কোরো না মা ; তোমার মুখখানি—'

কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেলো।

একান্ত আপনার জ্ঞানে নূতন বধূর প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভরা সোহাগের আরো কতো কথা বলিবার ছিলো—

পাষাণী তাহা বলিতে দিলো না।

মাতঙ্গিনীর মনে হইল, আশাভঙ্গের এই ব্যথাটা তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবেন না···কিন্তু ভুলিলেন ; এবং ভুলিতে তাঁহাকে জন্মান্তরে পৌঁছিতে হইল না। দিন তিনেকের মধ্যেই তাঁহার মাতৃ-হৃদয় অজ্ঞান সন্তানের সুকঠিন অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদার অঙ্গনে বরণ করিয়া লইল।

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে। পিত্ত বায়ু

কফ—ইহাদের কোন্‌টার প্রাবল্য কোন্‌ নাড়িতে প্রকট হয় পিতার উপদেশে তাহাও যেন সে অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে।

কিন্তু অনুপমা নাক শিটকায়—

বলে, 'কোবরেজি প'ড়ে কী হবে শুনি?'

ভূতনাথ বলে, 'কোবরেজি তো আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে। পয়সাও—'

'তা জানি। কলকাতায় গিয়ে বসতে পারবে?'

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে। বলে, 'দেশেও তো বেশ পয়সা আছে।'

'আমাদের সেই বনমালী কোবরেজের মতো কোবরেজ হবে তো? তার তো নেংটি ঘোচে না। আমরা তাকে বলি বোকরেজ মশায়।' বলিয়া অনুপমা খিলখিল করিয়া হাসে।

ভূতনাথ মর্মাহত হয়।

কবিরাজিকে সে নিজেও বড়ো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। জঙ্গল কাটা আর শুকনো কাঁচা জঞ্জাল জড়ো করা কবিরাজি যে হালফ্যাশনের খুব বড়ো একটা গর্বের জিনিশ ইহাও সে মনে করে না। তবু কবিরাজই সে হইবে···অদৃষ্টের লিখন তাই।

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিরাজির প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া সে সত্যকার ক্লেশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মণি নয়—

অনুপমাকে ধমক দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।

অনুপমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে।···অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার নাম রেখেছিল কে?'

'বাবা রেখেছিলেন।'

'নামের মানে তো মহাদেব, নয়?' বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া যায়।

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তামালার মতো দন্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট—

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।

ঠিক সে ধরিতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের দুয়ারে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছায়—অন্তরের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মতো একটা ব্যথা ফোটে—কাহার প্রচ্ছন্ন কান্নার নিষ্ঠুর একটা কালো ছায়া বুক জুড়িয়া পড়ে—চারিদিক অশ্রু-কলঙ্কে মলিন হইয়া ওঠে।

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে। ধরা গলায় বলে, 'আসি এখন।'

অনুপমা বলে, 'দন্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছো বুঝি? তা এসো।'

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন।

তাঁর সর্বজ্ঞ মাতৃহৃদয়ের কাছে ভিতরের অনন্ত দুঃখের বার্তাটি ষোলো আনাই আসে—

মনটি তাঁর লুটাইয়া-লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে।

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিন্দুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি কোরো। ওঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।'

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই। হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 'এবার পাটে দু-হাজার টাকা মুনাফা হয়েছে।'

…তাঁর তখনকার তৃপ্তিটুকু উপভোগের জিনিশ।

দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলো। মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিয়া উঠিল, 'মণি বৌ-ই ছিলো ভালো। এ একটা কী এনেছো দাদাকে বিয়ে দিয়ে! ভুরু তুলেই আছে! দেমা—'।

কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকার চর্চা বন্ধ হইয়া গেলো।

পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তের মুনাফার টাকা পর বৎসরই ঐ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেলো।

অনুপমার জ্বর হইয়াছে—

জ্বর অল্পই।

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুঁড়িয়া, কিল ছুঁড়িয়া, কাঁদিয়া বায়না লইয়া, বাটি

আছড়াইয়া, ঔষধ পথ্য ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলো যেন লজ্জা-শরম আর সহিষ্ণুতা বলিয়া সংসারে কোনো জিনিশই নাই।…তাহার কাছে ধমক না খাইলো এমন লোক নাই। মাতঙ্গিনী পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন। ভূতনাথ চড় খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেলো। দেবনাথের দিকে তো সে পা তুলিলো।

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া জ্বর ছাড়িয়াছে। অনুপমা অন্নপথ্য করিয়াছে। কিন্তু সেই দিনই ভোররাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ তার ধাত বসিয়া গেলো।… অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিলো।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া। অনুপমা মরিলো, অজীর্ণ রোগের উপর জিদ্‌বশে অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থ করিয়া। মাতঙ্গিনী কাঁদিলেন, ভূতনাথ কাঁদিলো; দেবনাথও কাঁদিলো। কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারংবার চক্ষু মার্জনা করিয়া শোকচিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'বড়ো জেদি একগুঁয়ে মেয়ে ছিলো, ভাই'…

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইলো, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই। মণি তার যৌবনের সহচারী হইয়া উঠে নাই… সে ছিলো খেলার সামগ্রী, স্নেহের জিনিশ, মিষ্ট দৌরাত্ম্যের পাত্রী।

অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন-দিন অপর্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে-রক্তে দুর্নিবার জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।… অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে-দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতো…চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিতো তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মতো রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মতো যৌবন…তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের দিগন্ত পর্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে।

ভূতনাথের কলাপ মুগ্ধবোধ এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আলমারিতে যাইয়া উঠিয়াছে। …এখন সে পুরাপুরি একজন কবিরাজ।

কিন্তু বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন-দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন। এই ভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্জনার ভাব থাকিবে না—এ-ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।

স্ত্রীই হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেরা। একটির নিপাতেই সে-সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

আগেকারটা?—সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়!

…চলাচলম্ ইদং সর্বম্—মরিবে তো সবাই, দুদিন আগে দুদিন পরে। মূর্খ আর বলে কাকে! স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা! এই শৌখিন সন্ন্যাসের ভান আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক, তেমনি অসহ্য। মানুষ মরে বলিয়াই তো পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয়। নতুবা এতোদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত।

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিঃস্পৃহ।

ধিক্কারে, ভৎ'সনায়, অভিযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুনয়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন-ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

প্রত্যুত্তরে ভূতনাথ বলে, 'বাবা, আমায় মার্জনা করুন। বিবাহে আর আমার রুচি নাই। বরং দেবনাথকে ধরুন। সেই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ পূর্ণ করবে।'

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাহুল্য। কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার জানেন।…তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিয়া দেবনাথকে ধরিতে তাঁর আপাতত তেমন আগ্রহ নাই—নানা কারণে। দেবনাথের বিবাহের পরই ভূতনাথের বিবাহোদ্যম এ-ক্ষেত্রে সুক্ষ্মত দৃষ্টিকটু না হইলেও ভূতনাথই অবশেষে আপত্তির এই অতিরিক্ত কারণটা দেখাইয়া যখন-তখন বিরুদ্ধ দিকে জোর করিতে পারিবে।

তারপর, এই কারণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে। দুইটি স্ত্রী মারা গিয়াছে, তারপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ…বয়স বেশি না হইয়াই যায় না। এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো করিবার জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে।

সুতরাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।'

তারপর বলিলেন, 'এ তো নির্বোধেও জানে।'

দ্বিতীয়ত, ভূতনাথের গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য আজকাল ক্রমশই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এই বেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে।

তৃতীয়ত, শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য একটা ধর্ম হইলেও, সেইটাকেই জীবনে স্থায়ী করিয়া লইয়া প্রাণপণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ-ব্যবস্থা গো-মূর্খেও দিবে না।

চতুর্থত, যাক, উহারাই কি যথেষ্ট নহে?

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না।

যম তাঁহাকে দু-দুবার দাগা দিয়াছে।

তাঁর বধূ-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্ক্ষাটি সেই নিষ্ঠুর উপড়াইয়া লইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে—সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বন্ধুটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপে। নিজের ক্লেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন—সে বুঝি অসুখী হইবে।

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিলো, 'যা ইচ্ছে করুন।'

বলিয়া সে বোধহয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেলো।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিলো।

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিলো।

দু-দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দুটিকেই ঘরে তুলিলেন।

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।

বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দুটি আর ভ্রূযুগল। ভুরু দুটি টানা টানা। চক্ষু দুটি আবেশে ভরা।

মাতঙ্গিনীর নিজের সুখ-দুঃখ কোনোদিনই তাঁর অন্তরের একান্ত নিজস্ব জিনিশ হইয়া উঠিতে পারে নাই—জলের উপর পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেমনি করিয়া

মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ সংসার-পাথারের বুকের উপর ভাসিয়া বেড়ায়—পাথারে ঘা লাগিলেই তাঁর বুক দুলিয়া উঠে।

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না।

স্বামী তৃপ্ত হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অম্লানবদনে তাই তিনি বীণাপাণিকে তেমনি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন। এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিলো।

কৃষ্ণকান্ত বলেন, 'বৌ কেমন হয়েছো গো?'

মাতঙ্গিনী বলেন, 'লক্ষ্মীটি।'

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে—বিগত দুটির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই-নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। একটা গল্প তাঁর মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি···

কিন্তু গল্পটি তাঁর বলা হয় না—মাতঙ্গিনীর দীর্ঘ নিশ্বাসের ছোট্টো একটি অস্ফুট শব্দ তাঁর কানে আসে।

দেবনাথ বলে, 'এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দুটো ভালো ছিলো না।' একটু থামিয়া আবার বলে, 'প্রথমটা ছিলো নেহাৎ ছোটো, গরজ বুঝতো না। তার পরেরটা ছিলো বদমেজাজি। এইটে বেশ—'

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। বলেন, 'বেশ কিসে রে?'

'কথায়-বার্তায় আলাপে-আদরে বেশ।'

শুনিয়া, প্রখর মধ্যাহ্নের উপর মেঘের চঞ্চল ছায়ার মতো, মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর দিয়া কিসের একটা সুশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চমকিয়া ওঠেন। সারা জীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্বেই তাহাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন—তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আজিও তেমনি জাগ্রত—মাতৃ-হৃদয়ের সে-ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই। প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে। কিন্তু এ যে কথায়-বার্তায় আলাপে-আদরে বেশ।

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইতো—

তার ঘোমটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতো।···

কতো খেলা, কতো আমোদ, কতো কৌতুক।···

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিতো, হঠাৎ দেখা দিতো। নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনায় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছটফট করিয়া বেড়াইত।

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে···ঝড়ের পর ঢেউ আপনি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্বে দুবার বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী দুটিই সুন্দরী ছিলো।

সে কালো।

মাতঙ্গিনী দুরু দুরু বুকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তাঁর মনের দুশ্চিন্তা মনেই পরিপাক পাইতে-পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। বলেন, 'সব জানো তো বৌমা, আগেকার কথা?'

বীণাপাণির বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে, 'জানি, মা।' তারপর মনে-মনে বলে, 'আমি যে কালো।'

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কী করিয়া টের পান বীণাপাণি তা জানে না। তার মুখচুম্বন করিয়া বলেন, 'মা আমার কালো। কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।'

এটা সান্ত্বনার কথা—

শাশুড়ির এই মমতাদ্র' ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে। হাত বাড়াইয়া শ্বশ্রূর পায়ের ধুলা লইয়া বলে, 'তুমি ভেবো না, মা'···

মাতঙ্গিনী অবাক হইয়া যান

তাঁর লুক্কায়িত উদ্বেগ কী করিয়া বধূর কাছে ধরা পড়িলো!

আশীর্বাদ করেন, 'জন্ম এয়োতি হও।'

মণি শাশুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিতো—কতোক ভয়ে, কতোক কৌতুকে। মনের কথা সে বুঝিতো না। কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিলো, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইতো। মাতঙ্গিনী বকিয়া-ঝকিয়া পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন। মণিকে তিনি আপন-পেটের অবোধ সন্তানের মতো ভালোবাসিয়াছিলেন।

অনুপমা প্রকাশ্যে একেবারে হাতে-কলমে পায়ে না ঠেলিলেও আমল প্রায়ই দিতো না। দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড়ো ছিলো না। তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালোবাসিয়াছিলেন—পুত্রের প্রিয়তম বলিয়া। অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, বধূকে পাইয়া পুত্র এক হিশাবে চরিতার্থ হইয়াছে।

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম—

অতিশয় শান্ত, অথচ এমন তীক্ষ্ণধী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না—কী করিয়া অতোটুকু মেয়ে তাঁর মনের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়!

মাতঙ্গিনী পরের হাতের সেবা কখনো পান নাই। সেবা কী মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন।

অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে।...এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই। জয়-পরাজয়ের শঙ্কার নিশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে—এ-বসা শুধু একটা রসঘন নির্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।

ভূতনাথের পশার হইয়াছে।

কিন্তু সব জিনিশেরই 'মূল্যাদি' অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সংসারের 'নাই নাই' রবটা যেন থামিয়াও থামে না।

মাঝে-মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মনি-অর্ডারে টাকা আসে। কে পাঠায়, কেন পাঠায় কে জানে! কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকানো রহিলো না।

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিলো—তাঁহার পরিবর্তে তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিলো না।—রোগ বড়ো কঠিন।

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাল্কিতে যাইয়া উঠলেন। এবং তাঁহার পাল্কিও দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলো, মনি-অর্ডারও আসিয়া পড়িলো।

বীণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা।

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়নকালেই স্থূল ছিলো। কিন্তু আজকাল অন্তত বহিরাবরণ ছিন্ন করিবার মতো ধারালো হইয়াছে। টাকা দশটি

পুরোভাগে রাখিয়া হুঁকায় দুটি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলো। রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে-মাসে জরিমানা দিতে হইতেছে।

এবং এই ব্যাপারের শুরুর সুদূর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিলো না—অপরাজিতাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ অহেরণ করিয়া আনিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে সংযত রাখিতেছেন।

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধীরে-ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল। কী হেতু অবলম্বন করিয়া এই অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা দুরূহ হেঁয়ালির মতো। অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য, যেন নিজেই তৈরি হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের পাল্কি অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিলো। এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্দরে না যাইয়া হাঁশফাঁশ করিতে-করিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই এমনভাবে থমকিয়া গেলেন যেন চুরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।

ভূতনাথের কোলের কাছেই দশটি টাকা সাজানো রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নামসংবলিত কুপনখানিও রহিয়াছে। তাহারাই এই মহৌষধির কাজ করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিলো, 'শ্বশুর আপনাকে দশটা টাকা পাঠিয়েছেন কেন?'

কৃষ্ণকান্ত প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন, তরতর করিয়া বলিয়া গেলেন, 'তোমাকে বোধহয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড়ো টানাটানি। তাই বুঝি তিনি মেয়ে-জামাইকে—'

বলিতে-বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অতো সুলভে নিষ্কৃতি পায় না।

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে-পদে তেমনি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেলো। তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যা কথাগুলির

বিনাশ কিন্তু অতো সহজে ঘটিলো না—তাদের ধ্বনি, আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতি মুহূর্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণবিবরে আবর্তিত হইতেই লাগিলো।

ভূতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না। ভূতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরামবাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্ট ভাষায় ধাপ্পাবাজ, অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পরে যাহা বলিয়াছেন তাহা, লাঠি উল্‌টাইয়া ধরিলে কোঁৎকার মতো, ঐ একই জিনিশ।

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন। জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যাদাতা পিতা সম্পর্কে হইলো বড়ো—আর তারই স্বার্থ হইলো বড়ো !— অমন ছেলের— ইত্যাদি। অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আওড়াইয়া দিলেন।

মূর্খ পুত্রের জন্মদাতার যতো কষ্ট সব সেই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

বীণাপাণির জ্বর।

জ্বর অল্প। কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বালিয়া উঠিয়াছে।...আকুলিবিকুলি কেবলই মধুসূদনকে ডাকিয়া-ডাকিয়া উৎকণ্ঠায়-উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে।

আর দুটি এমনি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষক দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে। মাতঙ্গিনী এতোক্ষণ তাহাকে কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন। তাহাকে পথ্য দিয়া এইমাত্র উঠিয়া গেছেন।

'বৌমা, কেমন আছো ?' বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলো, 'ভালোই আছি, বাবা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 'কিছু খেয়েছো ?'

'খেয়েছি।'

'কখন ?'

'এখুনি খেলাম।'

'তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো।' বলিতে-বলিতে কাপড়ের খুঁটের আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন, 'জ্বর যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড়ো কষ্ট পাবে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। এই খাটের পায়ার কাছেই রইলো কাগজ-ঢাকা। নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো।'

বীণাপাণি কহিলো, 'আচ্ছা।'

ভূতনাথ কোথায় ছিলো কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহির হইয়া যাইতেই সে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া রহিলো, 'বাবা এসেছিলেন দেখলাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন ?'

বীণাপাণি বলিলো, 'হ্যাঁ। কেন ?'

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিলো না।

'খাওনি তো ?'

বীণাপাণি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলো।···

এ ব্যাকুলতার অর্থ কী ?···বলিলো, 'না। কেন বলো না ?'

'কোথায় সে ওষুধ ?'

'খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দ্যাখো।'

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেলো।

কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুঝিয়া শটকা টানিতেছিলেন।

কিন্তু এ-সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিলো না।

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন— এমনি অপরিসীম ত্রাসে তাঁর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবী আর্তনাদ বাহির হইয়া কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিলো।

ভূতনাথ সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলো না। একটু হাসিয়া বলিলো, 'এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরলো না বাবা। পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।' বলিয়া সে ঔষধ সমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিলো।

## শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী

অনেক বাজে আপত্তি আর পরিহার্য ঝঞ্ঝাটের পর শশাঙ্কশেখর গুপ্ত পুনরায় বিবাহ করিলো।

শশাঙ্কের প্রথমা স্ত্রী ভোলাদাসী দেবী পিত্রালয়ে থাকিতেন—সেখানেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ভোলাদাসীর পরমায়ু যথার্থই শেষ হইয়াছিল, কি আরো কিছুদিন তিনি বাঁচিলে বাঁচিতে পারিতেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত; কিন্তু ভোলাদাসীর মা সে তর্ক তুলিতেই দিলেন না; তিনি বড়াই করিতে লাগিলেন ইহাই বলিয়া যে, 'মা আমার সতী-লক্ষ্মী ছিলো, ডাক্তারে তার গা ছুঁলে না।' শশাঙ্ক শ্বশ্রূঠাকুরানীর এই পরপুরুষস্পর্শদোষহীন অটুট সতীত্বের ধারণা সমর্থন করিলো না, করিলো অসহযোগ এবং শ্বশুরবাড়ির সংস্পর্শ অবিলম্বে একেবারেই ত্যাগ করিয়া বাজারে আসিয়া বসিলো—অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে থাকিয়া চাকুরির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় খুলিলো। শিব তাহাকে শক্তি দিলেন।

যদি স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জনের উপায় ছিলো তবে শশাঙ্ক চাকুরির চেষ্টা কেন করিতেছিল? কিংবা যদি চাকরির চেষ্টাই সে করিবে তবে পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া অতীব জটিল দুরধিগম্য আয়ুর্বেদশাস্ত্র সে আয়ত্ত করিয়াছিল কেন?

সে আলাদা কথা।

অবিলম্বেই দেখা গেলো, শশাঙ্ক কবিরাজের অত্রস্থ বন্ধুবর্গের মধ্যে দুইটি বিষয়ে একেবারে মতভেদ নাই:

প্রথমত, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে নূতন ও পুরাতন কঠিন রোগেও স্নিগ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধই যথার্থ ফলপ্রদ—উগ্রবীর্য বিলাতি ঔষধ নহে—

দ্বিতীয়ত, স্বয়ং মহাদেব রাবণকে যে স্বনামধন্য মোদক স্বহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই ক্ষুধাবর্ধক, আর, শশাঙ্ক কবিরাজের প্রস্তুত সেই মোদক বাজারের ছয় টাকা সেরের কৃত্রিম পানশে জিনিশ নহে।

ক্ষুধাবৃদ্ধির আনন্দে বসুধাকে কুটুম্বিতার চোখে দেখিতে-দেখিতে শশাঙ্ক কবিরাজের বিশেষ নিভৃত বন্ধু কার্তিক একদিন প্রস্তাব করিলো যে, নূতন কম্পজ্বরেও যখন কবিরাজের খোঁজ পড়িতেছে তখন আর ইতস্তত না করিয়া নূতন করিয়া সংসারপত্তন করা শশাঙ্কের উচিত।

ইহাতে শশাঙ্ক কলরব করিয়া খানিক হাসিলো···তারপর বলিলো—'বিয়ে

করতে আমার ষোলো আনা ইচ্ছে রয়েছে ; না করলে চলবেই না—খাবো কী ? আমার এই বয়সে কারো-কারো একবার বিয়েই হয় না···মোটে ছাব্বিশ চলছে ; কিন্তু গ্রহের কোপে আমাকে একবারের স্থলে দু'বার করতে হ'লো। কিন্তু—'

তারপর স্বর নামাইয়া বলিলো, 'বাস যে সর্পপুরীতে !'—

বলিয়া বহুপূর্বে কথিত কুপিত গ্রহের উদ্দেশে হাত তুলিয়া একটি প্রণাম ত্যাগ করিলো।

—'ঐ পক্ষের শ্বশুরদের কথা বলছো ?'

—'হ্যাঁগো। শ্বশুর বুড়ো বা পথে আছে, কিন্তু সম্বন্ধীটার সুপথ-কুপথ জ্ঞান নেই। খামোখাই বলে কিনা দেখে নেবো।···একদিন যাঁদের মা বলেছি বাবা বলেছি তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমি চাইনে—কিন্তু থাকতে হবে সাবধানে—আছিও তাই।' বলিয়া শশাঙ্ক সুচতুর মুখ বাড়াইয়া রাস্তার উজান-ভাঁটি দুটি দিক অতিশয় সাবধানতার সহিত দেখিয়া লইলো।

কার্তিক প্রশ্ন করিলো,—'গয়নাগুলো দিলে ?'

শশাঙ্ক চুপি-চুপি বলেলো, 'চেয়েছিলাম ব'লেই তো সম্বন্ধী···ও আলোচনা না-ই করলে। কিছুদিন যাক্ আপনিই দেবে।'

—'আর দিয়েছে !' বলিয়া পরম হিতৈষী কার্তিক নিরুদ্দেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলিয়া মুখ তিক্ত করিয়া তুলিলো।

শশাঙ্ক বলিলো,—'অম্বল হচ্ছে রোজ।'

—'হিঙ্গাষ্টক্ একমাত্রা খাও না কেন রোজ ?'

কবিরাজের প্রদত্ত জ্ঞানকণা কবিরাজের উপরেই প্রয়োগ করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কার্তিক কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলো···

তারপর বলিলো, 'হবে না ! রোজ সেদ্ধ পোড়া খেলে স্বয়ং ব্রহ্মার অম্বল হ'তে বাধ্য···তুমি তো তুমি !'

আয়ুর্বেদের সঙ্গে ব্রহ্মার কিছু সংশ্রব আছে—যথা, চতুর্মুখ (লাল), চতুর্মুখ (কালো)—ইহাই স্মরণ করিয়া শশাঙ্ক ব্রহ্মার উদ্দেশে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিলো।

কিছুক্ষণ ভক্তিভরে নিঃশব্দে থাকিবার পর বুকে একটু অম্বলের জ্বালা বাজিয়া শশাঙ্ক পুনরায় বলিলো, 'অম্বল হচ্ছে।'···বলিয়া পানীয়ের অভাবে ঢোঁক গিলিলো।

কার্তিক দৃঢ়স্বরে বলিলো, 'আমি যদি হতাম তবে বিয়ে, পেটেণ্ট ওষুধ আর ফৌজদারি একসঙ্গে লাগিয়ে দিতাম···'

শশাঙ্ক আর-একবার ঢোঁক গিলিতে যাইতেছিলো—চমকিয়া বলিলো, 'ফৌজদারি? কার সঙ্গে?'

'কার সঙ্গে আবার কি? আকাশ থেকে পড়লে যে! কার সঙ্গে! শ্বশুর আর শাশুড়ির সঙ্গে।...দিতাম দু-জনকে আসামী ক'রে এক নম্বর ঠুকে... দু-বৎসর শ্রীঘর।'...বলিয়া কার্তিক দুই হাত বাড়াইয়া একজোড়া কাল্পনিক লৌহ কপাট দুই বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিলো।

শশাঙ্ক ক্ষীণ স্বরে বলিলো, 'একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি—'

'আর তাঁরা প্রাণপণে কান ম'লে তেল নিংড়েছেন...তাদের সঙ্গে মামলা, গোলমাল! ছিঃ!...অসহ্য, নয়?...খেতে দিতো ভালো ক'রে?'

অসহ্য বিদ্রূপের ভঙ্গিতে এই কথাগুলি বলিয়া কার্তিক মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের ভাণ্ডের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলো—যেন ভাঁড়ের গায়ের সবুজ রঙের অক্ষরগুলি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্বশুরালয় অবস্থিত বলিয়া বৃহৎ শহরটাকে হিংস্র ও খলতাপূর্ণ সর্পপুরী কল্পনা করিলেও, অম্বলের জ্বালা এবং ষোলো আনা ইচ্ছার প্রভাব শশাঙ্ক কবিরাজের সর্পভীতি অপেক্ষা ক্রমশ প্রবলতর হইয়া উঠিলো...

তদুপরি শশাঙ্কের পিতা লিখিলেন—

'বাবা শশ,...একটি সুন্দরী বয়স্থা এবং রন্ধনকার্যে পারদর্শিনী কন্যার সন্ধান পাইয়াছি। তোমার মত পাইলে সেইস্থানে বিবাহ সুস্থির করিতে পারি। তোমার শরীর অসুস্থ লিখিয়াছো। কোথাও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে নিষেধ করিয়াছো; কারণ এখন অর্থাৎ অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিবার পূর্বে বিবাহ করিলে অপর পক্ষের আক্রোশই জন্মিবে এবং অলঙ্কারগুলি আদায় করা আরও কঠিন হইবে লিখিয়াছো; কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ইহাই যে শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। অতএব আমার মতে শরীর সুস্থ রাখিয়া অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিধেয়।...'

আরো ছিলো—

'এবারকার কুটুম্ব মনের মতো হইবে; কন্যার পিতাও কবিরাজ—তাঁহার ঔষধের ভাণ্ডার প্রচুর...'ইত্যাদি অনেক সংবাদ পত্রে ছিলো...কিন্তু কার্তিক ঐ পর্যন্ত পড়িয়াই লাফাইতে লাগিলো...।

তারপর অলঙ্কার সম্পর্কে শশাঙ্কের আভ্যন্তরিক চতুরতা স্মরণ করিয়া সে অল্প-অল্প হাসিতে লাগিলো...

বলিলো, 'তুমি "ডুবে ডুবে" জল খাও।'

শশাঙ্ক বলিলো, '—যাঃ।'

'—যাঁদের মা বলেছো, বাবা বলেছো, তাঁদের ক্ষুণ্ণ না-ই করলে।'

শশাঙ্ক আলস্যের সহিত বলিলো, 'সে পরের কথা।'

বিবাহ হইয়া গেলো—

—এবং বিবাহের পরই শশাঙ্কের আর সবুর সহিলো না—স্ত্রীকে আনিয়া সে খাঁচায় পুরিলো।

শশাঙ্ক কবিরাজের এই ছ-টাকা ভাড়ার প্রবাস—গৃহ বড়োই সঙ্কীর্ণ। ছ-ফুট লম্বা আর সাড়ে চার ফুট চওড়া রাস্তার ধারের ঘরটিতে সে ঔষধালয় করিয়াছে; কাচের আলমারি দু-টি, চেয়ার একখানি, বেঞ্চি একখানি লইয়া তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ। এই ঘরের সম্মুখে দরজা নাই—শিক গাঁথা ফটক আছে। ঔষধালয়ের পরের কক্ষটি শয়নকক্ষ; কিন্তু ঔষধালয় হইতে ভিতরে মানুষ আর বায়ুর অবাধ যাতায়াতের পথের মুখে আলমারি চাপা দিতে হইয়াছে। শয়নকক্ষের আয়তন পূর্ববৎ। তারপর উঠান—ঐ দু-ফুট আর সাড়ে চার ফুট। রান্নাঘর আরো ছোটো। উঠানের পর যে প্রাচীর উঠান হইয়াছে তাহা টপকাইতে পারে এমন ডানপিটে দুর্লভ।

যাহা হউক, ইহা নিজের বাসা—পূর্ব পক্ষের পিতৃগৃহ নহে। ইহারই ভিতর স্ত্রীকে আনিয়া শশাঙ্ক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিলো···কিন্তু সে টের পায় না যে, স্থানস্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত তার স্ত্রী ইন্দিরার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

বন্ধুরা আসে যায়; ক্ষুধাবৃদ্ধির ঔষধ সেবন করে; আর শশাঙ্কের 'রন্ধনকার্যে পারদর্শিনী' স্ত্রীর হাতের রান্না খাইবার জন্য অশেষ লোলুপতা প্রকাশ করে······

শশাঙ্কের আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল একটি আপত্তি; বলে, 'ওঁদের চোখের সামনে উৎসব করা কি ঠিক হবে এখন।······একদিন যাঁদের মা বলেছি, বাবা বলেছি···'

বলিয়া ও-পাড়ার এক কন্যাশোকাভিভূত বৃদ্ধ দম্পতির ছবি মনে পড়িয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

কার্তিক বলে, 'তুমি ন্যাকা আর ধূর্ত।'

শশাঙ্ক নির্লিপ্ত ভাবে বলে, 'সে কথা হচ্ছে না।'

সতীশ বলে, 'তুমি উৎসব গোপনে করো···ঢাক-ঢোল না-ই-বা বাজলো তাঁদের চোখের সামনে।'

শশাঙ্ক বলে, 'না আমি তা বলি নাই।'

নবকুমার বলে, 'তাঁরা তো কন্যার শোকে উৎসব বন্ধ রাখেন নাই। সেদিনও নবান্ন করলেন—ঘটাটা দেখলাম।'

কার্তিক নিন্দা করিতে পাইলে ছাড়ে না; বলিলো, 'বাড়িতে শুনলাম, থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেদিন কী ঝগড়া! কে নাকি বলেছিল, মেয়েটা ম'লো, কিন্তু চিকিৎসা হ'লো না। তোমার শাশুড়ি ঠাকরুন তাতে বললেন, সে মেয়ে সতী ছিলো; সতীর দেমাক নিয়ে সে মরেছে।...তোদের মতো?...যাক্—তারপর গোলমালে থিয়েটার ভেঙে যায় দেখে শেষে পুলিশ এসে থামায়।...যতো চক্ষুলজ্জা তোমার!' বলিয়া যথোচিত অবজ্ঞাভরে কার্তিক অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলো।

শুনিয়া শশাঙ্ক কবিরাজের ধর্মে মতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়;

বলে, 'ভাই, আমার ধর্ম আমার আছে।'

কার্তিক বলে, 'হুঁ'।

কার্তিক শুনাইতে চাহিলেও শশাঙ্ক সে-কথা কানে তোলে না; বলে, 'সে উদার ছিলো কতো!...একদিন বললাম, তোমার হাত খরচের টাকা থেকে একটা টাকা দাও দিকি।...টাকা কেন চাইলাম তা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে না—অম্লান বদনে এনে দিলে।...আমি হেসে টাকা ফেরৎ দিলাম, বললাম, তোমার মন বুঝলাম। টাকা তুমি রাখো।...শুনে সেও হাসতে লাগলো।'

সতীশ না থামিয়া বলিলো, 'হাসির কথাই বটে।'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কেমন, উদার না অনুদার?'

—'ইনিও উদার; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।...ইনি বলেন, একদিন যাঁদের মা বলেছো, বাবা বলেছো, যাঁদের কন্যাকে ভালোবেসেছ, তাঁদের সঙ্গে-সামান্য-কয়েক ভরি সোনার দাবি নিয়ে ঝগড়া ক'রো না অশিক্ষিত লোকের মতো।...আমার অদৃষ্টে যদি সোনা পরা থাকে তবে অমনিই পরবো—আপনিই হবে। অদৃষ্টে যদি না থাকে তবে ও সোনা পেলেও আমার গায়ে থাকবে না...' বলিয়া এতো বড়ো শক্তিশালী অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে-শক্তি হস্তগত স্বর্ণের অঙ্গে থাকা নিবারণ করিতে পারে তাহার উদ্দেশে শশাঙ্ক কপালে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলো।

'—সে যাক্। সত্যিই খাওয়াবে কবে?—রান্নার খ্যাতি আরো ছড়ালে আরো উমেদার বাড়বে।'...বলিয়া নবকুমার শশাঙ্ক ব্যতীত আর দুজনের এবং নিজের গা ছুঁইয়া এক দুই করিয়া গণিয়া দেখিলো, সম্প্রতি তাহারা মাত্র তিনজন উমেদার।

এমনি কথা হইতে-হইতে শশাঙ্ক যেন হঠাৎ ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ

করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলো—এতো শীঘ্রই যে খাওয়াইতে পারিবে সে কল্পনা সে করে নাই…

ভগবানের উদ্দেশে হাত তুলিয়া সে বলিয়া উঠিলো, 'আচ্ছা পরশু।'

কার্তিক বলিল, 'আজ কী বার?'

—শুক্রবার।

—কাল?

—শনিবার।

—পরশু?

—রবিবার।

—তা হ'লে রবিবারে?

—হুঁ।

পরশু অর্থাৎ রবিবারে যথাসময়ে আসিয়া পড়িলো।

নিরামিষ রন্ধনেই শশাঙ্কের স্ত্রী বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া মিহি চালের ভাত আর অল্প-স্বল্প মৎস্য এবং নিরামিষ তরকারির বেশি আয়োজন হইয়াছে।

বাঃ, দিব্যি, অতি সুন্দর, উপাদেয়, চমৎকার, ইত্যাদি তুষ্টি এবং বিস্ময়সূচক ধ্বনির মধ্যে ভোজন সমাপ্ত হইলো…আঁচাইতে বসিয়াও সেই ধ্বনিই চলিতে লাগিলো…আঁচাইবার পর বসিবার ঘরে অর্থাৎ ঔষধালয়ে ফিরিবার পথেও সেই ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি চলিতে-চলিতে সকলের পশ্চাতে ছিলো সতীশ, সে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলো, শশাঙ্কের স্ত্রী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে—

মুখ অনাবৃত।

কেহ মুখ ফিরাইয়া চাহিবে ইহা ইন্দিরা ভাবিতে পারে নাই, চোখাচোখি হইতেই সে চক্ষু নত করিলো…

চোখ নামাইবার ভঙ্গিটি চমৎকার—তাহাতে নিষেধের অধিকার নামিয়া আসিলো না…সেই প্রস্ফুটিত শতদল একটি নিমেষের জন্য দলগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিলো মাত্র—

পূর্বগামীর পায়ের সঙ্গে নিজের পায়ের ঠোক্কর লাগিবার ভয়ে সতীশ পরক্ষণেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিলো…

আরাম করিতে আসনে বসিয়া নবকুমার বলিলো, 'খেলাম বটে, গুরু-ভোজনই হ'লো; কিন্তু এখন যেন কেমন একটা অরুচি লাগছে। তোমাদের রুচি কেমন তা জানিনে।'

শুনিয়া শশাঙ্ক মরণে মরিয়া গেলো; বলিলো, 'কী ত্রুটি হয়েছে, ভাই? অপরিষ্কার কিছু ছিলো কি?'

'তুমিই একটা মস্ত অপরিষ্কার! এখন দেখছি, হোটেলে খেয়ে এলাম। হোটেলের রসুয়ে-ঠাকুর রাঁধে ভালো—ব্যস্, এই পর্যন্ত!'

...অর্থাৎ কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি ঢ্যাঙা মিনশে কেন পরিবেশন করলে? এই কথায় শশাঙ্ক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলো...বলিলো, 'তা আমি বলি নাই ভেবেছো? নিশ্চয় বলেছি। কিন্তু সে বললে, আমি দিশে পাবো না, হাত কাঁপবে।'

'আচ্ছা আরেকদিন।' বলিয়া আহারের গুরুত্ববশত নবকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিলো...

'আমি খেয়ে আসি। তোমরা ততোক্ষণ—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্রাম করি। তুমি খেলে পর ওঁরা খাবেন। ঢের বেলা হ'য়ে গেছে—যাও।'.. বলিয়া কার্তিকও চক্ষু মুদ্রিত করিলো।

নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় শুইয়া বসিয়া ওরা কী ভাবিতে লাগিলো তাহা ওরাই জানে, কিন্তু সতীশের মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলো, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরা—ঠিকই যে শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রীরূপে তাহা নহে,—একটি নারীরূপে...

তার মনে হইতে লাগিলো, এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যারচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ-কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে ...এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে...

এ পথ দেয়, কিন্তু যে জ্যোতিঃপরিমণ্ডলের সৃষ্টি এ করিয়াছে তাহার বাহিরে যাইবার সাধ্য মানুষের নাই...যদি কেহ যায় সে ক্ষিপ্তের মতো ফিরিয়া আসে... ইহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ নিজের সত্তা সহ্য করিতে পারে না.. ইহার বাহিরে মানুষের প্রসার বন্ধ, দৃষ্টি অন্ধ, নিঃশ্বাস অচল, স্নায়ু নিষ্ক্রিয়, কল্পনা মূক, আনন্দ মূর্ছিত...

এই অক্ষয় যৌবনা মানুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে আকর্ষণ করিয়া আনে... ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ স্বর্গকে কল্পনা করিতে পারে নাই...ইহাকে অন্তরালে রাখিয়া কবির কাব্যরচনা সার্থক হইতে পারে না...

বিরহী যক্ষের প্রিয়া এ, কবির কাব্যলক্ষ্মী মানসী এ; পুরুষের বেদনা ইহারই উদ্দেশ্যে চিরদিন নিবেদিত হইতেছে...মিলনে বিরহে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগৎপ্রাণ নিয়ত নৃত্য করিতেছে...

এ কেবল বলিতেছে, আমায় আবিষ্কার করো…
শ্রীর এ সহগামিনী—ভাব-বৈকুণ্ঠে ইহার গতি…
রসবৈভবশালী যে তাহারই এ পরিচারিকা…

ভাবিতে-ভাবিতে ভাতের নেশায় সতীশ কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—শশাঙ্কের ডাকে চমকিয়া জাগিয়া দেখিলো, আরো পান আসিয়াছে—দুটি পান গালে ফেলিয়া সে প্রস্থান করিলো।

তিনমাস অতীত হইয়াছে।

সতীশের কাব্যামোদ হু হু শব্দে চলিতেছে—

সে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে স্থূল গদ্যে তাহার হৃন্মর্ম এই যে, অয়ি অনাবিষ্কৃতা এবং বহুবন্দিতা, তুমি একদিকে চিন্ময়ী, অপরদিকে তীব্র চেতনাময়ী…তুমি নিত্যাভিসারিকা, তুমি বহু উপভোগ্যা, কিন্তু অনুচ্ছিষ্টা…অতএব তুমি এসো…বৃদ্ধ বাল্মীকি তোমাকে যে-রূপে পাইয়াছিল, তোমার যে-রূপের তরঙ্গ চির-উত্তাল, সেই-রূপে তুমি আমার যৌবনের দুয়ারে অতিথি হইয়া এসো।—

এদিকে কার্তিকের মারফৎ কয়েকটি কাবুলি রোগী হাতে আসায় শশাঙ্ক কবিরাজের লক্ষ্মীশ্রী এবং সাইনবোর্ড উভয়ই উজ্জ্বলতর হইয়াছে; সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া সে এখন ঔষধালয়ে 'বাহির হয়', এবং হামালদিস্তায় গাছের ছাল কুটিবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছে।

হামিদ খাঁ কাবুলি পূর্বে বলিতো ডাক্তারেরা চোর; কিন্তু তাহার খুক্ খুক্ কাশি, পাঁজরে ব্যথা এবং তৎসহ স্বরভঙ্গ সাত দিনে বারো-আনা ভালো হইয়া যাওয়ায় সে বুলি সে ত্যাগ করিয়া আরো কয়েকটিকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়াছে। তবে চিকিৎসা শুরু করিবার পূর্বে কার্তিক আর কবিরাজ উভয়ে মিলিয়া হামিদ খাঁর সাইকেল আর লাঠি কাড়িয়া রাখিয়াছিল‥ হ্যাণ্ড-নোটের ছাপানো খাতাখানাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। আর, চিকিৎসাকালে কার্তিক ঔষধ মাড়িয়া তাহাকে সেবন করাইয়া আসিতো।

ওরা দেয় ভালো—এক রকম ঢালিয়া দেয়; তবু টাকায় দু-আনা সুদের অধিকাংশ কবিরাজ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া খাঁর রাগ হয়—যা তা বলে—

শশাঙ্ক মনে মনে বলে, 'জানোয়ার, দেশটাকে ফাঁপা ক'রে দিলে—' মুখে বলে, 'তোমার স্বরভঙ্গ মেদজ হ'লে আর বাঁচতে না; পিত্তজ ব'লেই রক্ষে।—চেঁচিও না বেশি, বুঝলে?' বলিয়া শশাঙ্ক হাসে; যেন তাহার হাসি দেখিয়া হামিদের রাগ পড়িবার কথা।

হামিদ বলে, 'চেঁচ'বে না তবে স্নদ শালা বাঙালিকে ছেড়ে দেবে ?'

যাহা হউক, সেদিন হামিদ প্রভৃতি কযেকটি দুর্ধর্ষ খাঁকে বিদায় করিয়া শশাঙ্ক কবিরাজ ধর্মপরায়ণ হিন্দু হিশাবে ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি আকর্ষণকল্পে ধুপদানিতে টিকার আগুন করিলো ; চৌকাঠে আর ক্যাশবাক্‌শের উপর কুপোদকের ছিটা দিলো ; ক্যাশবাক্‌শের ডালা তুলিয়া ভিতরে ধূপগন্ধী ধোঁয়া দিলো—তারপর প্রজ্বলিত লণ্ঠন এবং বিবর্ণ ক্যাশবাক্‌শের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া উপবীত ধারণকরতঃ ধ্যানক্রিয়া সমাপনপূর্বক যখন সে মুখে বসিতেছে 'ওঁ' ঠিক তখনই সতীশ, নবকুমার আর কার্তিক আসিয়া উঠলো—

ক্যাশবাক্‌শের উপর কপালের স্পর্শ রাখিয়া দিয়া স্তিমিতনেত্রে শশাঙ্ক বলিলো,—'ব'সো।'

'বসি।' বলিয়া কার্তিক বসিলো—তারপর শাসাইল,—

'মহাদেবের অভিসম্পাত লাগবে, কোব্‌রেজ।'

আয়ুর্বেদের প্রথমতম স্রষ্টিকর্তা শিবের নামটি তখন শশাঙ্কের অম্বলের জ্বালামুক্ত বুকের ভিতর বাজিতেছিল—পবিত্র সন্ধ্যা বেলায় দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রকাশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলো,—'শিবরোং—'

তারপর বলিলো, 'না, না, না···'

কার্তিক বলিলো, 'অতো নিরীহ তুমি নও হে কোব্‌রেজ ; দেবাদিদেবের মোদকে তুমি ফাঁকি চালাচ্ছো ·· কই, তেমন ফল হচ্ছে কই ?'

সতীশ বলিলো, 'মাত্রা ডবল করো।'

কার্তিক হাসিলো—

এবং বলা বাহুল্য যে, হাস্যপূর্বক মাত্রা ডবল করা ছাড়া কবিরাজের উপায় ছিলো না।

গুলি উদরস্থ করিয়া নবকুমার বলিলো, 'বৌদি নাকি মাংস রাঁধতে শিখেছেন ভালো ?'·· শশাঙ্ককে প্রশ্ন করিয়া সে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো।

শশাঙ্ক উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিলো ; বকিলো, 'আমি তো বৃথা মাংস খাইনে···বাপের বাড়িতেও মাংসের সেরূপ চল্ নেই।'

'তা না থাক ; এখানে এসে যদি শিখে যান তবে ভাইয়েরা যশ করবে··· বিদ্যেটা তো কম নয়।'

'সময় বড়ো কম। তা ছাড়া—'

'কেবল মুখো সিদ্ধ করাচ্ছো বুঝি ? কতো জীবন যে এমনি ক'রে নষ্ট হচ্ছে কে তার হিশাব রাখে !' বলিয়া নবকুমার একটা দুঃস্থ নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলো।

শশাঙ্ক বলিল, 'তো কিছু কিছু করতে হচ্ছে ; তাতে আলস্য নাই।...বাপ কোবরেজ, আমিও তাই, নূতন কিছু নয়।'

'তবে এখন থাক...কিছুদিন সময় দিলাম, ইতিমধ্যে শিখিয়ে নাও...অন্নপ্রাশনেই খাওয়া যাবে।'

শশাঙ্ক কল্‌কল করিয়া বলিয়া উঠিলো, 'আরো, ভাই, তাই বুঝি ঘটে...বমি করছে হো হো ক'রে...

কার্তিক লাফাইয়া উঠিলো, 'এরই মধ্যে ?'.. তারপর কোলাহল চলিতে লাগিলো...কিন্তু সতীশের আবহমান কালের মানসীর সঙ্গে যে নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল তাহা খাঁড়ার ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল...বিন্ধ্যগিরি যেমন সূর্যের পথরোধ করিয়া শিরোত্তোলন করিয়া ছিলো, তেমনই দুর্লঙ্ঘ্য একটি প্রাচীর তাহার ভাবস্রোতের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিলো—

অন্ধকার একটি মার্গ দিয়া সে যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো অন্তরীক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিলো—

তাহার মনে হইলো, এ সে নয়।

## চন্দ্র-সূর্য যতোদিন

পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া এবং জননীর অনুমতি ক্রমে দীনতারণ তাহার শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিবাহ করিয়া আনিলো। প্রথমা পত্নী স্বর্ণপ্রভা মরিয়া তো যায়ই নাই, উপরন্তু তাহার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানও জন্মলাভ করিয়াছে।

খোঁকার বয়ঃক্রম এই আটমাস।

দুইবার বিবাহ করা যেন দীনতারণদের বংশগত প্রথায় দাঁড়াইয়া গেছে। তাহার পিতামহ রামতারণ, পিতা জগত্তারণ দুই জনেই দইবার বিবাহ করিয়াছিলেন—অবশ্য প্রথমার স্বর্গারোহণের পর। কাজেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা তাহাদের কুব পরিচিত ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু পুরুষানুক্রমে পরিচিত এই ঘরোয়া ব্যাপারটাই দীনতারণের বেলায় কিছু ঘোরালো হইয়া অপরিচয়ের একটা রহস্যময় আবরণ পরিয়া দেখা দিলো।

দীনতারণেরও তেমন দোষ নাই।—

মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যতোদূর পৌছিতে পারে, ততোদূর পর্যন্ত সকলেই দেখিয়াছিলেন।

দীনতারণও দেখিয়াছিল।…কিন্তু সে দৃষ্টি কেবল অনাগত কালের বহির্দেশটা বিচরণ করিয়া আসিয়াছিল। যবনিকার অন্তরালে চির-অন্ধকার পর চিত্তে প্রবেশের চেষ্টা কেহ করে নাই—দীনতারণও না। সতিনের ঘর হইবে এই যা একটু একটু আশঙ্কা ছিলো; দীনতারণের জনক-জননী ভাবিয়াছিলেন তাঁহারা সতর্ক থাকিয়া এবং শাসনে রাখিয়া বিশেষ অশান্তি ঘটিতে দিবেন না। দ্বিতীয়ত, সতিন হইলেও উভয়ে সহোদরা। কাজেই মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া উহারা যতো ঈর্ষাই পোষণ করুক, ঈর্ষার কণ্টকটা সুস্পষ্ট হইয়া যখন-তখনই অপরকে বিদ্ধ করিতে পারিবে না। তারপর চক্ষুলজ্জা বলিয়া জিনিশটাও একেবারে মিছে কথা নয়।

এক স্ত্রী বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুরমহাশয়ের সম্পত্তি। প্রফুল্লকুমারী অন্য ঘরে গেলে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বাহির হইয়া যাইতো—সম্পত্তিও সামান্য নয়।

দীনতারণের শ্বশুর জগত্তারণের প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কোনো হেতুই দেখিতে পাইলেন না; বরং অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ফেরৎ বার্তা পাঠাইলেন যে, তিনিও মনে-মনে ঐ কথাটাই বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ও পক্ষের কী মতামত হইবে তাহা জানা না থাকায় কথাটা উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই ইত্যাদি অনেক কথাই লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গৃহিণীর অশ্রুপাতের কথাটা অন্দরের সংবাদ বলিয়া কাহাকেও জানাইলেন না; এমন কি নিজেও তেমন আমল দিলেন না।—

স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়—আর প্রসব করে স্বর্ণ।

সেই সম্পত্তি তুচ্ছ কন্যাদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া সুতা ছিঁড়িয়া দুই অংশ দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িবে, এ চিন্তাও ক্লেশকর—

স্বরূপচন্দ্র নিজের কবন্ধ মূর্তি অক্লেশে কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু ঐটি পারেন না।

আবার ইহাও বিবেচ্য—

এ বিবাহে আদৌ পণ দিতে হইবে না; যদি দিতে হইতো তবে সে টাকাটা কতো টাকার কতো দিনের সুদ তাহাও তিনি মনে-মনে কষিয়া দেখিলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের বিবিধ চিন্তার ফলে ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্ল একই স্বামীর সহধর্মিণীর আসন গ্রহণ করিলো।

ক্ষণপ্রভার বয়স উনিশ।

কী কারণে কে জানে, মানুষে এক হুজুগ তুলিয়া দিয়াছে যে মেয়েমানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।

কথাটা কোনো প্রকারেই সত্য নয়। মানুষের দুষ্ট কল্পনা যে কতোদূর বেয়াদপি করিতে পারে, এটা তাহারই নিদর্শন; এবং কেবল পুরুষ হিতৈষণার তরফের পুনঃপুনঃ উক্তি ও শ্রুতির পাকচক্রে পড়িয়া এই মিথ্যাটা আরো অনেকানেক মিথ্যার মতো প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে।—

যদি এমন কেহ থাকে যে কথাটা বিশ্বাস করে না তাহাকে দিয়া আপাতত এ-গল্পের প্রয়োজন নাই; যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদেরই একজনের কথা বলি—

সে ক্ষণপ্রভা।

ক্ষণপ্রভার বয়স এই উনিশ; কিন্তু ক্ষণপ্রভা ভাবে যে উনিশ সেই কুড়ি; আর, মেয়েমানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।

নারী কিন্তু বেহায়ার মতো একটা অর্থহীন প্রবাদবাক্য সৃষ্টি করিয়া পুরুষের যৌবনের সীমাটায় একটা দাগ কাটিয়া দেয় নাই।

ক্ষণপ্রভা মনে-মনে স্বামীর দিকে চায়—

আবার মনে-মনে নিজের দিকে চায়—

মনে-মনে যাচাই করে তার বয়স আছে কি গেছে···একবার মনে হয়, গেছে; একবার মনে হয়, যেন আছে—

তার বুকের ভিতর সন্দেহ জাগিয়া একটা পিণ্ডের মতো দুলিতে থাকে··· কান্না-হাসির দীপক মল্লার চলিতে থাকে।—

এমন সময় দীনতারণ ক্ষণপ্রভারই পঞ্চদশী ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আনিলো।···

দিদিকে দেখিয়া প্রফুল্ল সযত্নে তাহার পায়ের ধুলা লইয়া হাসিতে লাগিলো— দিদির-সঙ্গে এই নূতন সম্পর্ক ঘটিবার মতো কৌতুককর আর যেন কিছু নাই।

ক্ষণপ্রভা চাহিয়া দেখিলো, প্রফুল্লর যৌবনের যেন ইয়ত্তা নাই। সেও একটু হাসিলো।

ক্ষণপ্রভার শাশুড়ি সেখানে উপস্থিত ছিলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ক্ষণপ্রভাকেই লক্ষ করিতেছিলেন···

কিন্তু যাহা প্রত্যাশা করেন নাই তাহাই বোধ করি তাঁর চোখে পড়িলো।— ক্ষণপ্রভার মুখের ঐ হাসিটুকু দেখিতেই ধক্ করিয়া পাঁজরে ধাক্কা দিয়া একটা সংশয় বড়ো বেদনাদায়ক তীব্র হইয়া উঠিলো···

সম্পত্তির লোভে কাজটা কি ভালো হইয়াছে!

তিনিও নারী—নারী-হৃদয়ের একাধিপত্যের লালসা যে কিরূপ দুর্নিবার প্রখর

তাহা তো তাঁহার অগোচর নাই ; সেই লালসাটিকে যে পরাস্ত করিতে চায় তাহাকে ক্ষমা করা যে কতো কঠিন তাহাও তাঁহার সুবিদিত।···কিন্তু আগে এ দিকটা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। স্বামীর সম্পত্তি বিষয়ক ওজস্বিনী সৎ-যুক্তির স্রোত তাঁহাকে ওলোট-পালোট করিয়া দিয়া এমন বেগে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল যে. এই সংশ্রবে সম্পত্তি ভিন্ন অন্য কথা উঠিবার অবসর তাঁর মন পায়ই নাই।···তখন কেবল মনে হইয়াছিল, দীনতারণ এবং তার বংশধরগণের বিশেষ সুরাহা হইয়া গেলো।—

তারা রাজার হালে দিন কাটাইবে।

কিন্তু এখন দুটি বধূকেই পাশাপাশি সম্মুখে দেখিয়া স্রোত উল্‌টা দিকে বহিতে লাগিলো।

সহসা তাঁর বধূ-হৃদয়টিই জাগিয়া উঠিয়া যেন কঠিন কণ্ঠে তাঁহাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিলো।

পাড়ার মেয়েরা আসিয়া দুই বউয়ের রূপের তুলনা করিতে বসিয়া গেলো।

প্রফুল্লর স্বাভাবিক দেহচ্ছটার উপর নবযৌবনের রাগলাবণ্য যে অতিশয় মনোহর তাহা একেবারে অবিসংবাদিত—তাহাতে মতানৈক্য দেখা গেলো না, গেলে সেইটাই অদ্ভুত হইতো।

ক্ষণপ্রভার মুখের দিকে তাকাইয়া কে একজন যেন ভরসা দিয়া বলিলো ‘বড়ো বউয়েরও জলুশ আছে, তা না থাকা নয়···’

প্রফুল্ল লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিলো—

কিন্তু ক্ষণপ্রভা উঠিয়া গেলো।

রূপের এই তুলনা বড়ো লজ্জাকর। ইহা ঠিকই যে, প্রতিবেশিনীরা তাহার খর্বতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আসিয়া জোটে নাই ; তবু তাহাদের কথাগুলি সে সহ্য করিতে পারিলো না।

সে সন্তানের জননী—

এই তুলনামূলক রূপব্যাখ্যার সূত্র ধরিয়া অকস্মাৎ সেই মাতৃত্বজ্ঞানটা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার রূপ দৈন্যের-লজ্জাটা আবৃত করিয়া দিলো বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দুঃসহ একটা ব্যথাও সে জাগাইয়া তুলিলো।···

মুগ্ধ নেত্রে স্বামী এই দেহখানার দিকেও তো একদিন চাহিয়া থাকিতেন—পুলকে তখন শিরশির করিয়া সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিতো।···সেদিন গত কি বিদ্যমান সে-সংবাদটা তার মর্মস্থলে কোনোদিন পৌঁছিতো কিনা কে জানে ; পৌঁছিলেও সে কি আকার লইয়া আসিতো তাহা অনুমান করাও সুকঠিন ; কিন্তু

বড়ো কষ্টের কথা এই যে, না-থাকার সে নিদারুণ সংবাদটা আজ যে মহাসমারোহ সহকারে তার সুপ্তি ভাঙিয়া দিয়া এমন অকস্মাৎ তার অন্তঃস্থলে আনিয়া দিলো সে তাহারই বোন !…

কিন্তু ক্ষণপ্রভার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিলো না—

চোখে তার জল দেখা দিলো—

এই দেহটার দিকেই সকলের লক্ষ্য—

দেহের মাংস, দেহের চর্ম, দেহের বর্ণ !

কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী দেহ মথিত করিয়া দেহাতীত চিরজীবী যে অমৃত বস্তুটি সে বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছে তাহার দিকে তো কাহারো চোখ পড়িলো না !…

অভিমানে ক্ষণপ্রভার বুক ফাট ফাট করিতে লাগিলো।—

এই দেহ দিয়া স্বামীর কতোটুকু প্রয়োজন !…এই দেহকে উপলক্ষ আর অবলম্বন করিয়া স্ত্রী-পুরুষের যে যোগ আর মায়া, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মতো কেবল অধোদিকেই তার গতি—

জলের তিলকের মতো তা এই আছে এই নাই।…

সন্তান গর্ভে আসিতেই স্বামীর সঙ্গে যে একাত্মতার নিবিড়তম অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়া তাহার অন্তর প্লাবিত করিয়া অনন্ত-সুন্দর সুখের ঢেউ বহিতেছিল, সেই বন্ধনবোধটা হঠাৎ দুর্বল হইয়া তাহাকে যেন দুস্তর শূন্যের মাঝে বৃন্তচ্যুত নিরালম্ব করিয়া দিলো। সে বেদনার সীমা নাই।

প্রতিবেশিনীবর্গের গতর আয়াসের উড়ো কথায় এতো ক্লেশ অনুভব করা ক্ষণপ্রভার বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছিল কিনা সে-বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, আতঙ্কে তার মাথার ঠিক ছিলো না…রূপলাবণ্য অতিশয় অসার, যৌবন যারপরনাই অল্পায়ু, দেহ পুরাতন ও বিস্বাদ হইয়া উঠিতে বেশি সময় লাগে না, পুত্রবতী স্ত্রী-ই সার ও সেরা—ইত্যাদির স্বপক্ষে বহু যুক্তি সংগ্রহ করা গেলেও ইহা তো অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না যে, তার নিজেরই এক দিন রূপ-যৌবনের গর্ব ছিলো, আকর্ষণ করিবার প্রলোভন ছিলো,…রূপ-যৌবন যে মানুষকে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত অন্ধ করিয়া তুলিতে পারে—তাহাও সে জানে।

তাই এই ত্রাস।

কিন্তু তাই বলিয়া অভিমান তার একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।—

মুখখানা দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন বলিয়াই হোক্ কি হাসে কম বলিয়াই হোক্ দীনতারণ খাঁটি লোক বলিয়াই মানুষের কাছে পরিচিত হইয়া গেছে।

দীনতারণ অসার অল্পায়ু—রূপ-লাবণ্য যৌবনের দিকে ঝুঁকিবে, কি পুত্রের জননীর সঙ্গে একাত্মভাবে ভাবসংযুক্ত হইয়া যাইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

নারীর সহজ লালসা কোন্‌টি—

একাধিক হইলে, তাহার কোনটি স্ফুটতর, কোনটি অগ্রগণ্য, কোনটি অধিক উন্মুখ, কোনটির বেদনা অসহিষ্ণুতা, বেশি···এই সব সূক্ষ্ম বিবেচনার অধীন হইয়া সাবধানে পা ফেলিয়া চলা, আরো সংখ্যাতীত লোকের মতো, দীনতারণেরও পারিবারিক ব্যবহারবুদ্ধির অন্তর্গত নহে,···নিত্য-নৈমিত্তিক ভাব গোপন এবং ভাব প্রকাশের জুয়াচুরিতে তাহা ধরিতে পারাও কঠিন—

নারী নিজেই নিজের মন বুঝিয়া সর্বদা তাহা ধরিতে পারে কিনা সন্দেহ—

কিন্তু ব্যাপার আরো কঠিন হইয়া ওঠে যখন দুটি স্ত্রী একঠাঁই হয়;—তাদের একটি রূপলাবণ্যময়ী যুবতী, আর একটি সন্তানের জননী।

দীনতারণ ভাবিয়া দেখিলো দুজনাই তার স্ত্রী, স্বয়ং নারায়ণ আর অগ্নিদেবতা তার সাক্ষী—

সুতরাং কেহই উপেক্ষণীয়া নহে—

দুজনারই খোঁজ-খবর সমান ভাবে লইতে হইবে; এবং বস্ত্রালঙ্কার যাহা দেওয়া হইবে তাহার মধ্যে যেন ইতর বিশেষ না থাকে।—

তা না থাক্‌—

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ইতর বিশেষ রূপে আর বয়সে—

যৌবনের মর্ম কথাটি দীনতারণ জানে।—

কিন্তু পুত্রের জননী পুত্রকেই মধ্যবর্তী রাখিয়া পুত্রের পিতার সঙ্গে যে নিগূঢ় একাত্মতার দাবি করিয়া কায়-মনোবাক্যে অন্তর্মুখী হইয়া ওঠে, তাহা সচরাচর যেমন পুরুষের অন্তরের অগোচরে থাকিয়া যায় তেমনি থাকিয়া গেলো—

এবং আটপৌরে বাহিরের আচরণের দিক দিয়া তাহা বিপ্লবপন্থী মারাত্মক হইয়া না উঠিলেও, কখনো-কখনো যেমন বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটাইয়া তোলে, তেমনি ঘটাইয়া তুলিলো।

দীনতারণদের বিস্তৃত কারবার।

দীনতারণ নিজে হিসাব রাখে; আর যথাসময়ে যথোচিত কার্যটি সম্পন্ন করা হইলো কিনা সেদিকে লক্ষ রাখাও তার কাজ···

কাজেই সে ব্যস্ত লোক।

ক্ষণপ্রভা যখন-তখন ছেলেটাকে দীনতারণের কাছে পাঠাইয়া দেয়। বেশ পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দেয়—ইচ্ছাটা যেন তার—এতোটুকু বামন যেমন দেখিতে-দেখিতে আচ্ছন্ন করিয়া বলির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন, তেমনি করিয়া তার অতোটুকু ছেলে পিতার সম্মুখ হইতে সমস্ত পৃথিবীটাকে খাতাপত্র মাল-গুদাম সুদ-আসল মামলা-আদালত ইত্যাদি সহ একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেকে সর্বব্যাপী করিয়া তুলিবে…

কিন্তু অতো বড়ো বিরাট কাণ্ড সংঘটিত করা ক্ষণপ্রভার ছেলের সাধ্য নয়—

ছেলেকে যে লইয়া যায়, কখনো-কখনো সে তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনে—ছেলেকে আদর করিবার সময় দীনতারণের নাই।

দীনতারণ ঘূণাক্ষরেও জানে না যে সে গুরুতর একটা পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

যিনি জানেন তিনি দীনতারণের মা।

সুভদ্রা বুঝিয়াছেন যে, স্বামীতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া বধূ নিরতিশয় বিপন্নের মতো অতি উগ্র সন্তানমমতাকেই শেষ অবলম্বনের মতো একাগ্রভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—

তার আকুলি-ব্যাকুলি সংশয়-উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা নাই—সন্তানের দৌলত দেখাইয়াই সে স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে।—প্রফুল্ল ফুলের মতো তাজা রসের মতো চঞ্চল; কৌতুকে আমোদে সে তার দিদিকেও সঙ্গিনী করিতে চায়। ক্ষণপ্রভাও যে সর্বক্ষণই গোম্‌রামুখে থাকে তা-ও নয়…চাপল্য যতোটুকু সাজে ততোটুকুতে সে যোগ দেয়।—দিদির ছেলেটাকে লইয়া প্রফুল্ল যা করে সে-ই এক হুলুস্থূল উদ্দাম ব্যাপার।

ছেলেটির প্রফুল্লই নাম রাখিয়াছে: অঙ্কুর। কিন্তু প্রফুল্লর প্রফুল্লতা একদিন হঠাৎ ঘা খাইয়া থম্‌কিয়া গেলো। সুভদ্রা তাহাকে নিদারুণ কটু কণ্ঠে ধমকাইয়া দিলেন। প্রফুল্লর মনে হইল বিনা অপরাধে সে তিরস্কৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে অপরাধ তার বিশেষ কিছু ছিলো বলিয়াও মনে হয় না।—-

এই সংসারটিকে সে নিতান্তই পরের সংসার মনে করিতে পারে নাই—

তার দিদির সংসার—তাই পদার্পণ করিয়াই সঙ্কোচ যা-একটু ছিলো তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটিয়া গেলো।—স্বভাবতই সে হালকা মেজাজি চপল দ্রুতকণ্ঠ।

—'অতো হাসি কিসের বাপু খামখা?' বলিয়া শুরু করিয়া সুভদ্রা এমন-সব কথা প্রফুল্লকে একাদিক্রমে শুনাইয়া গেলেন যার ঝাঁজও যেমন ধারও তেমনি।

নববধূ ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিলো—এবং তারপর চোখের জলও ফেলিলো বিস্তর। সুভদ্রার এই রূঢ় ভর্ৎসনার কারণ কিন্তু প্রফুল্লর স্বভাবসুলভ অস্থিরতা, তার হাসি কৌতুক আমোদ-প্রিয়তা নহে—সেগুলি সুভদ্রার ভালোই লাগে—

কিন্তু ক্ষণপ্রভা যে নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সেইটা তাঁর প্রাণে চোখের বালির মতো থাকিয়া থাকিয়া খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধতে থাকে—

প্রফুল্লর কলহাস্য-মুখরতা সময়-সময় বড়ো বিসদৃশ তিক্ত লাগে—তার নির্মম আত্মগ্লানি জন্মে—

এবং সেই আত্মগ্লানির ব্যথাই একদিন অকস্মাৎ অসহিষ্ণু হইয়া, বিনামেঘে বজ্রের মতো, প্রফুল্লর উপর ভাঙিয়া পড়িল। প্রফুল্ল হাপুশ নয়নে কাঁদিতে লাগিলো—সুভদ্রা পৌত্রটিকে লইয়া প্রতিবেশীর বারান্দায় যাইয়া উঠিলেন।

ক্ষণপ্রভাও অবাক হইয়া গিয়াছিল। সেও আজ পর্যন্ত অনেক অপরাধ করিয়াছে—অসাবধানতা অন্যমনস্কতা নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি ক্ষতিকর অনেক দোষত্রুটি তাহাতে দেখা গিয়াছে—

সুভদ্রা কখনো হাসিয়া কখনো কেবল মুখখানা গম্ভীর করিয়া দু-চারটি অসন্তোষের কথা কহিয়াছেন—কিন্তু এমন করিয়া ফাটিয়া পড়েন নাই। ক্ষণপ্রভা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলো—'কাঁদিস্‌নে। মা-ও তো কতো বকে।'

কিন্তু মা বকিলে তো এতো কান্না আসে না! শাশুড়িকে সে আজই মায়ের মতো আপন মনে করিতে পারে-নাই…আর আঘাতটা অপ্রত্যাশিত।

প্রফুল্ল জানিতো—দিদির সে সতিন হইয়া যাইতেছে, সেখানে দিদিই সব।—শাশুড়ি বলিয়া যে এক ব্যক্তি সেখানে থাকিতে পারে তাহা সে ভাবেও নাই।… কাজেই শাশুড়ি যখন দিদিকে ডিঙাইয়া সর্বপ্রধান ব্যক্তির মতো আচরণ করিয়া গেলেন, তখনই তাহার মনে হইলো, আঘাতটা নিঃসম্পর্কীয় পরের হাত হইতে আসিতেছে—

আর অকারণে।

প্রফুল্ল কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলো—'দিদি, আমায় পাঠিয়ে দাও।'

—'বলিস ওঁকে।' বলিয়াই ক্ষণপ্রভা লজ্জায় নবীনা কিশোরীর মতো লাল হইয়া উঠিলো।

বয়স তাহার উনিশ, প্রায় সে বুড়ি।

যে ঐ মিথ্যাটি রচনা করিয়া দিয়াছে সে নারীকে কেবল নারী বলিয়াই জানে —সমষ্টি হইতে বিচ্যুত স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে সে দেখে নাই। কিন্তু পরম আশ্চর্য এই যে, নারী আবহমানকাল নিঃশব্দ থাকিয়া ঐ মিথ্যাটাকে পরোক্ষে অপরোক্ষে কেবল প্রশ্রয় দিয়াই আসিয়াছে—প্রতিবাদ করে নাই।

কিন্তু মনের গুহাশায়িত দিব্য দেহটি—যার অনন্ত সংবিৎ—যার অজ্ঞাতে দেহাশ্রিত ভূত-জগতে সূক্ষ্মতম স্পন্দনটি ঘটিতে পারে না—

সে জানে সে একা; ঠিক তারই মতো যদি আর কোথাও কেহ থাকে তবে সে থাক—

কিন্তু সে অদ্বিতীয়—

আর একটি সে এ-বিশ্বে নাই।

"বলিস, ও"কে" বলিতেই উনিশ বছর বয়সেও ক্ষণপ্রভার মনে পড়িয়া গেলো স্বামীর শয্যাংশ—সেখানকার স্বপ্ন, জাগরণ, হর্ষ, তৃপ্তি···স্মৃতি বড়ো মধুর।

সে-স্থানটি সে স্বেচ্ছায় নহে, অনুরুদ্ধ হইয়া নহে, লৌকিকতায় বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু মনে-মনে সে লজ্জা পাইলো, শুধু সেই স্থানটির মাধুর্য স্মরণ করিয়া নয়—

তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহারই ভগিনী—সে বোধহয় সেখানে উঠিয়াই দিদির ছবিটা ভাবিতে থাকে!

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিলো—'আমি পারবো না। তুমি বলো।'

—'পাগল তুই। আমি কি তা পারি।' বলিয়া ক্ষণপ্রভা একটু হাসিলো।

তা বটে, দিদি তা পারে না—

তাহার হইয়া দিদির ও-কথা বলিতে যাওয়া কেবল দৃষ্টিকটু নয়, অর্থবোধে গোল ঘটিলে বিশ্রী অপরাধেও দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

সেইদিন রাত্রে দীনতারণের সমক্ষে পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাব করিয়া এবং তার প্রত্যুত্তর শুনিয়া প্রফুল্ল এমন গোঁ ধরিয়া পিছন ফিরিলো যে দীনতারণের খাঁটি গাম্ভীর্য-বুদ্ধি হারাইয়া বোঁ-বোঁ করিয়া কেবলি ঘুরিয়া মরিতে লাগিলো—

মধুচক্র কি অগ্নিশিখা কোনোটারই সন্ধান পাইলো না। দীনতারণ দাড়ির ভিতর হইতে দু-পাটি দাঁত বাহির করিয়া গম্ভীর ভাবে হাসিয়া বলিয়াছিল,— 'তোমার দিদিকে বলো; সে যা করবে তাই হবে। মাকে রাজি সে-ই করাবে।'

তাহাকে এই দিদির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া মুখ্য প্রশ্নটি এড়াইবার কৌশল

মাত্র ; এবং এতোক্ষণে সে বুঝিতে পারিলো, দিদিও 'বলিস ওঁকে' বলিয়া দিয়া সেই জঘন্য পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে—

মানুষের মনের এই দ্বিচারিতা অসহ্য—রাগে প্রফুল্লর গা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিলো। এদিকে দীনতারণের মনটাও টিপ্‌টিপ্ করিতেছিল—ওরা সহোদরা হইলেও সতিন, এ-কথা তার মনেই ছিলো না। দু-সতিনের একজনের মুখের সামনে আর-একজনকে স্পষ্টবাক্যে কর্তা করিয়া তোলা সুবুদ্ধির কার্য নহে—বিপত্তি তার এইখানে যে, জানিয়া হোক্ না-জানিয়া হোক্, ঈর্ষাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। দীনতারণের ক্ষোভ কাটিয়া যাইবে কি থাকিয়াই যাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে, যদি ওদিক হইতে কোনো জবাব আসে, তাহারই উপর।

খানিক পরে প্রফুল্ল বলিলো—'দিদিকে বলেছি। সেই আপ্...তোমাকে বলতে বলেছে।'

ভগিনীপতি অবস্থায় দীনতারণকে সে 'আপনি আপনি' করিতো, সে-অভ্যাসটা এখন ত্যাগ করিতে হইতেছে।

দীনতারণ মনে-মনে একটু হাসিলো—

ভাগ্যিস বুদ্ধি ততো পাকে নাই,...ঝগড়া একটা বাধিয়াছিল আর কি! বলিলো, কিন্তু এবার প্রফুল্লর দিদির নামোল্লেখও করিলো না,—'বেশ করেছো। সব ঠিকঠাক ক'রে আমিই দেবো'খন্, মাকেও রাজি করবো. মা বাবাকে রাজি করাবেন। হাঙামা কতো!' বলিয়া অতোগুলি লোককে রাজি করাইবার হাঙামার ক্লান্তিতেই যেন সে চোখ বুজিল।

এটা পুরো মরশুমের সময়—

যেমন সদরে, তেমনি অন্দরে—ভয়ঙ্কর কাজের ভিড়। কাছারি বাড়িতে আর গোলাবাড়িতে লোক যাতায়াতের অন্ত নাই...উঠানের দূর্বা মরিয়া ধুলা উড়িতে লাগিলো!—অন্দর হইতেই আগন্তুকগণের তুষ্টির সোপকরণ আয়োজন করিয়া পাঠাইতে হয় বলিয়া সেখানে দিবারাত্র দৌড়াদৌড়ি ওরা দুজন আর সুভদ্রা হাতে হাতে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। এই সময়ে ছোটো বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইলে ছেলে লইয়া বড়ো বৌয়ের বড়ো কষ্ট হইবে, এবং কাজ সামলানো মুশকিল হইয়া উঠিবে—এই আপত্তি তুলিয়া সুভদ্রা দু-চারবার বিরুদ্ধদিকে মাথা নাড়িয়া শেষে রাজি হইয়া গেলেন ; ভাবিলেন—থেকে আসুক দু-দশদিন ; বড়ো বৌ—

প্রফুল্লর যাওয়ার সব ঠিক—

বাক্‌শো গোছানো শেষ ; দীনতারণ মায়ের আদেশে শাশুড়ির জন্য প্রণামী

কাপড় এবং প্রফুল্লর জন্য চলিত ফ্যাশনের রঙিন শাড়ি আনিয়া দিয়াছে, তাহা ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্ল উভয়েরই মনঃপূত হইয়া বাক্‌শো উঠিয়া গেছে—কিন্তু সব আয়োজন ভণ্ডুল করিয়া দিলো যে যাইবে সে নিজে—স্নান করিয়া উঠিয়াই প্রফুল্লর গা শির শির করিতে লাগিলো ; এবং তারপরই মাথা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া হু-হু শব্দে জ্বর আসিয়া পড়িলো।

দুয়ারে মজুত গাড়ি ফেরৎ গেলো।

সদরে অতো কাজের ভিড়—

কাজের ব্যস্ততায় দীনতারণের নাওয়া-খাওয়ারই সময় মতো হইতো না—

কিন্তু প্রফুল্লর জ্বর হইতেই অতো ভিড় ঠেলিয়া কেমন করিয়া পথ্য করিয়া লইয়া প্রফুল্লকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সে দেখিতে আসে সেইটাই হইল ক্ষণপ্রভার বড়ো বিস্ময়ের কথা।

কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়ে বলা যায় না।—

যখন দীনতারণের অল্পবিস্তর অবসর ছিলো তখনও ছেলেটিকে পাঠাইয়া ক্ষণপ্রভা সঙ্গে-সঙ্গে ফেরৎ পাইয়াছে···ছেলেকে আদর করিবার অবসর দীনতারণের হয় নাই।

কিন্তু এখন!···

হইতে পারে, এ এক, আর সে এক—দু'টিতে তুলনা চলে না ; এটা দায়িত্ব, ওটা অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস মাত্র ; এটা না-করিলে কর্তব্যচ্যুতির অপরাধ হয় ; ওটাতে তা হয় না।

কিন্তু ক্ষণপ্রভার যন্ত্রণা তাহাতে কিছুমাত্র কমিলো না। ছেলে তো সামান্য জিনিশ নয়!···ছেলের উপর যেমন তার তেমনি স্বামীরও সর্বহৃদয় ঢালিয়া পড়িয়া জীবনে জড়াজড়ি হইয়া যাওয়ার কথা। ছেলে তো শুধু স্বামীর ভোগের রসমূর্তি নহে···ছেলেরই অষ্টাঙ্গে স্বামীর কলেবর পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে··· স্বামীর সত্তাটিকেই পুনরাবৃত্তি করিয়া সে ঐ সন্তান তাঁহাকে উপহার দিয়াছে!

তবু যৌবনই হইল সবার বড়ো!···

দীনতারণ চটি ফট ফট করিয়া দেখিতে আসে—প্রফুল্ল লজ্জিত হয় ; বলে,—'রকম দেখে রাগই হয়।'

কিন্তু রাগ যে তার ত্রিসীমানায়ও নাই তাহা এমনি প্রাঞ্জল যে চাহিয়া দেখিবারও দরকার হয় না।

ক্ষণপ্রভাও হাসে, বলে, 'চিরকাল অমনি।' কথা দুটি এমন করিয়া বলে যেন তাহাকেও দীনতারণ ঠিক এমনি করিয়া দেখিতে আসিতো।

প্রফুল্ল হয়তো এতো গভীর অর্থে পৌছিতে পারে না, কিন্তু ক্ষণপ্রভা কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া অন্তদিকে চাহিয়া থাকে—

একটু গ্লানি—জন্মে—বুঝি ঈর্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

…দীনতারণ তাহাকেও এমনি করিয়াই দেখিতে আসিতো কিনা তাহা যেন ভালো করিয়া ক্ষণপ্রভার এখন মনে পড়ে না…কিসের একটা ঢেউ উতরোল হইয়া তাহাতে শৃঙ্গে তুলিয়া লইয়া নাচাইতেছে…সেই আলোড়নে তার মনের খেই হারাইয়া গত দিনগুলি অস্পষ্ট হইয়া গেছে।

প্রফুল্লের জ্বর ত্যাগ পাইয়াছে, এবং বহু সাধ্যসাধনার পর সে কুইনাইন সেবন করিয়াছে। বৈকালে সে অঙ্কুরকে কোলে করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছে; ক্ষণপ্রভা তার কাছেই বসিয়া ছেলের বালিশের খোল শেলাই করিতেছে—প্রফুল্ল বলিলো,—'দিদি, তোমার ছেলের নামের ভেতর থেকে তারণটা তুলে দিতে হবে—বিশ্রী সেকেলে। বিপত্তারণ আবার নাম হয় না কি!'

ক্ষণপ্রভা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলো, বলিলো,—'বলিস্ ঠাকুরকে'…কিন্তু প্রফুল্ল তখন ছেলেকে হাঁটুর উপর দোলা দিয়া সুর করিয়া গাহিতে শুরু করিয়া দিয়াছে—

ওরে আমার লুলু লুলু—
ঘুমে দু-চোখ ঢুপু ঢুলু—
হাসতে তবু খুলু খুলু—
তোমায় ধ'রে মারতে হবে—
কাজল নেপ্টে ভূত সেজেছে—
কেমন মজা…

শ্লোক তৈরির কৃতিত্বে ক্ষণপ্রভাও মৃদু-মৃদু হাসিতেছিল, হঠাৎ কী-একটা শব্দে দু'জনাই মুখ তুলিয়া দেখিলো, দীনতারণ উঠানে দাঁড়াইয়া ফিক ফিক হাসিতেছে—

প্রফুল্লর আবোলতাবোল তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেলো, সে ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া চোখ নামাইয়া রহিলো। কিন্তু ক্ষণপ্রভার মুখ আর কান অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলো—তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে প্রফুল্লর কোল হইতে টানিয়া লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়া গেলো।…

প্রফুল্ল চোখ দু'টি একটুখানি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিলো—

দীনতারণ হাসিয়া ফিরিয়া গেলো।

…ক্ষণপ্রভা স্বামীর মুগ্ধ দৃষ্টিটা লক্ষ্য করিয়াছিল; এবং ইহাও মর্মে মর্মে

হৃদয়ঙ্গম করিতে তার তিলার্ধ বিলম্ব হয় নাই যে, শুধু প্রফুল্লর বিকচ যৌবন-শ্রীই স্বামীর এই মোহের কারণ নহে···

তাঁর পরম তৃপ্তির এই বুকভরা হিল্লোল যে তুলিয়াছে সে শুধু প্রফুল্ল নয়—সঙ্গে তারই গর্ভজাত ছেলেটি আছে।

স্বামীকে দেখিবার পূর্ব মুহূর্তেও সে একবার আড় চোখে চাহিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়াছিল—

ছেলে কোলে করিয়া কার যে ছবিটি ফুটিয়াছিলো কোনো ঐন্দ্রজালিকের সাধ্য নাই শুধু দেহে রূপ ঢালিয়া তাহাকে নিষ্প্রভ করিতে পারে।···পুরুষের চোখেও সে-ছবিটি না পড়িবার নয়—

এবং তাহারই দিকে স্বামীকে মুগ্ধ লুব্ধ দৃষ্টি পাকিয়া রাখিতে দেখিয়া সহসা-সঞ্জাত একটা বিজাতীয় আক্রোশে আত্মবিস্মৃত হইয়া ছেলেকেই কাড়িয়া লইয়া সে স্বামীকে উপভোগ বঞ্চিত করিয়া দিলো···চরম মিলনের ঐ রূপটিই যে সে পাগল হইয়া খুঁজিয়া মরিতেছে।

তার পরদিনই সকাল বেলায় আগুনে ইন্ধন পড়িলো।

'দিদি' বলিয়া ডাক দিয়া কী একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই প্রফুল্ল থামিয়া গেলে—লজ্জায় সে মুখ ফুটাইতে পারিলো না; কিন্তু মিষ্টিমিষ্টি হাসিতে লাগিলো।

ক্ষণপ্রভা বলিলো,—'কী রে?'

—'পরে বলবো।' বলিয়া প্রফুল্ল ফিরিবার উপক্রম করিতেই ক্ষণপ্রভা তার আঁচল চাপিয়া ধরিলো, বলিলো, 'কী বলছিলি ব'লে যা।'

শুধু কৌতুহল এতো উগ্র হয় না—

ক্ষণপ্রভা কী ভাবিয়াছিল কে জানে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এই ভাবটাই অভ্রান্ত হইয়া দেখা দিলো, যেন বেশি দেরি করিলে সংযত থাকা শক্ত হইবে।

প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতেই বলিলো—'কিছু নয়, অমনি, কী বলতে যাচ্ছিলাম তা ভুলেও যাচ্ছি ছাই।'

'বল্, আমার মাথার দিবি।'

'বলছি তুমি আঁচল ছাড়ো।' বলিয়া আঁচল টানিয়া গুটাইয়া লইয়া প্রফুল্ল বলিলো,—'লজ্জা করছে, দিদি।'

কিন্তু দিদির আগ্রহ তখন যেন হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে; বলিলো, 'তা করুক না-ব'লে তুই যেতে পাবিনে।'

কথাটা শুনিবার জন্য ক্ষণপ্রভার এই প্রাণপণ জিদও কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—

প্রফুল্ল তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলো 'তুমিই আজ ওপরে শুয়ো। ওর ছেলে চাই।' বলিয়াই সে দুম দুম করিয়া ছুটিয়া পালাইল।

কিন্তু এদিকে যা ঘটিতে লাগিলো তার বর্ণনা নাই।

...যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্ত শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এক নিমেষেই চুষিয়া শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশুমুখে ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিলো।—

দীনতারণ ঠিক কী কথা বলিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে তাহা বোঝা গেলো না—কিন্তু প্রাণের যেখানে অন্তর্যামী—বুকের সেখানে অকথিত বার্তাও আপনি আসিয়া পৌঁছায়—সেখানে চক্ষের পলকে আদ্যন্ত নিঃসংশয়ে জানা হইয়া গেলো।

.. স্বামী তাহাকে তাহার পুত্রসহ চাহেন নাই—উহারই গর্ভের সন্তানটিকে কামনা করিয়াছেন।

বিকালের সেই ছবিটা তাঁর মনে ছাপ রাখিয়া গেছে, পরের সন্তান কোলে করিয়া শোভা তখন সম্পূর্ণ ফোটে নাই...নিজের সন্তান ক্রোড়ে লইয়া স্বামীকে ও কবে দেখাইবে!...সেই দিনটির প্রতি স্বামীর লালসা সহসা জাগরিত হইয়া বোধহয় দুর্নিবার হইয়াই উঠিয়াছে।

...ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিলো, তাহার জীবন মিথ্যা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা—সর্বোপরি, সন্তান-ধারণও মিথ্যা—

ভোগের ক্ষেত্র অবারিত পাইয়া স্বামী তাহাকে পাইয়া কেবল খেলা করিয়াছেন।...ভাবিতে-ভাবিতে ক্ষণপ্রভার মনে যে-ভাবটির উদয় হইলো সাধ্বীর পক্ষে তাহা মহাপাতকের কথা—স্বামীকে স্মরণ করিয়া ঘৃণায় মন ঘুলাইয়া উঠিলো।

ক্ষণপ্রভার মনে হইলো তার চতুর্দিকে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়াছে...স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত অন্ধকার নহে...সে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ, কাঁটার মতো চোখে বেঁধে।...সেই অন্ধকারের কেন্দ্রে সে...চারিদিকে যাহারা বিচরণ করিতেছে তাহারা যেন এ-পৃথিবীর মানুষ নয়...তারা এমনই বিকৃত, বীভৎস।

প্রফুল্ল টিপ পরে, চুল বাঁধে—স্বামীর মনোরঞ্জনের অভিলাষটি যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়া উপছিয়া পড়ে—ক্ষণপ্রভা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে—দেখিতে দেখিতে একদিন বুক দুরুদুরু করিয়া অকস্মাৎ-উদ্ভূত একটা অতিশয় শঙ্কিত মমতায় ক্ষণপ্রভা বিগলিত বিহ্বল হইয়া প্রফুল্লকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো।

প্রফুল্ল অবাক হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলো— দিদির এই আশ্চর্য অশ্রুমোচনর কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিলো না।

কিন্তু সুভদ্রা কিয়ৎক্ষণ পরেই একবার ঘরে ঢুকিয়া বড়ো বধূর চোখে অশ্রুচিহ্ন দেখিয়া ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া ফেলিলেন; একটু ভাবিতেই আগাগোড়ায় কার্য-কারণে চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটিয়া ক্রন্দনের হেতুটা তাঁহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেলো।—

কিন্তু সুভদ্রার সব ভুল।

চলা-ফেরার যে-পথটি মানুষের অসংখ্য পদচিহ্ন বুকে করিয়া পড়িয়া আছে, সেই সত্য, সেই সনাতন, তাহার বাহিরে পা বাড়ালেই অকল্যাণ সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিবে—

নমস্য পূর্বগামীরা যে-পথে চলিয়া হাসিতে-হাসিতে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন সেই নিরূপিত পথটি যথেষ্ট সুখকর প্রশস্ত নহে মনে করিয়া অন্য পথের জন্য মানুষ দাবি নয়, লোভ করিতে পারে, ইহা সুভদ্রার ধারণাতীত।—কেহ অমন কথাটি মুখে আনিলে সুভদ্রা তাহাকে পাগল বলিবেন।—তাই তিনি ক্ষণপ্রভার নিরুৎসাহ শুষ্কতা লক্ষ করিয়া ভাবিয়া আসিতেছেন তার নারী সুলভ স্বামী-লোলুপতার স্বাভাবিক দিকটাই এবং আধুনিকতম চোখের জলের উৎসও যে সেইখানেই তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিলো না।

কিন্তু সব ভুল—

ক্ষণপ্রভা সে কারণে কাঁদে নাই।

প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইলো, ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো; উর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভোগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ-ও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিলো না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে—সে-দাবি যখন আর কোনো কথা কানে তুলিতে চাহিবে না—তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না···দেখিতে হইবে, সব শূন্য; পৃথিবী শবের মতো অসাড়; বৃথাই সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়াছে···

বেচারি জানে না, তাহার আকাশে উল্কা জ্বলিয়া উঠিলো বলিয়া—

প্রফুল্ল ক্ষণপ্রভাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরে; বলে,···'দিদিভাই, রাগ করেছিস?'

ক্ষণপ্রভা কথা কহে না—

যে-কথা ভিতরের কটাহে ফুটিতেছে তাহা বলিবার নয় — বিষণ্ণ কুয়াশাচ্ছন্ন চক্ষু দুটি তুলিয়া ভগিনীর মুখের দিকে সে চায়···

চাহিয়াই থাকে।

কিন্তু রাগ সে করে নাই ; হঠাৎ সে হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করে ; ভাবে, 'কোথায় চলেছি আমরা। এ কেন আমার সঙ্গিনী হ'লো!'···ভাবিতে-ভাবিতে মন তার চিন্তার জটিল গহনের অপার অন্ধকারে হারাইয়া যায় ; একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিবার মতো সামর্থ্য সজীবতা তার প্রাণের থাকে না। —

সে চোখ কী দেখিবার অনন্ত আশায় চকিত হইয়া ফিরিয়াছিল এবং কী দেখিয়া গুটাইয়া যাইতে-যাইতে কী মনে করিয়া রহিয়া গেলো তাহা স্পষ্ট।—

ক্ষণপ্রভাও তাহা নিজের চোখেই দেখিলো।—

তারপর তার পা দু'খানা শয্যার দিকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিলো বটে, কিন্তু তখন তাহার কায় ও মনের গতিচেতনা একেবারে নিশ্চল হইয়া থামিয়া গেছে।

দীনতারণ বলিলো, 'খুব রোগা হ'য়ে গেছো দেখছি। খোকাকেও তো রোগা-রোগা দেখছি।' বহুদিনের পর স্ত্রী, পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দীনতারণের এই উৎকণ্ঠা পৃথিবীর সূচ্যগ্র ভূমিও স্পর্শ করিলো না—হাওয়ায় ভাসিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলো। দীনতারণ কোনো জবাব না-পাইয়া মানভঞ্জনের পক্ষে অতিশয় কার্যকর অনেকগুলি শব্দ জুটাইয়া রাখিলো ; এবং তাহাতে ফল না-দর্শিলে কী উপায় অবলম্বন করা যাইবে তাও সে বিবেচনা করিতে লাগিলো।

খোকার শয্যায় খোকাকে শোয়াইয়াই ক্ষণপ্রভা হঠাৎ আপাদ-মস্তক চমকিয়া উঠিলো—

এমন যে কখনো ঘটিবে তাহা সে জানিতো না···

এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন ঘিন করিতেছে :···অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ড—যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ : তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে···মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে—

কিন্তু হাত দিয়া তার শয্যাটা স্পর্শ করিতেই তার মনে হইল, এই তার এখানে শেষ আসা—

পতনের শেষ ধাপে আসিয়া সে দাঁড়াইল—

তারপরে—

ক্ষণপ্রভা সভয়ে চোখ বুজিলো।

…কিন্তু দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় না-করিয়া ছাড়িলো না।

রাত্রি গভীর।—

হঠাৎ মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া দীনতারণ দেখিলো ক্ষণপ্রভা শয্যায় নাই, ছেলেটিও নাই, দরজা খোলা। দীনতারণ উঠিলো—আগে পালঙ্কের এধার-ওধার খুঁজিলো। তারপর বারান্দা, তারপর উঠান এবং তারপরেই হাঁকডাক করিয়া যেখানে যে ছিলো সবাইকে টানিয়া আনিলো।

সুভদ্রার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলো—

জগত্তারণ চিৎকার করিয়া দিক্‌বিদিকে লোক ছুটাইতে লাগিলেন।

ক্ষণপ্রভা কোথাও নাই—

ঘরে নাই, বারান্দায় নাই, বাড়ির ত্রিসীমানায় নাই।

কিন্তু কোথাও সে ছিলো—

ভোরবেলা একজন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, সবাই মুখ ফিরাইল। এখন সে নগ্নদেহ—

সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।

———

## আদি কথার একটি

বেণী একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে শুনিলো, কে যেন তার ঘরের বেড়ার ওধার হইতে চুপি-চুপি ডাকিতেছে—'হরি?' দু-তিনবার, পুরুষের গলা—আর হরি বেণীর স্ত্রীর নাম।

খানিক কান খাড়া করিয়া থাকিয়া বেণী খুব চুপি-চুপি নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলো; পা টিপিয়া-টিপিয়া আসিয়া হড়াম করিয়া দরজার খিল খুলিতেই, যে-ব্যক্তি হরি-হরি করিয়া ডাকিতেছিল, হুড়মুড় করিয়া বনজঙ্গল ঝোপঝাড় ভাঙিয়া দৌড় দিলো।

বেণী তাড়িয়া গেলো বটে, কিন্তু অন্ধকারে ভালো ঠাহর না-হওয়ায় সুবিধা করিতে পারিলো না।

ফিরিয়া আসিয়া বেণী ঘরের দীপ জ্বালিলো।

বেড়ায় গোঁজা ছিলো রাম-দাখানা—তাহাই দিয়া সে নিদ্রিতা হরিমতির

মাথাটা খ্যাঁচ করিয়া এককোপে কাটিয়া লইয়া, সেই মাথা আর টকটকে রক্তমাখা দা লইয়া সেই দুপুর রাত্রেই সটান থানায় আসিয়া হাজির হইলো।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বেণী কোনে কথা গোপন করিলো না ; কোনো কথার প্রতিবাদ করিলো না। সোজা খুন কবুল করিয়া গেলো শেষ পর্যন্ত।

তার ফাঁসির হুকুম হইয়া গেলো।

এতো বড়ো কাণ্ডটা ঘটিয়া গেলো—কিন্তু একেবারে তুচ্ছ কারণে। গোড়ার কথা এই—

দাসেরা পাঁচ ঘর গ্রামের একটি প্রান্তে বসবাস করিত, কিন্তু নিরিবিলি নীরবে থাকার মানুষ তারা ছিলো না। গাছের তলাকার আমটা, জামটা, সুপুরিটা, করমচাটা লইয়া তারা ছেলেবুড়োয় মেয়ে-মদ্দয় এমন বকাবকি কামড়াকামড়ি শুরু করিয়া দিতো যেন ঐ দ্রব্যটিই একমাত্র সম্বল ছিলো, অমুকের ছেলেটা তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ি যাওয়ায় একজন একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেছে। ক্ষেতের পাকা ধান রাতারাতি গোরু দিয়া খাওয়াইয়া দিলে যদি অতো হল্লা ওঠে তা তবু মানায়।

কিন্তু এ একেবারে প্রাণপণ রেষারেষি—পারে তো এ উহাকে কাটিয়া বাঁটিয়া খায়—এমনি রোখ।

এমনি হয় বারোমাস তিরিশদিন। কেবল গলার আর গালির পাল্লা!

বেণী দাসই ছিলো পাড়ার বিভীষিকা ; সকলের বড়ো ঠ্যাঁটা, বদরাগী আর জোয়ান ছিলো সেই। ঝগড়ায় বেণীকে আঁটিতে না-পারিয়া তাহারই জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশীরা তাহাকে অতিশয় জব্দ করিবার মানসে যে-কৌশল অবলম্বন করিলো, গ্রামস্থ মা রাজরাজেশ্বরীর কৃপায় তাহা অচিরাৎ সার্থকই হইলো।

দাসেরা সব আলাদা ভিটা হইলেও এ-বাড়ি ও-বাড়ির ঘর-দুয়ার একেবারে কোল-বেকোল, যেমন শরিকের বাড়ি হয়। শত্রুপক্ষ সন্ধান রাখিয়াছিল, বেণী কোথায় যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যায় নাই ; কী কারণে পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। চক্রান্ত করিয়া তাই একজনের হরিমতির এই জার সাজা, ডাকাডাকি যতো কিছু।

বেণীর ফাঁসির হুকুমের পরই ভাঙন ধরিলো। দাসেরা বাস তুলিতে শুরু করিলো। সবাই গেলো, রহিলো কেবল দু-ঘর—সুবল একা, আর স্ত্রী-কন্যা লইয়া গোপাল দাস।

গোপালের দুই সংসার। প্রথম সংসার প্রথম সন্তান হইতেই মারা যায়। দ্বিতীয় সংসার কাঞ্চন।

কাঞ্চনই বটে—

মানুষের মন নারীর দেহে, তার মুখে, তার অঙ্গে-অঙ্গে যতো রূপ, যতো সুষমা, যতো নিবিড়তা কল্পনা করিতে পারে—সে তাই। মানুষের মনের সেই ধ্যানেরই যেন সে রূপ। আর, তেমনি বলিহারি বুদ্ধি।

কাঞ্চনের গর্ভে গোপালের দুটি কন্যা জন্মিবার পর গোপাল একদিন তুলসী তলায় শয়ন করিলো। সেটা স্মরণীয় বৎসর; সেবার দেশে গো-মড়কের খুব হুজুগ।

গোপাল একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে পার করিবার পূর্বেই সে নিজেই পার হইয়া গেলো।

তখন তার সেই ছোটো মেয়ে খুশির বয়স মাত্র পাঁচ।

অনাথা কাঞ্চনের এই দুর্দিনে সুবল দাস অগ্রসর হইয়া আসিলো, বলিয়া পাঠাইল, খুশিকে সে বিবাহ করিতে চায়।

কাঞ্চনের অরাজি হইবার কোনো কারণ ছিলো না—একটি ছাড়া। সুবল সবদিকে দিয়াই মনের মতো পাত্র: দেখিতে খাশা সুপুরুষ, খেত-খামার আছে, অবস্থা ভালোই, তবে তার বয়স বেশি, তেইশ-চব্বিশ। আর খুশির বয়স পাঁচ।

কিন্তু কাঞ্চন ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে মনকে বুঝাইল ইহাই বলিয়া যে, অমন তো ঢেরই হয়। অমুক-অমুকের, অমুকের ছেলের, অমুকের ভাইয়ের, অমুকের ভাইপোর বিবাহ হইয়াছে, সে-তো ঠিক এই রকমই।

ছেলে তাগড়া জোয়ান, মেয়ে একরত্তি।

কাঞ্চন রাজি হইতেই সুবল খড়-বাঁশ কিনিয়া ঘরামি লাগাইয়া, চাল ছাওয়াইয়া খুঁটি বদলাইয়া ঘর-দুয়ার ফিটফাট পরিপাটি করিয়া দিলো। এবং সাত পাক ঘুরিয়া গেলো।

কিন্তু বিবাহের পর খুশির কাণ্ড দেখিয়া লোকে হাসিয়া বাঁচে না। সে সুবলকে সুবল বলিয়া ডাকে, তুই-তোকারি করে, তার কাঁধে চড়িয়া পাড়ায়-পাড়ায় বেড়ায়।

হাটের দিন বলে, 'সুবল, হাটে যাবিনে?'

সুবল বলে, 'যাবো।'

—'এক পয়সার বাতাসা আনিস আলাদা ক'রে, আমি খাবো।'

সুবল বলে, 'আনবো।'

—'তুই আনবিনে। ও মা, ঐ দ্যাখ, সুবল বাতাসা আনবে না।'

—'আনবো না তা কই বললাম?'

—'তবে হাসছিস যে ?'

এমনি রং-তামাশা একটা-না-একটা রোজই হয় ; কাঞ্চন শোনে আর হাসে। সুবলের সঙ্গে কাঞ্চনের আগে হইতেই পাড়ার লোক বলিয়া পরিচয় ছিলো, তাই এখনো তেমন সঙ্কোচ নাই।

সুখেই দিন যায়—

সুবল খেতের ফসল, গাছের ফল এই বাড়িতেই তোলে।

খুশিকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষুদ্র পরিবারের কৌতুকের কণা ঠিকরায়। হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে—চোখের জলের চিহ্নও ছিলো না ; কিন্তু হঠাৎ একদিন সে দেখা দিলো।

জালার মুখে রাখিবার উদ্দেশ্যে চালের ধামাটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মাটি হইতে তুলিয়া খাড়া হইবার সময় সুবলের কোমরের কোন একটা হাড়ে খট করিয়া শব্দ হইয়া যন্ত্রণায় সে একেবারে টিকৃটিকির কাটা লেজের মতো ছটফট করিতে লাগিলো। কাঞ্চন হায়-হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিলো, সুবলের মাথায় জল-বাতাস দিবে কি তার কোমরে তেল-তার্পিন দিবে হঠাৎ তাহারই দিশা সে পাইলো না। খুশি কাঁদিতে লাগিলো—'ওমা, সুবল যে ম'রে গেলো !'

· যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তেলের ব্যবস্থাই হইলো।

সুবলের ব্যথা বড়ো গুরুতর। দিনে বিবিধ কাজকর্মের ব্যস্ততায় যন্ত্রণা তেমন বুঝায় না ; কিন্তু সন্ধ্যার পর হাত-পা ধুইয়া সুস্থির হইতে গেলেই না যায় দাঁড়ানো, না যায় বসা, শুইয়া-শুইয়া তামাক টানা ছাড়া বেচারির আর গত্যন্তর থাকে না।

ব্যাধি যখন এমনি প্রবল, তখন অভাবনীয় একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়া গেলো।

হঠাৎ সুবল উঠিয়া বসিয়া যে-হাত দিয়া কাঞ্চন অন্যমনস্কের মতো তার কোমরে তেল মালিশ করিতেছিল, সেই হাতখানাই সে খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিলো !

কিন্তু এটা দৈবাৎ নয় ; আমরা সুবলের মনের কথা জানি। কাঞ্চনের মেয়ে খুশির রূপ, শিখাপ্রসূত শিখার মতো ছন্দে-ছন্দে রেখায়-রেখায় তার মায়ের অনুসরণ করিলেও বিবাহ অন্তে বহু বিলম্বে তার গৃহিণী হইয়া উঠিবার কথা। সহধর্মিণী আজকাল কেউ চায় না, সুবলরা আরো চায় না ; ধান ভানিয়া চাল করিতে পারিলেই এবং স্বামী মাঠ হইতে ফিরিলে সেই চাল সিদ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে দিতে পারিলেই অভিযোগের কিছু থাকে না ; কিন্তু সে-যোগ্যতা ফুটিতেও খুশির দেরি আছে।

তবু সুবল খুশিকে বিবাহ করিয়াছে শুধু ইহাই ভাবিয়া যে, সে বয়সে বেশ রূপবতী হইবে। লোকে ভাবিয়াছিল তাই।

কিন্তু সুবলের উদ্দেশ্য ছিলো আগাগোড়া অন্য রকমের।

তার লক্ষ্য ছিলো ঐ কাঞ্চন।

খুশিকে বিবাহ করা ছাড়া কাঞ্চনের হামেশা নাগাল পাইবার উপায় তার ছিলো না। আবার ইহাও সত্য যে, কোমরের ব্যথাটাও তার মিথ্যা। কাঞ্চনকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে হইলে ঐ কোমরে ব্যথার একটা হেতু সৃষ্টি করাই দরকার।

কিন্তু এতোদূর মানসিক ষড়যন্ত্রের ফল যখন একটা অতিশয় বর্বর মূর্তি ধারণ করিয়া সহসা দেখা দিলো, তখন সে শুধু একজনকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত হইলো না, আর একজনকে আঘাতও করিলো।

কাঞ্চনের প্রচণ্ড ধাক্কায় সুবল আবার মাদুরের উপর চিৎ হইয়া পড়িলো ; এবং কাঁপিতে-কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্ধকার শূন্যের দিকে চাহিয়া কাঞ্চনের নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিলো। কিন্তু চোখে জল তার তখনই আসিলো না।

জানি না তার পূর্বের কথা।

কিন্তু এখন যেন তার জীবনের সকল ব্যর্থতা লোকান্তর হইতে ধীরে-ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিলো—অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আকারে। যে অমৃতকুণ্ড একদিন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহার শূন্যতা যে এতো গভীর, এতো শুষ্ক আর এতো তৃষিত তাহা তাহার যৌবনের সুপ্রচুর দীপ্তরাগেও লক্ষিত হয় নাই। সেই অপার শূন্যতার আর্তশ্বাস কোথা হইতে আজ এমন ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া আঘাতে-আঘাতে তার ভিত্তি পর্যন্ত টলাইয়া দিতে চাহিতেছে!

ভয়ে কাঞ্চনের বুক শুকাইয়া উঠিলো। চোখে তার জল আসিলো এবং ক্রোধেও তার সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিলো।

খুশি ঘুমাইতেছিল ; হঠাৎ যাইয়া কাঞ্চন তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই মাথার উপর টপটপ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলো।

সে রাত্রে উনানে হাঁড়ি চাপিলো না।

ঘণ্টাখানেক বেলা হইয়াছে।

খুশি কাঁদিতে-কাঁদিতে আসিয়া কাঞ্চনকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'মা, সুবল আমায় লাথি মেরেছে।'

শুনিয়া দুরন্ত ক্রোধে কাঞ্চনের পা হইতে মাথা পর্যন্ত থরথর করিয়া উঠিলো। শিশু স্ত্রীর প্রতি সুবলের অত্যাচার এই প্রথম ; তাহাদের সমাজে স্ত্রী-অঙ্গ অস্পৃশ্য নহে, প্রহার গা-সওয়া জিনিশ ; কিন্তু কীরূপ মনোভাব লইয়া সুবলের এই অত্যাচার আজ শুরু হইলো তাহাই কাঞ্চনের অন্তরের প্রত্যেকটি বিন্দু অনুভব করিয়া যেমন তাহার জ্ঞান রহিলো না, তেমনি সুবলের খুশিকে বিবাহ করিবার গুহানিহিত গভীর উদ্দেশ্যটা সহসা আঁধার কাটিয়া আজ তাহার চোখের সম্মুখে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট হইয়া গেলো। কাঞ্চন শিহরিয়া উঠিলো।

মেয়েটিকে কোলে করিয়া যখন কাঞ্চন সুবলের সন্ধানে ছুটিলো তখন মেয়ে চিৎকার থামাইয়া সভয় নেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল ফুঁপাইতেছে। অমন প্রলয়ঙ্কর অন্ধকারের বিভীষিকা সে মায়ের মুখে আগে কখনও দ্যাখে নাই।

কিন্তু সুবলকে পাওয়া গেলো না ; সে লাথি ঝাড়িয়াই বাহির হইয়া গেছে।

কাঞ্চন ফিরিয়া আসিলো ; মেয়েকে বলিলো, 'চুপ কর ! আসুক আগে, দেখবো 'খন।'

কিন্তু মেয়ের দুঃখ তাহাতে ঘুচিলো না।

সুবল যখন ফিরিলো তখন কাঞ্চন কুলার উপর ডাল মেলিয়া তার মাটি বাছিতেছে।

সুবলের বুক দুরুদুরু করিতেছিল —সে-শব্দটা শোনা গেলো না ; পায়ের শব্দই অগ্রসর হইতে লাগিলো। কাঞ্চন সেদিকে চোখ ফিরাইতে পারিলো না ; কিন্তু তাহার মন যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলো, সুবলের ঘর্মাক্ত ক্লান্তি, তৃষ্ণার শুষ্কতা।

কাঞ্চন ডালের মাটি বাছিতে-বাছিতে সহজ কণ্ঠেই বলিলো, 'তোমার জল আর গুড় ঢাকা রয়েছে জলচৌকির নিচে। এখনই খেয়ো না যেন, ঘামটা মরুক।'

সুবল এতোক্ষণ ধরিয়া বুকের ভিতর এমন একটা দুর্বহ শঙ্কার পিণ্ডভার বহন করিয়া ফিরিতেছিল যে তার অস্বস্তির অন্ত ছিলো না। বিষাক্ত বাক্যের সঙ্গে গোরুর পাচন হইতে ঢেঁকির মুগুর পর্যন্ত—ইহার মধ্যে যে কোন প্রহরণটা যথেষ্ট কার্যক্ষম মনে হইবে তাহারই কিছু উদ্দেশ না-থাকায় তাহার মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়াছে বই তিলার্ধ কমে নাই।

গায়ের ঘাম মরিবে পরে। আপাতত কাঞ্চনের সহজ কথায় ভয় আর দুর্ভাবনার সজীব পিণ্ডটা তো মরিয়া বাঁচাইল।

সুবল গামছা ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে-খাইতে ঘরে ঢুকিতেছে, এমন সময় খুশি কোথা হইতে চেঁচাইয়া আসিয়া পড়িলো 'মা, ঐ যে সুবল এসেছে।'

শুনিয়া সুবল মুখ ফিরাইয়া একটু মুচকি হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলো, কিন্তু কাঞ্চনের আনত দৃষ্টি কঠিন হইয়া অনেকগুলি কটু উক্তি তার জিহ্বাগ্রে সাজিয়া দাঁড়াইল।

ঢক ঢক করিয়া এক চুমুকে এক ঘটি জল খাইয়া ফেলিয়া সুবল 'আঃ' বলিয়া স্বস্তির একটা নিনাদ করিতেই কাঞ্চন বারান্দা হইতে বলিলো, 'তুমি খুশিকে লাথি মেরেছো কেন?'

কৈফিয়ৎ সুবলের প্রস্তুতই ছিলো; বলিল, 'প্যান্‌প্যানানি আমার ভালো লাগে না দিন রাত।'

খুশি খুব ছোটো এবং সম্পর্কে স্ত্রী হইলেও, মনে-মনে সুবল ভয় করিতেছিল, শুধু ভালো লাগা না-লাগার জবাবদিহি ঠিক কাজে লাগিবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু কাজে যেন লাগিয়াছে।

কাঞ্চনের পক্ষ হইতে তাহার কৈফিয়তের কোনো বাদ-প্রতিবাদ আসিলো না। মনে-মনে খুব একটা আমোদ অনুভব করিয়া সুবল টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে আস্তে-আস্তে উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া কাঞ্চনের দিকে মুখ বাড়াইয়াই থমকিয়া গেলো; দেখিলো, কাঞ্চনের কথা না-বলার কারণ আছে। নিঃশব্দ কান্নার বেগে তাহার দেহ দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতেছে।

মুখে একরাশ কালি মাখিয়া সুবল চোরের মতো সরিয়া গেলো।

সুবলের অভদ্র অন্তরের কাছে গত সন্ধ্যার যে-অপরাধটা এতোক্ষণ তাদৃশ গুরুতর মনে হয় নাই, কাঞ্চনকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহা সহসা এমনই লজ্জার কথা হইয়া উঠিলো যে, ঘরের বাহিরে আসিয়া কাঞ্চনের সম্মুখীন হওয়াই যেন আর সম্ভব নয়।

খুশি আসিয়া বললো, 'সুবল, নাইতে যা, মা বললে।'

সুবল চিৎ হইয়া শুইয়া ছিলো, খুশির মারফতি আদেশে সে নড়িলো না।

খানিক পরে খুশি আবার আসিলো, এবার তেলের বাটি লইয়া; বলিলো, 'সুবল, নাইতে যা শিগগির। মা বললে, এতোই যদি ভয় তবে অমন আর করিসনে।'

সুবলের প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিলো। তৎক্ষণাৎ সে বড়ো-বড়ো চোখ করিয়া খুশির দিকে চাহিয়া গা-ঝাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলো।

একেবারেই অসম্ভব হইলেও তার বড়োই ইচ্ছা করিতে লাগিলো একবার

যাইয়া স্বকর্ণে শুনিয়া আসে কী সুরে কাঞ্চন কথাটা বলিয়াছে ; আর স্বচক্ষে দেখিয়া আসে তখনকার মুখের ভাবটি তার। কথায় যেন ক্ষমার সুর বাজিতেছে। খুশি দিলো নিষ্প্রাণ খবর শুধু—কিন্তু সে-মুখ তখন কঠিন, না কোমল, না কী!

দেরি দেখিয়া কাঞ্চন এবার নিজেই আসিলো ; দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলো, 'খাবে কি খাবে না ব'লে দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমাকে খাওয়ানো ছাড়া আমার আরো ঢের কাজ আছে।'

—'যাই।' বলিয়া সুবল এক খাবলা তেল মাথায় আর গামছা একখানা কাঁধে লইয়া যেন হাওয়ার উপর নাচিতে-নাচিতে বাহির হইয়া গেলো।

কিন্তু অসহ্য আত্মগ্লানির সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিলো যতোদূর কঠোর হইয়া থাকা তার উচিত, ততো কঠোর সে হইতে পারে নাই। আপন পেটের মেয়ের প্রতি তাহার যে-কর্তব্য সে-কর্তব্য সে পালন করিতেছে না। কতো বড়ো অসহায় অবোধ শিশুটি! খেলা ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষার বীজ আজো তাহাতে অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে নাই। ভবিষ্যতের সেই পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে যে-ব্যক্তি কলুষিত অন্তরের ছোঁয়াচ দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে সর্বদাই প্রস্তুত তাহাকে উচিত শাস্তি দিবার ভার তো তাহারই হাতে। অতিশয় ঘৃণার পাত্র সে, সে এমন দূরের জিনিশকে আজই লাঞ্ছিত করিতে এমন করিয়া অবাধে হাত তোলে।

সুবল স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলো, ভাত ঢাকা রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যহ তাহা থাকে না। খুশি পাহারায় রহিয়াছে, বিড়াল না-ডিঙায়।

সুবল মরা নদীর গরম জলে স্নান করিতে করিতে মনটাকে খুশির হাওয়া লাগাইয়া আরো হালকা করিয়া তুলিয়াছিল ; এমনকি, একবার ডুব দিয়া উঠিয়া পুনরায় ডুব দিবার কথা খানিকক্ষণ তার মনেই পড়ে নাই।

কিন্তু যে-অভ্যর্থনা আশা করিয়া সে আসিয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে কোথাও তার লক্ষণ না-দেখিয়া বড়ো দমিয়া গেলো ; বলিলো, 'তোর মা কোথা রে?'

খুশি বলিলো, 'জানিনে। পান তুই সেজে খাস।'

কিন্তু সুবলের ভাতের প্রতি রুচি আর পানের প্রতি লোভ আর একটুও রহিলো না।

কাঞ্চন আসিয়া দেখিলো, সুবল ভাতের সিকিও খায় নাই। কিন্তু তখন তাহার শ্রান্ত মন যেন দু-চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে। একজন না-খাইয়া উঠিয়া গেছে ইহার দুঃখও যেন শুধু অবশ আলস্যের ভারেই তাহার অন্তরাত্মা গ্রহণ করিতে চাহিলো না।

সুবলের ঘরের কপাট ভেজানো রহিয়াছে। একটুখানি খুলিয়া কাঞ্চন দেখিলো, সুবল আর খুশি পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে; সুবলের মুখ ম্লান, খুশির মুখ হাসিতেছে। দৃশ্যটা যুগপৎ যেমন করুণ, তেমনি কৌতুককর।

দরজা পুনরায় ভেজাইয়া দিয়া কাঞ্চন যখন চলিয়া আসিলো তখন অপার শ্রান্তির নির্জীবতা ভাঙিয়া তাহার অন্তর বাহিরের শোণিতমর্মে একটা তীব্র জাগরণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

সহসা সমগ্র ব্যাপারটার চরম নিষ্ঠুরতার দিকে তাহার চোখ খুলিয়া গেলো।

একই শয্যায় স্বামী-স্ত্রী নিদ্রিত। পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশে সর্ব-দেহের অসাধারণ তেজপ্রাচুর্যে একজন যেন পৃথিবীর সমস্ত মর্মহীন রসহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এখন শুধু সর্বব্যাপী ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পাশে পড়িয়া আছে একটি অতিশয় শিশু।

কাঞ্চনের পা দুখানা সম্মুখের দিকে কিছুতেই চলিতে চাহিলো না। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে সুবলের শয়নকক্ষের দ্বার ঠেলিয়া মেয়েটিকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইলো।

কিন্তু মেয়েটিকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিতেই তাহার মনের অবস্থা যে কীরূপ দাঁড়াইল তাহা তাহার নিজেরই জানা রহিলো না। ঝড়ে যেমন পাতা ছোটে, তেমনি করিয়া যেন পশ্চাতে ভূতের তাড়ায় সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেই সে নিরুদ্দেশে ছুটিয়া চলিলো। কোথায় যাইয়া থামিবে তাহা তাহার ভাবনার বাহিরেই পড়িয়া রহিলো।

সুবল ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিলো, বাড়ি জনশূন্য; এবং সেই সুযোগে বাড়িতে গোরু ঢুকিয়া রোদে দেওয়া ধানের পনেরো আনাই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

সুবল বারকতক হাঁকিলো, 'খুশি?'

কিন্তু খুশি তখন মাতৃক্রোড়ে, পুরাতন এক প্রতিবেশীর দাওয়ায়।

কাঞ্চনকে তো ডাকা চলে না, তাহাকে নিঃশব্দে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

বিবাহের পূর্বে কাঞ্চনকে সে নাম ধরিয়াই ডাকিতো; তখনো অন্তরে জাগ্রত কামনা ছিলো, কিন্তু নামের সঙ্গে জড়াজড়ি হইয়া তাহা এমন তীব্র হইয়া ওঠে নাই। আজ তাহাকে নাম ধরিয়া কাছে ডাকিতে তাহার বাক্‌শক্তিটাই যেন দপদপ করিতে থাকে।

কিন্তু সে-পথ বন্ধ। এখন সে ডাকে খুশিকে, কিন্তু যাহা বলিবার তাহা বলে কাঞ্চনের উদ্দেশে; কাজ এক রকম চলিয়া যায়।

খুশিকে ডাকিয়া সাড়া না-পাইয়া সুবল এদিক-ওদিক এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিয়া দেখিলো। খুশি আর তার মা কোথাও নাই।

ধান্য রৌদ্রে দিয়া তাহা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়া কাহারো উচিত কিনা সে-বিষয়ে তাহার বক্তব্য সে ভালো করিয়াই বলিবে, কিন্তু তিলার্ধ রাগ প্রকাশ করিবে না, মনে-মনে এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া সুবল যখন হাত মুখ ধুইয়া একটা পান সাজিয়া গালে দিয়া কলিকার মাথায় আগুন দিয়াছে, এমন সময় বাহিরে খুশিরই কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'দ্যাখ্ তো মা, আমার ঠোঁট রাঙা হয়েছে কিনা পান খেয়ে?'

কাঞ্চন আসিতেছে। এবং তাহার শব্দেই সুবলের সঙ্কল্প উলটাইয়া ধানের রাগটাই নিদারুণ হইয়া উঠিলো। বড়ো কষ্টের ধান।

কিন্তু আসিলো খুশি একা।

সুবল বলিলো, 'তোর মা কই?'

'মা ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। মা বললে, তুই তোর নিজের বাড়িতে যা; তা নইলে সে আসবে না।'

'বটে?'—বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া সুবল চেঁচাইয়া-চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলো, 'নেমকহারাম মেয়েমানুষ নইলে এমন কাজ কেউ করে! আচ্ছা, আমি চললাম, এখনই চললাম। রইলো তোমার বাড়িঘর, আর রইলে তুমি। কী ক'রে তোমার দিন চলে তাই একবার আমি দেখবো। ভুঁয়ের ফসল, খেতের শাক দিয়ে কে ঐ নাদা পেট ভরাবে তাই আমি দেখবো ব'সে-ব'সে; আমার সঙ্গে বেইমানি।' বলিতে-বলিতে রাগ নিবিয়া কোথা হইতে হু হু করিয়া জল আসিয়া তার দু-চক্ষু পূর্ণ হইয়া গেলো।

খুশি বলিলো, 'তুই এখনই যা। মা—'

দ্রুত পায়ের শব্দে খুশি ফিরিয়া চাহিতে না-চাহিতেই কাঞ্চন ঠাশ করিয়া তাহার পিঠে এক চড় বসাইয়া দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া তেমনি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলো।

সুবলের মুখের ব্যথাটা কাঞ্চন স্বচক্ষে দ্যাখে নাই, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছে, কেমন করিয়া সে-কণ্ঠস্বর অশ্রুভারে অচল হইয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেছে।

কাঞ্চনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিলো, যেন কে পাক দিয়া মুচড়াইয়া তুলিলো। কিন্তু খুশিকে যখন কথাগুলি সে বলিতে শিখায় তখন তো ঘুণাক্ষরেও সে অনুভব করিতে পারে নাই যে তাহারই কথা অপরের মুখ দিয়া বাহির হইবার সময় এমন দুঃসহ কঠিন হইয়া তাহারই কর্ণে প্রবেশ করিবে। তখন

সে হাজারো রাগের মধ্যে মনে-মনে একটু হাসিয়াছিল, তা কি সে পারে! আর যা-ই পারুক, চোখের আড়ালে সে যাইতে পারিবে না।

কিন্তু পারে কি না সে-পরীক্ষা শেষ হইবার পূর্বেই কাঞ্চনকে উলটা গাহিতে হইলো।

খুশি আসিয়া বলিলো, 'মা যেতে বারণ করলে।'

সুবল কথা কহিলো না, হাত তুলিয়া চোখ মুছিলো না, চোখ তুলিয়া চাহিলোও না। অপমান আর নিমকহারামি তার বড়ো বাজিয়াছে। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকাও চলিলো না। খুশির সঙ্গে-সঙ্গে সে বাহিরে আসিয়া বলিলো, 'আমি কারো খেয়ালের চাকর তো নই যে, হুকুম করলে বেরিয়ে যাও, অমনি বেরিয়ে গেলাম; আবার তখুনি হুকুম হ'লো থেকে যাও, অমনি থেকে গেলাম। এতো দায় আমার কিসের?'

প্রশ্ন করিয়া সুবল উঠিপড়ি তামাক টানিতে লাগিলো; এবং একটু বিলম্বে তার প্রশ্নের জবাব আসিলো।

কাঞ্চন আড়াল হইতেই বলিলো, 'দায় তোমার নয়, দায় সব আমার, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার উচিত ছিলো, আমার বলবার আগেই স'রে যাওয়া। মানুষের আক্কেল তোমার নেই—থাকলে তা-ই করতে।'

সুবল বলিলো, 'ঝগড়া ক'রে তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না এ জানা কথা, আমি তো নই-ই। কিন্তু আমার অপরাধ কী?'

সুবলের এই প্রশ্ন যেমন দুঃসাহসিক তেমনি নির্লজ্জ। সুবলের অন্তরভূমি কাঞ্চনের চোখের সামনে যেন প্রসারিত হইয়া দেখা দিলো; সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলো, বহুদিনের সঞ্চিত ইচ্ছা খলতায় ছলনায় পরিপূর্ণ হইয়া শামুকের মতো ধীরে-ধীরে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

কাঞ্চনের গায়ে কাঁটা দিলো।

পাপিষ্ঠের এই লজ্জাহীন সহজ ধৃষ্টতায় তার ক্রোধের অন্ত রহিলো না। কণ্ঠে তার কথা ফুটিলো না; ফুটিলে কী সুর বাহির হইতো কে জানে, সে শুধু কাঁপিতে-কাঁপিতে দু-পা সরিয়া আসিয়া আঙুল তুলিয়া সুবলের পরিত্যক্ত বাড়িটা তাহাকে দেখাইয়া দিলো; এবং দ্রুত পদে ঘরে ঢুকিয়া মাটিতেই লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলো, 'ভগবান, আমায় বাঁচাও, বাঁচাও।'

খুশি আসিয়া খবর দিলো, 'মা, সুবল চ'লে গেছে।'

খুশি আশা করিয়াছিল, সুসংবাদটা শুনিবামাত্র তার মা লাফাইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হইলো।

খুশি আবার ডাকিলো, 'মা, ওঠো না, সুবল চ'লে গেছে।'

'চলে গেলো?'—বলিয়া কাঞ্চন চোখ তুলিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইলো।

খুশি ছোট্টো মেয়ে: রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া অনুসন্ধিৎসু বা সংশয়াকুল হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অপরিসীম অন্তর্দাহের সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে-লাগিলো, মেয়েকে এই চক্ষু দেখাইবার মতো প্রবঞ্চনা আর পাপ জগতে আর কিছু নাই।

সারাদিন সুবলের সাড়া পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর একটু খুটখাট শব্দ শোনা যায়: আর দেখা যায়, সুবলের ঘরের অসংখ্য ছিদ্রপথে বাহির হইতেছে ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার দিকে কাঞ্চন চাহিতে পারে না;

দিবসের নিরলস কর্মচঞ্চলতার মধ্যে মনটা তার দিক-যন্ত্রের কাঁটার মতো অনুক্ষণ একই দিকের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

খুট করিয়া একটু শব্দ। কোথায় তার ঠিক নাই—

অমনি কাঞ্চনের কান, মন, স্নায়ু, জ্ঞান যেন রোমে-রোমে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ওঠে। বেলায় যতো ভাঁটা পড়ে মন তার ততো সচেতন হয়। ঘর্ঘর করিয়া তার জাঁতা চলে। সপসপ করিয়া তার ঝাঁটা চলে। খরখর করিয়া তার খুন্তি চলে। কিন্তু সকল শব্দের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্রতম শব্দ, একটি আগমনবার্তা, ক্লান্ত এতোটুকু সুর, তার কল্পনার সুদূর দিগন্তরাল হইতে অবিশ্রান্ত মাথা তুলিতে থাকে। হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে, শব্দ যেন আসিয়াছে। পরক্ষণেই তার হতাশা আর ক্লেশের অবধি থাকে না, এতো আশার প্রথম শব্দটি বুঝি এড়াইয়া গেছে। কাজ ফেলিয়া বহুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে

হঠাৎ একদিন অভ্যস্তক্ষণে না আসিলো শব্দ, না উঠিলো ধোঁয়া।

কাঞ্চন খানিক এ-ঘর ও-ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইয়া খুশিকে ডাকিয়া বলিলো, 'ও-বাড়িতে সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে; দেখে আয় তো সুবল এসেছে কি না।'

খুশি দৌড়াইয়া গেলো এবং অনতিবিলম্বেই দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিলো, 'সুবল আসেনি, মা।'

'চল্, দেখে আসি।' বলিয়া খুশিকে লইয়া সুবলের বাড়িতে কাঞ্চন নিজেই গেলো।

রান্নাঘরের শিকল খুলিয়াই যে দৃশ্য তার চোখের সম্মুখে সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলো তাহাতে তার চোখের জল যেন কিছুতেই বশ মানিতে চাহিলো না! কলার পাতার উপর রাশীকৃত উপকরণহীন অভুক্ত অন্ন শুকাইয়া চাল হইয়া উঠিয়াছে, ইন্দুরে তা ঘরময় ছড়াইয়াছে।

এ কালকার সন্ধ্যার আহারের আয়োজন। তারপর আজ সমস্ত দিনটা গেছে।

অন্নস্তূপের দিকে চাহিয়া কাঞ্চনের চোখ ঝকঝক করিতে লাগিলো; একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কাঞ্চন বলিলো, 'একটু গোবর কুড়িয়ে আন তো, খুশি, এঁটোটা মুক্ত ক'রে ফেলি।'

কিন্তু সুবলের পরিবারের তাহাতে আপত্তি দিলো, সে বলিলো, 'ওমা, এ যে সুবলের ঘর।'

'তা হোক, তুই আন্।'—বলিয়া কাঞ্চন এঁটো সাপটাইতে শুরু করিয়া দিলো; কিন্তু কাজ সমাপ্ত হইলো না। গোবরের সন্ধানে খুশি উঠানে নামিয়াছিল, সেখান হইতেই সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলো, 'ওমা, সুবল এসেছে।' বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলো।

খুশির কাছে ব্যাপারটা একেবারেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু, একটা লুকোচুরির ব্যাপার এখন চলিতেছে; এবং সুবল ঠিক এই সময়টিতেই আসিয়া পড়ায় তাহার মায়ের একটু বিপদ হইয়াছে, তাহা খুশির স্বল্পবুদ্ধির কাছেও ধরা পড়িয়াছে।

সুবল সোজা ঘরের ভিতর উঠিয়া গেলো। কাঞ্চন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুইজন সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া—চারি চক্ষু মিলিত হইলো। সুবলের মুখখানা কৌতুক-হাসিতে ভরিয়া উঠিতে-উঠিতে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলো; এবং কাঞ্চনের দেহ ও মনের সমগ্র চেতনা একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিলো—যেমন তীব্র স্রোতের মধ্যে জলের পাক।

দূর-দূরান্তর হইতে দুর্নিবারবেগে আকর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পদার্থ যেমন ঘূর্ণিত জলের গহ্বরে ছুটিয়া আসিয়া চক্ষের পলকে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি একটা মহাশক্তির দুর্জয় ক্রিয়া ঘটিতে লাগিলো কাঞ্চনের সমগ্র চৈতন্য ব্যাপিয়া। একটি নিমেষে ইহজগৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান একেবারে মুছিয়া যাইয়া একটি প্রোজ্জ্বল বিন্দু শুধু তার চোখের সম্মুখে মুদ্রিত হইয়া রহিলো।

খুশি উঠান হইতে চেঁচাইয়া বলিলো, 'মা, কে এসেছে দ্যাখো।'

সুবল মরিয়া গেলো। তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কাঞ্চন বাহিরে আসিলো ; কিন্তু যে প্রাণান্তকর আবর্ত তাহাকে এইমাত্র উদ্গীরণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার চিহ্ন তো সহজে মুছিবার নয়।

আগন্তুক রমণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাঞ্চনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো, কিন্তু প্রশ্ন করিলো খুশিকে, 'ঘরের ভিতর আর কে রে ?'

'দুর্গা, দুর্গা। আর একদিন আসবো লো কাঞ্চন ; আজ বড়ো অসময়ে এসে পড়েছি। তুই বুঝি এখন গা ধুতে যাবি ?'—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাসিটাকে দেখাইয়া-দেখাইয়া সে অঁাচল চাপা দিলো।

কাঞ্চন ভাবিলো, এই আমার প্রাপ্য ; প্রায়শ্চিত্তের শুরু এই। বলিলো, 'না, পিসি ; চলো আমার ঘরে। সুবলের এঁটোটা মুক্ত করতে এসেছিলাম।'

পিসি বলিলো, 'তা বৈ কি ; তা ছাড়া আর এ-সময়ে কী কাজে আসবি। কাল আসবো ; কাজ আমার তেমন কিছুই নেই।' বলিতে-বলিতে কাঞ্চনের পিসি কাঞ্চনের শকড়ি হাতের দিকে একবার বক্র কটাক্ষে চাহিয়া এক পায়-দু পায় বিদায় হইয়া গেলো।

যেন প্রাণ তার দেহে নাই—এমনি নিশ্চল আর বিবর্ণ হইয়া সেই উঠানের মাঝখানেই কাঞ্চন দঁাড়াইয়া রহিলো।

খুশি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিতে লাগিলো, 'মা, চলো, ভয় করছে।'

যে-ঘরের ভিতর হইতে কাঞ্চন কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া আসিয়াছে সেই দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিলো ; অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হইলো না।

খুশির দিকে চাহিতে কাঞ্চনের ভয় করে।

রাত্রে সে বেশ থাকে ; অন্ধকারের আবরণ যেন তাহাকে একান্ত একাকী করিয়া পৃথিবীর সঙ্গে তার সংস্পর্শের স্থানটিতে একটি দীর্ঘ অটল ছেদরেখা টানিয়া দেয়, সে যেন লুকাইয়া বঁাচে।

কিন্তু স্পষ্ট দিবালোকে নিজের দেহটাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সারা প্রাণ ছমছম করে।

খুশিকে স্পর্শ করিতে হাত উঠিয়াই যেন ধাক্কা খাইয়া হাত ফিরিয়া আসে ; মনে হয় তাহারই স্পর্শের ভিতর দিয়া কী-একটা অজ্ঞাত বিষাক্ত বস্তু মেয়ের জীবনের উপর ঝরিয়া পড়িয়া তার অ-কল্যাণের আর কিছু বাকি থাকিবে না। খুশি যেন ছাগশিশু, করালীর তৃষ্ণার আগুন তাহার জীবন-মুকুলটি লক্ষ্য করিয়া অহরহ জিহ্বা দুলাইতেছে।

কাঞ্চন হঠাৎ শিহরিয়া চোখ বোজে। চোখ বুজিয়া নিজের দিকে চায়; দ্যাখে, দিক্‌চিহ্নহীন অসীম প্রান্তর, তার কোথায় শব্দ নাই, কুয়াশা নাই, শৈত্য নাই, গতি নাই, প্রখর সূর্যকিরণ তাহার মধ্যস্থলে একটি মরীচিকার স্বচ্ছ সরোবর সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্বদেহ কাঁপিয়া রোমাঞ্চ জাগে। চোখ খুলিয়া বলিয়া ওঠে, 'চল্, খুশি, বেড়িয়ে আসি।' বলিয়া খুশিকে পুরোভাগে লইয়া কাঞ্চন পল্লির পথে পথভ্রান্তের মতো চলিতে থাকে।

কাঞ্চনের মনের মোটামুটি একটা খবর এতোদিনে সুবলের জানা হইয়া গেছে। মনের সেই তীব্র প্রকাশ বর্বরেরও, অন্তত আংশিকভাবেও, না-বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু সেটা কতোটা তীক্ষ্ণ, কতোটা অনুকূল, তার কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিরাগ, কোথায় বিপত্তি—এতো সূক্ষ্ম বিচার এবং অনুভূতির ধার ঘেঁষিয়া যাওয়াও অন্ধ সুবলের সাধ্য নয়।

কিন্তু তাহাতে তাহার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে কিছু বাধিলো না; অথচ ভয়টাও একেবারে নিঃশেষ হইয়া কাটিতে চাহিলো না। কখন অনুকূল আহ্বানটি একেবারে নির্ভয় নিঃসংশয় করিয়া দিয়া অভ্রান্ত হইয়া দেখা দিবে তাহারই আশা মারাত্মক হইয়া উঠিয়া তাহাকে অশোয়াস্তির একশেষ করিয়া তুলিলো।

সুবল কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলো। খুশি মাঝে-মাঝে আসে, নারিকেলের মালাটা, গাছের তলাকার ফলটা কুড়াইয়া লইয়া যায়।

সুবল তাহাকে আসিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করে, 'তোর মা আমায় ডেকেছে নাকি?'

খুশি বলে, 'না।'

'তবে তুই এখানে কেন?' বলিয়া তড়াং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সুবল বারান্দা হইতে আঙিনায় পড়ে।

খুশি ছুটিয়া পালায়।

কাঞ্চন আসে; বলে, 'খবর্দার, খুশির গায়ে হাত তুললে তোমার ভালো হবে না।'

থাকিতে-থাকিতে সুবল ছিঁচকে হইয়া উঠিলো; ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়ায়, উঁকি-ঝুঁকি মারে, শুভযোগের ক্ষণটি খোঁজে।

কাঞ্চনের দেহ ভালো নাই ; চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে ; রঙে ময়লা লাগিয়াছে ; একটা জীর্ণ শুষ্কতা যেন তার সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে, মাঝে-মাঝে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া সে চোখে অন্ধকার দ্যাখে। সর্বশরীরের এমনই অবসাদ অশেষ দৌর্বল্য লইয়া কাঞ্চন শুইয়া আছে ; ঘরের ভিতরকার মাটির প্রদীপটি টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে, খুশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুবল কাঁপিতে-কাঁপিতে কাঞ্চনের দাওয়ায় উঠিলো। নিঃশব্দে ; দরজায় চোখ লাগাইয়া দেখিলো, কাঞ্চন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে গায়ে কাপড় নাই।

বন্ধ দরজার সামনে সুবল মুহূর্তেক আড়ষ্ট দেহে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঠেলিয়া দরজা খুলিলো ; এবং তাহারই শব্দে চোখ খুলিয়া দরজার সম্মুখেই সুবলকে দেখিয়া কাঞ্চন তাড়াতাড়ি কাপড় টানিয়া গায়ে দিয়া উঠিয়া বসিলো ; এবং পরক্ষণেই তাহার সকল আচ্ছন্নতা ভাঙিয়া কণ্ঠ দিয়া যে স্বর নির্গত হইতে লাগিলো সুবল তেমনটি আর কখনো মানুষের মুখে শোনে নাই। কাঞ্চন চিৎকার করিতে লাগিলো—'যাও যাও, যাও আমার সামনে থেকে, শিগগির যাও, যাও বলছি, যাও যাও—'

তার কণ্ঠস্বরে আর মাটির প্রদীপের দুর্বল আলোকে কাঞ্চনের মুখাবয়বের যেটুকু দেখা গেলো তাহাতেই সুবল চমকিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেলো। সে দৃষ্টিতে হিংস্র রক্তালুতা ছাড়া আর যেন কিছু নাই।

কাঞ্চনের দুর্বল মস্তিষ্ক এতোটা উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিলো না ; চিৎকার কণ্ঠের ঊর্ধ্বতম সোপানে উঠিয়াই সহসা বন্ধ হইয়া সে জ্ঞান হারাইয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িলো।

কিন্তু সুবলের পশুত্ব তখন ক্ষিপ্ততার চরম স্তরে উঠিয়া গেছে।

উভয়ে আর কথা হয় না। অভিশপ্ত রাজপুরীর মতো অপরিসীম চঞ্চল অশান্তি নিস্পন্দ পাষাণ হইয়া গেছে।

২

বামনদাস অধিকার অধিকারীর ডাক-নাম জুজু। কথাটি আকারে ছোটো কিন্তু অর্থে গভীর। বামনদাসের পরাক্রমে বাঘে-গোরুতে একই ঘাটে জল না খাইলেও অনাচার যে গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে ঘটিবার উপায় নাই ইহা ঠিক।

বামনদাসই সুবলদের বাস্তবাটির মাটির মালিক। গ্রামের অতি আধুনিক এই নৈতিক অস্বাস্থ্যের কথা তিনি আগে কিছুই শোনেন নাই ; পিসি সেদিন স্বচক্ষে সেই কাণ্ডটা দেখিয়াও প্রকাশ করে নাই। পিসি জানিতো, ভগবান

আছেন, পাপের ফল তিনি পাপীর অঙ্গেই একদিন না একদিন ফুটাইয়া তুলিবেন।

পিসির আশা ফলবতী হইয়াছে এবং পিসির চক্ষেই তাহা ধরা পড়িয়াছে।

কানে-কানে চলিতে চলিতে কথাটা একদিন বামনদাসেরও কানে ঢুকিয়া গেলো; এবং মাটির মালিক মাটি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন! মাথায় জটা থাকিলে তাহা খাড়া হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতো নিশ্চয়।

'পাকড় লে আও।'—বলিয়া হুহুঙ্কারে হুকুম দিয়া তিনি গ্রেপ্তার করাইয়া আনিলেন আগে সেই 'পাপিষ্ঠা'কে, তারপর সুবলকে।

পিসিও সেখানে ছিলো। কাঞ্চনকে দেখিয়াই সে লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া আড়ালে যাইয়া ওৎ পাতিয়া বসিলো।

বামনদাস বলিতে লাগিলেন, এবং সে শব্দ বোধহয় সত্যস্বরূপ মহাপুরুষের পাদপাঠে মাথা ঠুকিতে লাগিলো, 'মেয়েমানুষে আশকারা না দিলে বেটাছেলের সাধ্য কি তার কাছে এগোয়। কথা কসনে যে, হারামজাদি?'

তারপর এমনি ব্রহ্মতেজ শব্দ-ব্রহ্মের মূর্তি ধরিয়া তার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইতে লাগিলো যে বাড়ির লোকে শুনিয়া শিহরিয়া কানে আঙুল না দিক, অবাক হইয়া গেলো।

তারপর কাঞ্চনের চুল ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া এমন খড়ম পেটা করিলেন যে, যে-ভূত মারের চোটেও পালায় না, সে তখন ঐ মার দেখিলেই পালাইত।

বামনদাস শ্রান্ত হইয়া একটু বসিলেন; সুবলের ব্যবস্থা পরে হইবে।

কাঞ্চনের গা ফাটিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিলো—

তার ধুলি-লুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহ সম্মুখে করিয়া একদিকে বসিয়া রহিলেন কম্পিতকলেবর বামনদাস, অন্যদিকে বসিয়া রহিলো নির্বাক সুবল। রক্তধারার দিকে বিহ্বলের মতো চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সুবল সহসা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বামদাসের পায়ের উপর আড় হইয়া পড়িলো; বলিলো, 'যতো দোষ আমার, আমাকেও মারুন।'

যতো দোষ সুবলের ইহা বামনদাস বিশ্বাসই করিলেন না; লাথি মারিয়া সুবলকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'বড়োই মায়া দেখছি যে! আমার নাম বামনদাস অধিকারী, আমি সব বুঝি সব জানি। স্বর্ণলঙ্কা ছারে খারে গেল উরি জন্যে, কুরুকুল ধ্বংস হ'লো উরি জন্যেই; আমায় কিছু শেখাতে কেউ এসো না।

মাগিতে জাদু না করলে পুরুষ কি অমনি ভেড়া হয় ! হারামাজাদা, তোরও কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই ?'

বামনদাসের মারিবার ইচ্ছাটা কাঞ্চনের উপরেই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণলঙ্কা ছারে খারে যাইবার এবং কুরুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার কারণটা ব্যক্ত করিয়া, এবং বুদ্ধিহীনতার জন্য সুবলকে ধিক্কৃত করিয়া তিনি হাঁকিলেন, 'কে আছিস রে ?'

খতের আসামী ভীম দাস সেখানে হাজির ছিলো ; তাহাকেই সম্মুখে পাইয়া বামনদাস হুকুম দিলেন, 'ডেকে আন ষষ্ঠী, ফটিক, মানিক, নিবারণ এদের সবাইকে ; আর পথে যাকে পাবি, ধ'রে আনবি।'

সুদের দায় বড়ো দায়। বামনদাসের মুখের কথা ভালো করিয়া না ফুরাইতেই ভীম দাস তীর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলো।

ষষ্ঠী, ফটিক, মানিক, নিবারণকে এবং পথে যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া ভীম দাস বামনদাসের বাড়ি দেখিতে দেখিতে লোকে পূর্ণ করিয়া দিলো।

বামনদাস বলিলেন, 'আয় সঙ্গে।' বলিয়া তিনি নিজেই কুঠার হস্তে অগ্রসর হইয়া গেলেন ; এবং তাঁহার নেতৃত্বে ষষ্ঠী, ফটিক, মানিক, নিবারণ সবাই মিলিয়া কাঞ্চন আর সুবলের বাসের ঘর আর রান্নার চালা দুই মিনিটে ভূমিসাৎ করিয়া দিলো। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া পাপের এই শাস্তিভোগ প্রত্যক্ষ করিলো।

ফিরিয়া আসিয়া ষষ্ঠী,ফটিক, মানিক, নিবারণ প্রমুখ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বামনদাস বলিলেন, 'তোরা সবাই একটা ক'রে লাথি মেরে যা এই শালীর পিঠে।' বলিয়া কাঞ্চনকে দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই আদেশ কেহ পালন করিলো না ; বোধহয়, তার পিঠের উপরকার রক্তমাখা কাপড়ের দিকে চাহিয়াই সে দিকে কাহারো পা উঠিলো না।

কেবল পিসি দূর হইতে বলিলো, 'ওমা আবার কী হবে !'

বামনদাস তখন নিজেই কাঞ্চনের পিঠে আর এক লাথি এবং সুবলের ঘাড়ে আর এক ঘুসি মারিয়া বলিলেন, 'গ্রামের সীমানা পার ক'রে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ। যাও, ওঠো'—বলিয়া তিনি গ্রামের পশ্চিম সীমানার দিকে আঙুল তুলিয়া রহিলেন।

খুশি তখন তার মায়ের কোলের উপর চিৎ হইয়া বলিতেছে, 'মা, ওঠো, চলো বাড়ি যাই।'

## অপহৃত আকাশ-কুসুম

উল্লাস চৌধুরীর বয়স এই একচল্লিশ।

বিরোধ বাধাইতে কেহ অগ্রসর না হইলে নিজে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়া বিরোধ বাধায় না—ইহাই উল্লাসের স্বভাব; এবং তাহার এই নির্বিরোধ স্বভাবটির সঙ্গে তার চেহারা বেশ খাপ খাইয়াছে—দেহটা সমগ্রভাবে দেখিতে খুবই বৃহৎ আর প্রচণ্ড মনে হয়, যেন কঠিন পর্বত একটি; কিন্তু চক্ষু-দুটি অহরহই এমন কৌতুকচঞ্চল যে, কেবল তাহার মোটা হাড় আর দেহের দৈর্ঘ্য দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, রাগের মাথায়ও উল্লাস দুর্বার হইয়া উঠিতে পারে না। উল্লাসের দেহের আকৃতির আর মনের প্রকৃতির কার্যকরী বলের এই অসমতা যেন আনন্দই দেয়। চুলগুলি তার কোঁকড়াও নয়, সম্পূর্ণ খাড়াও নয়—প্রথম যৌবনে শিক্ গরম করিয়া চুলগুলিকে কুঞ্চিত করিতে বারকতক সে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ ব্যাপারে তার ধৈর্য দেখিয়া তাহার বিশেষ বন্ধু শৈলধর অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে-কুঞ্চন স্থায়ী হয় না দেখিয়া সে-শিকই সে ফেলিয়া দিয়াছে। উল্লাসের গায়ের রং ফরশা বলা যায় না, তবে ষোলো-আনা কালোও সে নয়। সে যাহাই হউক, উল্লাসের বয়স এই একচল্লিশ চলিতেছে—আদি যার স্মরণে নাই এমনই চল্লিশটি বৎসর পার হইবার পরও আরও একটি বৎসর যায়-যায়। গণিতে প্রায় অসংখ্য ঐ চল্লিশটি বৎসর উল্লাস চৌধুরী ছাড়া অন্যত্র কোথাও দুরপনেয় চিহ্ন রাখিয়া, আবার উল্লাস চৌধুরী ছাড়া অন্যত্র কোথাও দুরপনেয় চিহ্ন বলিয়া যাহাকে মনে করা হইতো তাহাকে নির্মম লেহনে একেবারে চিহ্নহীন করিয়া মাথার উপর দিয়া আর গা ঘেঁষিয়া যেন উড়িয়া গেছে—উল্লাসের গায়ে তাহার পাখার বাতাস কি নখের দাগ যেন লাগেই নাই। উল্লাস চৌধুরীর একবারও মনে হয় না যে, তাহার বয়েস চল্লিশোর্ধ্ব—একচল্লিশ, সে কথাটা তার দৈবাৎ মনে হয় না, ঘা খাইয়া মনে হয় না, অনুভব করিয়া মনে হয় না, অর্থাৎ উল্লাস চির-যুবক। তার চোখে চালশে লাগে নাই, অথবা লাগিয়াছে কিনা ধরা পড়ে নাই। মাঝে মাঝে তাহাকে ভুরু দুটিকে জড়ো করিয়া তাকাইতে হয় বটে, কিন্তু সেটা উল্লাস চৌধুরীর দৃষ্টির দোষ, কি যে বস্তুকে সে দেখিতেছে তাহারই অনুজ্জ্বলতা বা ক্ষুদ্রতা

তাহার কারণ, কি আলোর অপ্রাচুর্যই তার অস্পষ্ট দেখিবার হেতু তাহা সে জানে না।

যাহাদের বয়স দৈবক্রমে একচল্লিশেরও বেশি, যথা সাতচল্লিশ, কি বায়ান্ন, কি তেষট্টি, তাহাদের কাছে উল্লাস চৌধুরী সগর্বে বলে বটে : আর তো বুড়ো হলাম আমরা !...বলে বটে, কিন্তু নিশ্বাসের ছায়াও তার নাক দিয়া বাহির হয় না ; বৃদ্ধ হইবার কাতরোক্তি তাহা মোটেই নয়। যৌবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিশাবে যাহাদের পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ যাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া দূরে থাকিতে হইয়াছে তাদের দলভুক্ত হইবার আবেদন সেটা—কিঞ্চিৎ আশকারা পাইবার চেষ্টা ; যেন বয়সটা অতি প্রাচীন একচল্লিশে পৌছিয়া উহাদের সবাইকার সঙ্গে তাহাকে কেবল পঙক্তিবদ্ধ নয়, একাকার করিয়া দিতে বাধ্য। বয়সের নৈকট্যের ভান করিয়া বৃদ্ধদের সঙ্গে কৌতুকে অগ্রসর হইবার সুবিধা খোঁজা—আর কিছু নয়। কথাটা বলিয়া উল্লাস সকৌতুকে হাসে।

বয়সে যারা ছোটো তাহাদের কাছেও উল্লাস চৌধুরী নিজের একচল্লিশের দম্ভ করে—যেন, দেখিয়া-শুনিয়া ভুনিয়া সম্বন্ধে তার পরিপক্বতার অন্ত নাই, নাবালকদের সে-ও একজন অভিজ্ঞ মুরুব্বি।

এক কথায়, বয়স যে একচল্লিশ, অর্থাৎ জোয়ার বহিয়া যাইয়া ভাঁটার শুরু হওয়ার পরও যে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া স্রোত নিস্তেজ আর অবনমিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, বিধাতার আশীর্বাদে উল্লাস চৌধুরী তিলমাত্রও এবং ক্ষণমাত্রও আজ পর্যন্ত তাহা অনুভব করে নাই।

উল্লাস চৌধুরী সবই কিছু-কিছু জানে—

ওস্তাদের শাকৃরেদি করিয়া লাঠিখেলা শিখিতে গিয়াছিল ; ওস্তাদের বিদ্যাদান দক্ষতায় ঘাত-প্রতিঘাতের সমস্ত কায়দা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও প্রয়োগ-কৌশল তেমন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ওস্তাদজির বুক বরাবর মাথা নামাইয়া নমস্কার করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল।...গান-বাজনা শিখিতেও একদা সে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল ; ইচ্ছা ছিলো, পরম বিদ্যার ষোলো-আনাই শিখিয়া ফেলিবে ; কিন্তু গুরুর দাতব্যের মধ্যে গানের দুটি রাগিণী এবং বাজনার তিনটি তালের বোল কেবল কণ্ঠস্থ হওয়া ছাড়া ব্যুৎপত্তির দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই—

গুরুকে এক ভরি গাঁজা প্রণামী দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সর্বাগ্রে সাধারণ কেতাবি বিদ্যাই সে নিশ্চয়ই শিখিতে গিয়াছিল ; কিন্তু তার তখনকার চুল যেমন কোঁকড়া হয় নাই, তেমনি লেখাপড়াতেও সে চেষ্টা ও

অধ্যবসায় সত্ত্বেও পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে নাই ; উচ্চ-প্রাইমারি পরীক্ষায় ফেল করিয়া হেড পণ্ডিতের পায়ের ধুলা লইয়া দিন সাতেকের জন্য হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল।

তবু উল্লাস চৌধুরী আছে ভালো, গৃহস্থ হিশাবে যে এখন বেশ গতিশীল ; জমিদারি শেরেস্তায় সে কাজ করে, মাসে দশ টাকা বেতন পায় ; উপরি পাওনা আছে ; কিছু জমি আছে—উৎপন্ন ধান্য প্রভৃতি যাহা পায় তাহা তাহার বৎসরের গড়ে সাত মাসের খোরাক।

এ-সব ছাড়াও আরো সৌভাগ্যের বিষয় ইহাই যে উল্লাস চৌধুরী তেরো বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিল একটি নয় বৎসর বয়সের মেয়েকে। ক্রমপরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার এখন দুটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র—

কিন্তু বলিতে যতক্ষণ, আর অতীত হইবার পর ফিরাইয়া অনুভব করিতে গেলে যতক্ষণে মনে হয় ততক্ষণে, অর্থাৎ অত অল্প সময়ে তার যৌবন অতীত ব্যাপারে দাঁড়াইয়া যায় নাই।

নয় বৎসর বয়সের বালিকা মানিনী নবম বৎসর যথা সত্বর পার হইয়া দশে পড়িলো ; এবং তারপর সে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি বৎসরই ঢেউয়ের মতো গায়ের উপর দিয়া পার করিয়া দিলো···এবং একদিন দেখা গেলো, যৌবনের শ্রীমাধুর্য গৌরব আর পরমৈশ্বর্যের পূর্ণাধিকারিণীরূপে সে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে—বলা বাহুল্য, উল্লাসের চোখের সামনে। স্ত্রীর ঐ অভাবনীয় শারীর-সমৃদ্ধি, অর্থাৎ অধিপতি উল্লাসের নিজেরই ঐ চমকপ্রদ সম্পদ, উল্লাসের চোখে পড়িলো না এমন নহে। গ্রাম্য ক্ষুদ্র একটি লোক হইলেও এবং অতীব নগণ্য উচ্চ-প্রাইমারি পরীক্ষাতেই ফেল-করা ব্যক্তি হইলেও উল্লাস লক্ষ করিতো প্রেয়সী মানিনী সুন্দরী এবং সমাগত-যৌবনা···

তার নিমীলিত পল্লবাচ্ছাদিত চক্ষু দুটি সুন্দর—উন্মীলিত চক্ষু দুটিও সুন্দর ; চোখের তারা দুটি আবার চঞ্চল, যেন দুষ্টু ; এমন অশেষ চঞ্চল যে, আর চাঞ্চল্যের এমনিই ভঙ্গি, ক্রীড়ায়-ব্রীড়ায় তাহাতে এমনি সংমিশ্রণ যে, আর তাদের এমনি উৎফুল্লতা যে দিশেহারা করিয়া দেয়···তাহার সমস্ত দেহখানার দিকে, পা হইতে শুরু করিয়া মাথা পর্যন্ত যে সুডৌল সমগ্রতা বিরাজ করিতেছে তাহার দিকে, দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেরই মনে মুহুর্মুহু এতো বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়, আর মনে এমন মধুর সখ্যরসের নির্ঝর স্ফুটিতে থাকে যে, উনিশ বছরের উল্লাস চৌধুরী অবাক হইয়া ভাবে কেন এমন হয়! উহার দেহের ধারণাতীত সেই বস্তুটা কি যাহা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া চুমুক দিয়া পান করি—আর যাহার গুণে

সারা মন আচ্ছন্ন আর সারাদেহ শিহরিত করিয়া এমন মাদকতার সৃষ্টি হয়···মনে হয়, আমি মরিবো না, ও মরিবে না···আরো মনে হয়, বহুৎ ভাগ্যের জোর আমার।

কেন এমন ঘটে সে রহস্যটা কী, তাহা উল্লাসের বিশেষ বন্ধু শৈলধর স্থূল কথায় মাঝে-মাঝে বুঝাইয়া দেয়···

শৈলধরও বলে, 'তোর বরাতের জোর খুব।'

উল্লাস মানিনীর পাশে বসিয়া পড়িয়াই মুখখানা তার মুখের দিকে আগাইয়া দেয়—মানিনীর নিশ্বাস আর দেহ সুরভির পরিধির ভিতর···তখন উল্লাসের হাড়ের ভিতর যে রস চলাচল করে সেই মর্মরস-প্রবাহই যেন কাঁপিয়া-কাঁপিয়া সম্প্রসারিত হইতে থাকে···

তীরের ফলকের মতো অতি তীক্ষ্ণ একটা ঋজুতা লাভ করিয়া যেন তাহার প্রাণসত্তার উপরিভাগে উঠিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে···

বলে,—'একটা চুমু।'

মানিনী তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বলে,—'না।'

—'না, দাও।'

উল্লাসের মনে হয়, আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনটি না পাইলে সে বাঁচিবে না।

মানিনী তখন যেন নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই তার অনুরোধ রক্ষা করে—আলগোছে স্বল্পক্ষণস্থায়ী একটি চুম্বন দেয়।

উল্লাসের পাওয়ার ইচ্ছার আগুন তাহাতে প্রশমিত হয় না—

বলে,—'এইটুকু নাকি?'

মানিনী ভ্রুভঙ্গি করে, যেন জানাইতে চায় সে বিরক্ত হইয়াছে, তারপরই ফিক্ করিয়া একটু হাসে, বলে,—'আচ্ছা তুমি!' বলিয়াই অকস্মাৎ দু-হাত তুলিয়া তাহার গ্রীবালিঙ্গন করিয়া তাহাকে যেন সর্বতনু দিয়া গ্রাস করিয়া ধরে—অধরে অধর মিলায়, অতল গভীর আর সুদৃঢ় আর অমৃত আর আত্মহারা একটি চুম্বন দেয়—

উল্লাসের প্রাণের অগ্নিসমুদ্র যেন শুষিয়া লয়—গুরুভার আনন্দের একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া উল্লাস বলে,—'এতক্ষণে বাঁচলাম। কত কষ্ট হচ্ছিলো তা বলতে পারিনে।'

মানিনী বলে—'পালাও এখন। আর নয়।'

মানিনী ঘুমাইয়া থাকিলে উল্লাস তার একখানা হাত অতি সন্তর্পণে তুলিয়া লয়—আনত দৃষ্টি তদ্গত নিবদ্ধ করিয়া তাহার করতল নিরীক্ষণ করে···

উল্লাসের সারাপ্রাণ গলিয়া সেখানে ঢলিয়া পড়ে···আত্মসমর্পণের কিছু আর বাকি থাকে না—

করতলের রেখাবিন্যাসই কী সুন্দর! স্থূল সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম; দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ; আর হ্রস্ব, এবং হ্রস্বতর রেখাগুলি অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাহারই দুর্বোধ্য অক্ষরমালা—পড়িবার জো নাই; ভাবিয়া উল্লাস বিস্মিত হয়—

কতকগুলি রেখা, গাছের পল্লবহীন সরু প্রশাখা শ্রেণীর মতো একই বিন্দু হইতে চলিতে শুরু করিয়া খানিক সতেজে অগ্রসর হইয়াই মিলাইয়া গেছে ···আয়ুর রেখাটা তর্জনীর মূল প্রায় স্পর্শ করিয়াছে—

মানিনী বহুদিন বাঁচিবে···

পরস্পরের এই উষ্ণ নিটোল যৌবনসম্ভোগ ঠিক তেমনি দীর্ঘজীবী হইয়া উচ্ছ্বাসে-উচ্ছ্বাসে নৃত্যের ছন্দে প্রবাহিত হইয়া তার ভবিষ্যতের অনন্ত দিবস ও রাত্রিগুলি আনন্দের জ্যোৎস্নায় আর বিহসিত রৌদ্রালোকে প্লাবিত করিতে থাকে···

অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উল্লাস চৌধুরী মানিনীর হাতের আঙুলগুলি একটি-একটি করিয়া মুড়িয়া দেয়; তারপর দুটি করতলের ঈষৎ স্পর্শের অভ্যন্তরে মানিনীর চমৎকার ক্ষুদ্র মুষ্টিটাকে আবদ্ধ করে···

উল্লাসের মনে হয়, সোনার একটি পাখি—

গল্প শুনিয়া ছেলেবেলায় যাহাকে দেখিতে আর পাইতে ইচ্ছা হইতো, আর এখনও যেন ভাবিতে ভালো লাগে, সে পাখি আছে—তাহাকেই যেন সে দুই হাতের বেষ্টনের ভিতর ধরিয়া রাখিয়াছে···স্পর্শ যাহা অনুভূত হইতেছে তাহা সেই অকাতর আর অতিশয় লোভের বস্তু পোষ-মানা আর প্রেমতরলিত সোনার পাখিটির সুকোমল হৃদয়ের···

মানিনীর বন্দী হাতখানা অকারণেই একটুখানি কাঁপে; বন্দী কি মুক্তি চায়? উল্লাস মনে-মনে একটু হাসিয়া আর একটু চাপ দেয়—হাতের অনতিলঘু বন্ধন ধীরে-ধীরে উন্মোচিত করিয়া লইয়া উল্লাস দেখে মানিনীর হাতের ত্বকের চম্পকবর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে···

উল্লাস মানিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজের মাথায় একটা চুল ছিঁড়িয়া লয়; সেই চুল বুলাইয়া মানিনীর নাকের ডগায় শুড়শুড়ি দেয়—

মানিনী ঘুমের মধ্যেই কপাল কুঁচাকইয়া বলে—উঃ! বলিয়া ঘুমের মধ্যেই নাকের উপর হাত বুলাইয়া লয়···

উল্লাস আবার শুড়শুড়ি দেয়—তারপর আবার—এইবার মানিনীর ঘুম

ভাঙিয়া যায়, চোখ খানিকটা মেলে—

উল্লাস বলে, 'বেজায় মাছির উৎপাত। নাকে-মুখে বসছে। আমি তাড়াচ্ছিলাম।' বলিয়া হাসে।

লাল চোখের উপর ক্লান্তভাবে একবার পলকপাত করিয়া লইয়া মানিনী আলস্যভরে বলে—'হ্যাঁ তুমি তাড়াচ্ছিলে! তুমিই শুড়শুড়ি দিচ্ছিলে।'

মানিনীর এই অবশ আলস্য-শিথিল নিদ্রাজড়তা উল্লাসের বড়ো ভালো লাগে; হাতের চুলগাছা দেখাইয়া বলে,—'দিচ্ছিলামই তো। কী করবে আমার?' বলিয়া মানিনীকে আলিঙ্গন করে; আর ভাবে, খুবই অদৃষ্টের জোর আমার।

বরাতের বড়াই করিতে-করিতে একটি কন্যা জন্মিয়া গেলো। স্বজনবর্গ কী আশা করিয়াছিল, এবং তাহারা কেহ ক্ষুণ্ণ হইলো কিনা সে-কথা অবান্তর; কিন্তু উল্লাস চৌধুরী কিছুমাত্র দমিলো না; মানিনীও বিশেষ বিচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলো না; বরং উহাদের বিলাসানন্দ, প্রথম ফুলটি দেখিয়া ফুল-বাগানের মালীর সুখের মতো, যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিলো। গাছের আরো জল চাই। এই উল্লাস চৌধুরীর বয়স এখন, আটত্রিশ নয়, উনচল্লিশ নয়, একেবারে একচল্লিশ—সর্বনেশে একচল্লিশ।

বাড়িতে ছেলেমেয়েদের তুমুল হল্লা; কিন্তু উল্লাসের তাতে ধ্যান ভাঙে নাই।

উল্লাসের যে মেয়ের কথা উপরে বলিলাম, মনের মতো ঘরে বরে তার বিবাহ হইয়া গেছে অনেকদিন হইলো। দয়াময়ের ইচ্ছায় একটি পুত্রও তার জন্মিয়াছে; এবং সেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হইতে আজ সেই পরম সুখকর সংবাদটি আসিয়াছে—

অর্থাৎ উল্লাসের দৌহিত্র হইয়াছে; কিন্তু মানিনী আর উল্লাস চৌধুরীকে দেখিয়া মনে করিবার জো নাই যে, উহাদের দৌহিত্র হইয়াছে। দৌহিত্র পাইতে হইলে অবশ্য নিশ্চেষ্ট বানপ্রস্থের উপযোগী হইয়া এমনভাবে পাকিয়া উঠিবার দরকার নাই যে, এখন খুলিয়া পড়িলেই আরাম—দৌহিত্র পাইতে মাত্র একচল্লিশ আর সাঁইত্রিশই যথেষ্ট; তবে শুনিতে নাতি, এই যা বাধা।

মানিনী বলিলো,—'যেতে বলেছে বেয়াই-বেয়ান। একবার দেখে এসো গিয়ে।' উল্লাস বলিলো 'নিশ্চয় যাবো। কালই যাবো—ভোরবেলা রওনা হবো। বেলা-নটা নাগাদ পৌঁছে যাবো। কিন্তু একটু সোনা চাই যে।'

দুজনেই থম্‌কিয়া গেলো।

উল্লাস আর মানিনীর ঘরে খাবার, মনে সুখ এবং আর যাই থাক, সোনা নাই।

স্বর্ণসমস্যার সমাধান করিতে ডাক পড়িলো বিশেষ বন্ধু শৈলধরকে। শৈলধর উল্লাসের এমনি অন্তরঙ্গ বন্ধু যে কেবল তাহার সঙ্গেই আর্থিক সঙ্কটচর্চা প্রকাশ্যে এবং পরনারীচর্চা গোপনে চলিয়া থাকে। শৈলধর বুদ্ধিমান···শহরের সুসভ্য আদব-কায়দায় তাহাকে পটু করিয়া তুলিতে শৈলধর কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিল···এবং শহরে যাইয়া উল্লাস একবার চরিতার্থ হইয়া আসিয়াছিল একমাত্র শৈলধরেরই আনুকূল্যে, নেতৃত্বে এবং মধ্যবর্তিতায় ; এবং শৈলধর আরও মূল্যবান উপকার করিয়াছিল ইহাই যে, সে-ই সাহস দিয়া-দিয়া তার হৃৎকম্প দূর করিয়াছিল। উল্লাস শৈলধরের নিকট কৃতজ্ঞ।

সে যাহাই হউক, ডাক পাইয়া শৈলধর আসিলো এবং বুঝাইয়া বলিলো যে, দুঃখের কোনোই কারণ ঘটে না যদি দৈবাৎ সোনা না থাকে ; কারণ, রৌপ্যও মহার্ঘ বস্তু, তুল্য উজ্জ্বল, উপরন্তু রৌপ্য মুদ্রার বিশেষ খাতির এইজন্য যে, নগদ লেনদেনের ব্যাপারে তাহা অধিকতর চলতি। সুতরাং দুটি টাকা দিয়া দৌহিত্রের মুখ দেখিলে কিছুই নিন্দার কাজ হইবে না। দৌহিত্র এখনও আতুড়ে অবস্থান করিতেছেন ; সোনা-রুপার পার্থক্য সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই। দৌহিত্রের জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গ জানে যে, সোনা-রুপায় শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ কিছু নাই।

বুদ্ধির কথা শুনিয়া উল্লাসের দুঃখ ঘুচিলো। ঠিক হইয়া রহিলো, খুব ভোরে উঠিয়া একটু রাত্রি থাকিতেই উল্লাস যাত্রা করিবে। আট মাইল কতটুকুই বা ! রৌদ্রের তেজ বাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই বেয়াইয়ের বাড়িতে পৌঁছানো যাইবে।

শৈলধরও সেই পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলো।

মানিনী বলিলো,—'টাকা দুটো দিয়ে ছেলের মুখ দেখো।'

'উ—হুঁ। টাকা দুটো নিয়ে আমি শটকাবো। কেউ খুঁজে পাবে না চোদ্দো বছর।' বলিয়া চোদ্দো বছর কতটা দীর্ঘ, এবং কত ভয়ঙ্কর, এবং বিরহ যে কত বিষময়, চোখ বড়ো করিয়া উল্লাস তাহার একটু আন্দাজ দিলো ; এবং তারপর সান্ত্বনা দিতে হাত তুলিয়া মানিনীর চিবুক স্পর্শ করিতে যাইয়া সে দেখিলো, মানিনী পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে।

খুব ভোরে, রাত্রি একটু থাকিতেই উল্লাস চৌধুরী টাকা দুটি লইয়া এবং জুতা জামা পরিয়া দৌহিত্র দর্শনে যাত্রার উদ্‌যোগে ব্যস্ত হইয়া উঠিলো···

মানিনী বলিলো,—'কেমন হয়েছে ভালো ক'রে দে'খে এসো, মায়ের মতো

না বাপের মতো। আমার হ'য়ে ছেলেকে আশীর্বাদ কোরো।'

উল্লাস বলিলো,—'পায়ের ধুলো দাও খানিক তার জন্যে, নিয়ে যাই।'

মানিনী বলিলো,—'মালতীর দেওরদের কিছু মিষ্টি কিনে দিও।' বলিয়া নিজের পুঁজির একটা টাকা উল্লাসের হাতে দিলো।

উল্লাস বলিলো,—'বাবা, বেজায় টাকার মানুষ!...তা দেবো।' বলিয়া উল্লাস হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

মানিনী বলিলো,—'আজই ফিরো কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

উল্লাসদের গ্রাম বল্লভবাজারের পরেই আর একটা গ্রাম সোনারপুর; সোনারপুর পার হইয়াই মাঠ প্রায় ছয় মাইল—

সেই মাঠের পরেই যে গ্রাম সেই গ্রামের নাম মধুনগর, মধুনগরে উল্লাসের মেয়ে মালতীর শ্বশুর বাড়ি।

উল্লাস স্ফূর্তির সঙ্গে রওনা হইয়া গেলো...

গ্রামদ্বয় পশ্চাতে ফেলিয়া উল্লাস যখন মাঠে পড়িলো তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। ফাল্গুন শেষের মাঠের চেহারা তেমন সুশ্রী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রই গুমুরায় কণ্টকিত হইয়া আছে, তথাপি নবীন সূর্যকে প্রান্তে ধরিয়া রহিয়াছে বলিয়াই সমুদয় মাঠের রুক্ষতা একটা নির্দেশহীনতায় অন্তর্হিত হইয়াছে—অরুণালোকের হাস্যময়তায় ক্ষেত্রের নিঃস্বতা যেন একটা মনোরম প্রচ্ছদে মণ্ডিত হইয়াছে।

আলে আলে পথ—

সুবিস্তীর্ণ শূন্য মাঠের মাঝে হঠাৎ একটা স্থানে তিল বপন করা হইয়াছে; চারাগুলি যেমন মসৃণ তেমনি সতেজ—বহু ব্যাপী ধূসরতার মাঝে এই ক্ষেত্রটুকুর হরিদ্বর্ণ যেন ভূমিলক্ষ্মীর আয়তির চিহ্ন—বল্লভ সূর্যের দিকে চাহিয়া সে অনর্গল আনন্দ নিবেদন করিতেছে...

চলিতে-চলিতে থামিয়া উল্লাস স্বভাবের শোভা নয়, চারাগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলো—তাহাদের ভবিষ্যৎ একটু বিবেচনা করিলো।

ঐ দূরে মরাদীঘি—দীঘির নাম এখন মরাদীঘি। এই বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড কবে কোন্ ভূস্বামীর একাধিকারে ছিলো—তিনি শখ করিয়া এবং নিজের অবসর বিনোদনার্থ ঐ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ছিলেন—উহার জল, যতোই উৎকৃষ্ট হউক, বহন করিয়া কেহ গৃহে লইতো না, দূরত্ববশত লওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই। জমিদার এই দীঘির ধারে হাওয়া খাইতে আসিতেন, দীঘির জলে মাছ ধরিতে

আসিতেন। জলাকরের চতুর্দিকে দামি দামি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল—গাছগুলি আছে; এই ফাল্গুনের শেষে তাহাদের শুকনো পাতায় তীরের মাটি আচ্ছন্ন হইয়া গেছে···আর, নবপল্লবের উদ্গম উল্লাসে তারা যেন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে···পল্লবদলের বিকিরিত আভা এমনই সঞ্চারণশীল যে সেই আভার প্রতিবিম্বিত শ্যামলতায় নিম্নের তৃণহীন ক্ষেত্র—মৃত্তিকাও যেন স্নিগ্ধ সরস হইয়া গেছে।

কিন্তু দীর্ঘিকায় জল নাই; ফোয়ারার মুখ বন্ধ হইয়া গেছে অনেকদিন আগেই, তারপর খাতের ভিতর পলি পড়িয়া-পড়িয়া গর্ত বুজিয়া গেছে।

জমিদারের বাড়ি হইতে এই দীর্ঘিকা পর্যন্ত একটি খানিক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছিল—রাস্তাটার কঙ্কাল নয়, যেন ছেঁড়া ছেঁড়া চামড়া স্থানে-স্থানে আজও দেখিতে পাওয়া যায়, আর সবটাই লাঙলের গ্রাসে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

এই বাগানের পাশ দিয়া ঘুরিয়া যাইয়া উল্লাসকে তদানীন্তন সেই রাস্তা বরাবর উঠিতে হইবে—সেখান হইতে মধুনগর নাক-সোজা।

আল ছাড়িয়া উল্লাস চৌধুরী কুহুরব শুনিতে-শুনিতে দীঘির পাড়ের ধারে-ধারে চলিতে লাগিলো···এবং মোড় ঘুরিয়াই যাহাকে সে দেখিতে পাইলো সে একটি রমণী—সেও পথিক: হাত তিনেকের ব্যবধানে দুজনাই দাঁড়াইয়া পড়িলো, ভয় পাইয়া নয়, হঠাৎ সামনের মানুষ দেখিয়া···রমণীর সঙ্গে একটি ছয়-সাত বৎসরের বালক।

উল্লাস স্বচ্ছন্দে সেই রমণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিলো; মনে হইলো, রমণী সুন্দরী—তারপরই উল্লাস পাশ কাটাইয়া চলিতে শুরু করিলো—

এবং হাত পাঁচেক সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াই পিছনের টানে যেন তার অতীত দিনের ভিতর মূর্ছিত সংজ্ঞা হঠাৎ ধড়ফড়াইয়া জাগিয়া উঠিলো···পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তার মনে হইলো, এ কী ব্যাপার! এমন নির্জন স্থানে একাকিনী এক রমণীর নিকটবর্তী হইয়া তাহার মুখখানা স্পষ্ট চোখে পড়িলো; কিন্তু চোখে পড়িয়াও সে অন্তরে প্রবেশ করিলো না কেন! কেন মনে পড়িলো না, রমণী চিরকালই রমণী! উল্লাস চৌধুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিলো; নিজের কাছেই সে জানিতে চাহিলো, তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি?

## অরূপের রাস

১

রাণুর সঙ্গে আমার ভাব ছিলো—

কিন্তু হঠাৎ একদিন আড়ি হইয়া গেলো।

রাণু ছোটো, আমিও ছোটো; সে সাত, আমি চৌদ্দো বছরের।··· বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, তথাপি বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহজ একটা দায়িত্ব বুঝি থাকেই, বিশেষত যদি প্রতিবেশী হয়।—

রাণুর সম্বন্ধেও আমার দায়িত্ব ছিলো···তার শারীরিক কোনো হানি না হয় ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়কের পদগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মাঝে-মাঝে তাহাকে শাসন করিতেও যাইতাম; কিন্তু সে শাসনের ফলে তাহার সংশোধন কতদূর হইত তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া, তার রূপের ব্যাখ্যার মতোই নিষ্প্রয়োজন।

আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িতো, বলিতো,—'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বকৃতে বসেছে।' হি, হি, হি।···

কিন্তু হতোদ্যম আমি কখনোই হই নাই।

রাণুর পিতা যদুগোপাল দত্ত মহাশয় অবস্থাপন্ন নহেন, নিঃস্বও নহেন! তাঁহার চাকরিতে উপরি পাওনাও ছিলো; এই পয়সাটা অধর্মের পয়সা—কিন্তু মাহিনার অল্প টাকাতেই সাংসারিক খরচটা কুলাইয়া ঐ অধর্মের পয়সার সবটাই জমিতো।

জন্ম, মৃত্যু, পাশ, ফেল, আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, বিবাহ—এই রকমের সামান্য পারিবারিক পরিবর্তন ছাড়া গৃহস্থ বাঙালির ঘরে উল্লেখযোগ্য বড়ো কিছু ঘটে না; আমাদেরও ঘটে নাই। আমি একবার ফেল, একবার পাশ করিয়াছি, আর একবার কী করিবো তাহা দৈবের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি; যদুগোপাল বাবুর চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আর একটা বৃদ্ধি আসন্ন হইয়াছে।···

রাণুর বয়স দশ, আমার সতেরো।—

রাণু আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া আমার পাঠ্যপুস্তকের নেলসনের মৃত্যুদৃশ্যের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলো,—এটা কিসের ছবি, কানুদা?

—যুদ্ধের ছবি। এই লোকটার বুকে গুলি লেগেছে, গুলি খেয়ে সে

মরছে।…বলিয়া ডান হাত দিয়া মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলো,—আর কী কী ছবি আছে দেখাও।

রাণুর ঐ চট করিয়া দরজার দিকে চাহিবার অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—

এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বৎসরের বালিকার এই অকাল পরিপক্কতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিলো না। কিন্তু আমার কী দুর্মতি ঘটিলো জানি না, সকৌতুকে হাসিয়া বলিলাম,—ঢের ছবি আছে; কিন্তু আগে তুই বল, তুই ছবি দেখতেই এসেছিস্ না আর কোনো মতলব আছে?

মনে হইলো, রাণু এই ঘুরানো কথাটার অর্থ ধরিতেই পারিবে না; তবু, পারে কিনা দেখিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠাও জন্মিলো।

রাণু তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর দিলো না—খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিলো,—এসেছিলাম তুমি রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে ব'সে আছো তাই শুনে। ছবি দেখা মিছে কথা।

চেঁচাইয়া বলিলাম,—রসগোল্লা খেয়ে যা রাণু।

রাণুও তখন চিৎকার করিয়া বলিতেছিল,—রাধা, পুতুলের একটা বাক্‌শোর একটা টোপ শেলাই করবো, দুপুর বেলা একটিবার আসিস্, ভাই।…তাহার চিৎকারে আমার ডাক ডুবিয়া গেলো।

আমার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।…ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেলো।

দুদিন পরে রাণু আসিয়া খবর দিলো—কানুদা আমার বিয়ে।

—বলিস্ কী?

—হ্যাঁ, সত্যিই। কাল দেখতে আসবে।

বিস্ময়ের কারণ এ সংবাদে কিছুই নাই। বিবাহরূপ পরিবর্তন বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটিতেছে—কাহারো অল্প, কাহারো বেশি, কাহারো মধ্য বয়সে। রাণুর না হয় দশম বৎসরেই সেই সাধারণ পরিবর্তনটা ঘটিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোথায়?

—তা জানিনে। বাবা-মা ভারি ব্যস্ত। কতরকম খাবার তৈরি হচ্ছে। খেয়ে এলাম।

জিহ্বায় জল আসিলো—পুলকিত কণ্ঠে বলিলাম,—নিয়ে আয় কিছু, আমিও খাই।

—আনছি। বলিয়া রাণু চলিয়া গেলো।

আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া একটা বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া দিয়া রাণু কহিলো,—খাও।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।...সে মুখে বলিলো 'খাও', কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে আহ্বানের বাষ্পমাত্রও ছিলো না, বরং বিরুদ্ধ দিকেই যেন একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম।...হঠাৎ এ রাগ কেন?

যখন সে যায় তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু এখন লক্ষ করিলাম, রাণুর মুখাবয়বের প্রত্যেকটি রেখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রাণু বলিলো,—খাচ্ছো না যে?

কণ্ঠস্বর কর্কশ শুনাইল।

—তুই রাগ ক'রে দিলি কেন? রাগ ক'রে খাবার ঠেলে দিলে কেউ খেতে পারে?

রাণু উত্তর দিলো না।

একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম, চুরি ধরা প'ড়ে গেছে বুঝি?

—চুরি করিনি, চেয়ে এনেছি।

—তবে বামুনকে খেতে দিতে রাগ করলি কেন?

—রাগ কই করলাম? বললাম খাও।

আমি তাহার দিকে বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমারও রাগ হইয়াছিল।...এতো ভুরু কোঁচকানো কিসের?...

উঠানে একটা কুকুর শুইয়াছিল—

রাণু দ্রুতপদে নামিয়া যাইয়া তাহারই সম্মুখে সেই দুধ, ক্ষীর, ছানা, সরের মিষ্টান্নগুলি বাটিশুদ্ধ উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলো।...

পূর্বে যে আড়ির কথা বলিয়াছি, এই ঘটনায় তাহার সূত্রপাত।—

রাণুর রূপ-গুণের পরীক্ষা হইবে—

দেখিতে গেলাম।...

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িলো ঘোঁয়ার আড়ালে লুকানো-মুখ একখানি দেহের উপর...

ধূমাকর্ষণের আর বিরাম নাই···নিরবচ্ছিন্ন ধূমপটল এক সময় সরিয়া যাইতেই দেখিলাম, কাঁচা-পাকা মোটাসোটা প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া রাণুর বাবার হাতে হুঁকা দিতেছেন !—

বারান্দায় একটা মাদুর বিছানো হইয়াছে ; তাহারই উপর রাণুর বাবা কন্যার পিতার মতো সবিনয়ে, বরের যে-ই হোন, তিনি বরপক্ষীয় কর্তাব্যক্তির মতো মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছেন ; এবং আমারই বয়সী একটি ছোঁড়া অধোমুখে মাদুরের বয়ন-কৌশল প্রাণপণে নিরীক্ষণ করিয়াও দেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ।

বুঝিলাম, এটা দূত, পাত্রকে গোপনে কনের রূপের কথা শুনাইবে ।—

পাত্রপক্ষীয় সেই কর্তাব্যক্তি বলিলেন,—মেয়ে পছন্দ হবেই । যেমন শুনেছি ঠিক তেমনটি যদি না-ও হয় তবু আপনার মেয়ে সুন্দরীই ।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—মায়ের আমার স্বাস্থ্যও খুব ভালো ।

—হবেই তো, একটিমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটি, খাইয়েছেন দাইয়েছেন ভালোই । দেশের মেয়েরা তো না খেতে পেয়েই আকারে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে । তাদের যে সন্তান হচ্ছে তারাও আকারে ছোটোই হচ্ছে । বলিয়া ভগ্নোদ্যমের মতো তিনিও যেন আকারে কিছু ছোটো হইয়া গেলেন ।

যদুগোপাল বাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—যে আজ্ঞে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে ! আমার তো মনে হয়, ছোটো হ'তে-হ'তে একদিন বাঙালি ব'লে কোনো জাত পৃথিবীতে থাকবে না ।···

আমার কিন্তু হাসি পাইতে লাগিলো—

কন্যাদায় বিপদ নিশ্চয়ই ; এই কনে দেখাদেখির ব্যাপারটা সমগ্র কন্যাদায়ের অংশ হইলেও, উদ্ধারটা প্রধানত উহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া ঢের বেশি জাগ্রত ।···উৎকণ্ঠায়-আশঙ্কায় বুক ঢিপঢিপ করিতে থাকে—কন্যার পিতা একবার কন্যার মুখাবলোকন এবং একবার পরীক্ষকের মুখাবলোকন করিয়া একবার দেখেন কন্যার শ্রী, একবার অন্বেষণ করেন পরীক্ষকের প্রীতি ।···স্বর্ণপ্রতিমার সহিত যে-কন্যার রূপের উপমা চলে সেই কন্যার পিতার পরমাত্মাও এই সময়ে শুকাইয়া উঠিয়া দুলিতে থাকে ; অথচ জীবনের ট্রাজিডি এমনি উৎকট যে, ঠিক এই সময়টিতেই, মন যখন টাটায় তখন, মনের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন রাখিয়া তোশামোদকে বিনয়ের বেশে বাহির করিয়া বহু মিষ্টকথা উচ্চারণ করিতে হয় ।

ব্যাপারটা কষ্টের হইলেও ভিতরে-ভিতরে হাস্যকরই ।—

সে যা-ই হোক, কর্তা বলিলেন,—'পুরুষদেরও সেই কথা। তারাও কি পেট ভ'রে খেতে পায় ভেবেছেন? হুঁ!'

যদুগোপাল বাবু পূর্বে এ-বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাঙালি পুরুষদের আধপেটা দুরবস্থার বার্তা কর্তার মুখে যেন হঠাৎ এই প্রথম পাইলেন এমনি বিস্ময়ে তাঁর চোখ খুব বড়ো হইয়া উঠিলো, বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—'আজ্ঞে না, বিস্তর পুরুষ আছে যারা বারোমাসই একরকম—'

বোধহয় বলিতে যাইতেছিলেন, অনাহারে কাটায়।

কিন্তু কর্তা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিলেন না, বলিলেন,—'বেলা বেড়ে যাচ্ছে, বেশি সাজগোজের দরকার নেই, বাড়িতে যেমন থাকে তেমনি আনতে বলুন।'

যদুগোপাল বাবু এবার বাঙালি পুরুষ সাধারণের দুরবস্থার সঙ্গে নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আরও ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন—'গরিবের ঘরের মেয়ে সাজগোজ কোথায় পাবো যে তাকে সাজাবো, বেয়াই!'—তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন,—'ঝি, হ'লো তোমাদের?'

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিলো—হয়েছে।

বেয়াই—ইনি তবে পাত্রের পিতা স্বয়ং।

একটু পরে ঝি হাত ধরিয়া রাণুকে চৌকাঠের ধারে আনিতেই সেইদিকে চাহিয়া আমার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেলো—বাঃ!

শাদা শেমিজের উপর লাল চওড়া পেড়ে একখানটা বাঁধা, কপালের উপর চুলের পাতা, পায়ে আলতা, দুই ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো টিপ;—পরীক্ষা দেবার উপযোগী বেশ পারিপাট্য রাণুর মাত্র এইটুকু,—

কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বেশেই রাণুর রূপ অসাধারণ নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া আমার চোখে পড়িয়া গেলো!

রাণুর মুখের উপর হইতে আমার চোখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই বলিলেন—'বাঃ-ই বটে।...এসো, মা, এসো, ব'সো।' বলিয়া সম্মুখস্থ খালি স্থানটিতে হাত রাখিলেন।

ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া রাণু তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বসিলো; ঝি পাশের দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিলো।...

কিন্তু আমার বুকের ভিতরকার বাক্‌স্ফূর্তি যেন অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া গেলো ...বহুদূরের কুজ্ঝটিকার আবরণ যেমন দেখায় তেমনি একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট

ইচ্ছায় আমার মনের আকাশ ধীরে-ধীরে আবিল হইয়া উঠিতে লাগিলো।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া শুনিলাম, বেয়াই বলিতেছেন, আপনার মেয়ে সুলক্ষণা এবং সুন্দরী বটে; সচরাচর এমনটি চোখে পড়ে না। রূপের খ্যাতি যেমন শুনে এসেছিলাম তার শতগুণ বেশি রূপবতী আপনার মেয়ে...কানে শুনে এ-রূপ ধারণা করা যায় না। এ-মেয়ে আমি নেবো। বলিয়া রাণুর হাত দুখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—আপনার অগাধ দয়া।

—দয়া নয়, গরজ। আপনার মেয়ের অদৃষ্টে আমার ছেলে রাজা হবে।

যদুগোপাল বাবু হাসিলেন।

কিন্তু হাসিলেন বলিলে যেন ঠিক হয় না; বেয়াইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের টানে তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও গর্ব যেন এক ঝলক উছ্‌লিয়া পড়িলো।

আমিও মনে-মনে সর্বান্তঃকরণে কর্তার উক্তির সমর্থনই করিলাম। রাণুকে যে বিবাহ করিবে সে যে রাজ্যেশ্বরের মতোই ভাগ্যবান, এবং দুটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে যে রাজৈশ্বর্যই গৃহে লইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।—

যদুগোপাল বাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত এদিক-ওদিক করিয়া পণের কথাটা তুলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—বড়ো দরিদ্র আমি, শুধু মেয়েটিকেই নিয়ে ব'সে আছি; তাকে কী দিয়ে বিদায় দেবো সে-সংস্থান—

যদুগোপাল বাবু যেন কত বড়ো একটা লজ্জাকর শ্রুতির অযোগ্য কথা কহিতে শুরু করিয়াছেন এমনি শশব্যস্তে বেয়াই জিব কাটিয়া বসিলেন; বলিলেন,—সর্বনাশ! অমন কথাও বলবেন না। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবো, তিনিই আমার ঘর ধনে-পুত্রে পূর্ণ ক'রে তুলবেন। আপনার দু-এক হাজারের ওপর আমার লোভ নেই।

শুনিয়া, কেন জানি না, আমারই চোখে জল আসিলো।

এই দুঃসহ সুসংবাদটা যদুগোপাল বাবুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত।... যদুগোপাল বাবু স্থিরদৃষ্টিতে মিনিটখানেক বেয়াই-এর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আচম্বিতে তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।—

বেয়াইয়ের এ-বিপদটাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

নিজের কথার ফলে এ-হেন সঙ্কটে পড়িতে হইবে জানিলে তিনি বিনাপণে রাজলক্ষ্মী ঘরে তুলিবার শুভ-ইচ্ছাটা মুখোমুখি না বলিয়া বোধ করি ডাকযোগেই জ্ঞাপন করিতেন।—মোটা মানুষ, তাহার উপর পায়ের উপর আস্তো একটা মানুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া—সহসা পিছে হটা বা উঠিয়া দাঁড়ানো

বেয়াইয়ের সাধ্যাতীত ; সে চেষ্টাও তিনি করিলেন না।...যদুগোপাল বাবুর দুই কাঁধ তিনি দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর হইতে তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই তুলিয়া দিলেন, অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—বেয়াই, এ কী কাণ্ড আপনি ক'রে বসলেন, মেয়ের সামনে আপনি আমাকে লজ্জা কেন দিলেন, চোখে আপনার জলই বা কেন ?

– রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—

তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি, অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি—

কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম—

রঙের এই লীলাপুলক।—

নিম্নের সকল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্ধ্বে সদ্যোত্থিত সূর্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন—

তেমনি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জার রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিলো।

...এ-কাণ্ড কেন করিলেন, মেয়ের সামনে বেয়াইকে কেন লজ্জা দিলেন, তার চোখেই বা জল কেন ?...যদুগোপাল বাবু এ প্রশ্নত্রয়ের একটিরও উত্তর দিলেন না, বেয়াইয়ের ঠেলায় খাড়া হইয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—আমার মেয়ের বড়ো সৌভাগ্য যে আপনার মতো মহাপুরুষের ঘরে সে যাবে। রাণু, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করো, মা।

রাণুর চোখের পক্ষ্মরাজির সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখাটা শুধু দেখা যাইতেছিল—

এইবার সে চোখ তুলিয়া ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিলো ; তারপর চোখ নামাইয়া হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে-ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলো। তিনি বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় রাণুকে বোধহয় আশীর্বাদ করিলেন ; এবং ঝিকে বলিলেন,—মাকে ঘরে নিয়ে যাও, দেখা শেষ হয়েছে।—

ঝি রাণুর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলো।...তার পিঠের উপর এলানো চুল বাতাসে একবার দুলিয়া উঠিলো...পায়ের আলতার আভা চোখে পড়িলো... একটা মিষ্ট গন্ধ নাকে গেলো।...

সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না ইহাই যে শুধু 'মিষ্টিমুখ' করিতে বসিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই এতো মিষ্টান্ন গহ্বরস্থ করিলেন কেন ?—সেই দৃশ্যটাও গিলিলো অনেক।

বোধহয় বাপ-মায়ের আদেশেই রাণু বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া দুর্লভদর্শন হইয়া উঠিলো। তা উঠুক···তিনমাস পরেই যে-মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাইবে তাহার নৃত্যপরায়ণতা মানায় না।···

কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন!—অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই।···কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—যেন আমার সঙ্গে তার মুখচিনাচিনিও নাই।···একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলো যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।···

বাঙালির মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়—

বিবাহের পাত্র স্থির হইয়া গেলো, তা সে যতো ছোটো মেয়েই হোক না, কেমন ভারভারতিক ভাব ধারণ করে।·· আমি এখন রাণুর কাছে পরপুরুষ, রাণু তাই আমাকে লজ্জা করিতেছে; এবং সেদিনকার সেই মিষ্টান্নঘটিত ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া সে রাগ করিয়া আছে তাহা নহে।···লজ্জা রাগ এক কথা, বিরাগভরে পরিহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা—একটিকে অন্যটি বলিয়া ভুল করা অসম্ভব।···রুষ্ট মুখে মিষ্টান্ন দিলে তাহা প্রত্যাহার করা ন-দশ বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে এতো বড়ো অপরাধ নহে যে তাহা সে ভুলিতেই পারে না।···যাহা হউক, রাণুকে একগুঁয়ে বলিয়া মনে-মনে গালি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সে আগে কথা না বলিলে আমিও যাচিয়া কথা বলিতে যাইবো না।—

বিনাপণে কন্যার বিবাহ—

যদুগোপাল বাবুর এতোখানি সৌভাগ্যের সংবাদে তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী শুভার্থীদের আহ্লাদে চোখ কপালে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর একটি ফল হইলো ইহাই যে, যাঁহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের আর কৌপীন ধারণ করিতে হইবে না।—

এই সময় রাণু একদিন আমার সঙ্গে যাচিয়াই কথা কহিলো।

—কানুদা, তুমি নাকি আমার বিয়েতে পদ্য লিখবে?

দুর্দৈব ঘটিবেই, কাজেই ঠিক মুহূর্তেই আমি প্রীতি-উপহারকে আরও উপদেশপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন কাটিয়া পরিবর্তে নূতন

লাইন যোজনা করিতেছিলাম।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বলিলাম, —হুঁ।

—কী লিখেছো পড়ো দেখি শুনি।

একটু গর্বিত ভাবেই পড়িলাম।—

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, স্বদেশ, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন ; দেবর, ননদ, দাস-দাসী, সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রতি নারীর কর্তব্য কিছুই আমার পদ্যে বাদ পড়ে নাই ; অপরিচিত ও বিপৎসঙ্কুল সংসার-কাননে প্রবেশোদ্যত নবদম্পতির মস্তকে করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে ভগবানকে সানুনয়ে আহ্বান করিয়া প্রীতি-উপহার শেষ করিয়াছি।—

পড়া শেষ করিয়া কাগজখানি পরম মমতার সহিত টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতেছি—এমন সময় রাণু ছোঁ মারিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলো।…চেঁচাইতে-চেঁচাইতে প্রীতি-উপহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন রাণুদের বড়িতে ঢুকিলাম তখন রাণু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে।

হাঁকিয়া বলিলাম,—আমার কাগজ দে।

রাণু আঙুল তুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া গেলো।—

রাণুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কীরে, কানু?

আমি বলিলাম,—আমি উপহার লিখেছিলাম ; রাণু নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই বুঝি জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে গেলো। এমন হতভাগা মেয়েও তো জন্মে দেখিনি।—

ক্রন্দন দমন করিতে-করিতে চলিয়া আসিলাম ; দুর্জয় ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিলো!—প্রীতি-উপহার নিজের নাম সংবলিত করিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার আদৌ দুঃখ হইলো না ; ক্ষোভে-দুঃখে আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিলো ইহাই যে, এতো শ্রম এতো চিন্তার ফল রচনাটিকে নিষ্প্রয়োজনে সে এমন নৃশংসভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলো!…সাত দিনের দিন পদ্যটি খাড়া করিয়াছিলাম,—কতো কাটিয়া কতো ছাঁটিয়া কতোবার নকল করিয়া তবে তাহাকে মনের মতো করিয়া তুলিয়াছিলাম…ভাবিতে-ভাবিতে কতোবার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—দিনে দুশোবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় নাই,—সেই পদ্য কিনা আগুনে দিয়া পুড়াইল!… নিজের মাথা হইতে শব্দ বাহির করিয়া ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লেখা এই আমার প্রথম—আমার আদিতম মানস-তনয়াকে লইয়া সে এ কী করিলো! তাহাকে জ্বলন্ত উনানে ঠেলিয়া দিয়া পুড়াইল!… শোকাগুনে আমি পুড়িতে লাগিলাম।—

রোশনচৌকি বাজিতেছে—

আজ রাণুর বিবাহ।

সেদিন রাণুর সঙ্গে রাজৈশ্বর্যের উপমাটা দৈবাৎ মনে আসিয়াছিল।...

আজ সেইটাই যেন খচখচ করিয়া কোথায় বিঁধিতে লাগিলো—একটা আপশোশের মতো।—

রাণু ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়ি গেলো; আমি বাক্‌শো-বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম।—

রাণু পিত্রালয়ে আসে, আমিও বাড়ি আসি।...

কিন্তু বলিবার মতো কিছু ঘটে না।...

যেদিন ঘটিলো, সেদিন অপূর্ব অননুভূতপূর্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম—শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়।...সুপ্তোত্থিত স-বসন্ত রতিপতি কখন আসিয়া উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল টের পাই নাই—

সহসা সে সিংহদ্বার খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

এবং সেই মুহূর্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেলো।...

রাণু আমাকে দেখিতে পায় নাই—

আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়াছিলাম,—নেত্রের সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।...

ঘটনা আমাদের বাড়িতেই—

যখন দৈবাৎ এক সময়ে তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেলো, তখনই রাণু লাল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলো।—অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি-তরঙ্গের মতো আমার বুক জুড়িয়া গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলো।—

রাণুর বয়স এখন চৌদ্দো—

কিন্তু অতুলনীয় প্রচুর স্বাস্থ্যের প্রভাবে সে ঐ বয়সেই কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ-যৌবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

দুদিন পরেই রাণুর সঙ্গে দুই বাড়ির যাতায়াতের পথে দেখা হইলো। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল...

যেন ফিরিয়া যাইবে—

কিন্তু তার বদলে সে আঁচল তুলিয়া মুখ আড়াল করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া

দাঁড়াইল !—

পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে মুখে বলিলাম,—আমি কানু।

কিন্তু মনের ভিতর যে কাণ্ড চলিতে লাগিলো' তাহার মূর্তি ঝটিকাহত সিন্ধুর মতো—

রাণু বলিলো,—তা জানি। তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলো।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া কথার অর্থ ঠিকই বুঝিলাম, কিন্তু বিদ্ধ হইয়া অভিমান করিতে পারিলাম না। · তাহাকে নূতন চক্ষে দেখিয়া অবধি বুকে যে ঝড় উঠিয়াছিল, ক্রোধ-অভিমানের সাধ্যই ছিলো না তার মধ্যে মাথা তোলে !··

অন্তরলোকের জ্যোতির্মঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো সে আর আমি।

এতো খবর রাণু জানে না।—

রাণু স্বামীর ঘরে গেলো।

·· কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ক্ষুধিত রাক্ষসের মূর্তিতে দেখা দিয়া নর-নারীগুলিকে যেন দুই হাতে মুখে তুলিয়া অবিরাম গ্রাস করিতে লাগিলো।·· ক্রন্দনে-হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেলো···শববাহকের মুখে হরিধ্বনি, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে হরিধ্বনি, দলবদ্ধ লোকের মুখে হরিধ্বনি·· কিন্তু হরিঠাকুর ভয়ার্ত জীবিতের আকুল আহ্বানে কর্ণপাতও করিলেন না—

লোক মরিতেই লাগিলো।

মহামারী আরম্ভ হইবার সপ্তম দিনে রাণুর পিতা ও মাতা মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।—

রাণুকে দুঃসংবাদটা দিয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম।

* * *

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।

ছয়মাসে শ্মশান আবার লোকালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে।

বাবা রাণুকে তাহাদের ঘর-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

রাণু লিখিলো, বাড়ি বেচিয়া ফেলুন।

সেইদিন আমিও একখানা পত্র পাইলাম, দেখিয়াই চিনিলাম, ঠিকানা লেখা রাণুর।—লিখিয়াছে—

কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ।

দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?…যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি-উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে-উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি—রাণু।

২

রাণুর পত্র পড়িয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া আমার দৃষ্টি নিষ্পলক হইয়া গিয়াছিল—

অবাক মন দিশা পায় নাই। কিন্তু অদৃষ্টে ছিলো রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

রাণুর স্বামী বদলি হইয়া আমাদের দেশে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হইয়া আসিলো।

রাণু প্রথমটা কান্নাকাটি করিয়া আমার স্ত্রীর সখিত্বে সুস্থির হইলে দেখিলাম, রাণু ইন্দিরাকে একান্ত সন্নিকটে টানিয়া হইয়া আমাকে তার রাজ্য হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

আশা করিয়াছিলাম, অন্ততপক্ষে কানুদা বলিয়া ডাক দিয়া রাণু আমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইবে; কিন্তু আসিলো না।

ইন্দিরা বলিলো,—রাণুর ছেলেটি বড়ো সুন্দর হয়েছে।

—হবারই তো কথা; ওরা দুজনেই সুন্দর।

—ছেলেটাকে আমায় দেবে বলেছে।

ইন্দিরার পক্ষ হইতে ছেলে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, চেয়েছিলে বুঝি?

—না, না, চাইবো কেন! সে-ই বললে, বউ-আমার ছেলেটা তুই নে।

—বেশ দয়ালু তো!

হঠাৎ ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিলো। তাহার এই চমৎকার লজ্জা দেখিয়াই মনে পড়িয়া গেলো, আমার শেষ কথাটার অর্থ বহুদূর যায়।…পুত্রবতী হইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া না বসিলে রাণুর দানে দয়ার কথাটা আসে না।…কিন্তু ইন্দিরার বয়স সবে পনেরো।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—ছেলের নাম কি?

—বেণু।

মনে-মনে আবৃত্তি করিলাম, কানু···বেণু। কেন জানি না, ছেলের নাম বেণু রাখা, এবং ব্যাপার বেনামিতে নিষ্পন্ন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার অসত্য প্রস্তাবের একটা গভীর নিহিত অর্থ ও অভিসন্ধি যেন ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলো।

হয়তো আমার কল্পনা অমূলক—

হয়তো চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—

কিন্তু ভ্রান্তির মাঝে জন্মলাভ করিয়াই হর্ষের যে-কম্পন প্রাণের উপর দিয়া শিরশির করিয়া বহিয়া গেলো তাহা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করিলাম ; সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোথাও টান পড়িলো না।—

বেণুর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা বলিলো, দুটি দাঁত উঠেছে মুক্তোর মতো। নেবে কোলে?

—দাও। বলিয়া হাত বাড়াইতেই বেণু নির্বিবাদে আমার কোলে আসিলো।

ইন্দিরা হাসিয়া বলিলো,—বেশ আলাপী।

কথাটা কানে গেলো, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে·· তাহারই অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু—

তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—

তাহারই প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দ-রস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।···

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ইন্দিরা বেণুর দিকে অত্যন্ত লালসার চক্ষে চাহিয়া আছে, আমি চোখ তুলিতেই ইন্দিরা একটু হাসিয়া সরিয়া গেলো,—আমারও চক্ষে লালসা ছিলো, কিন্তু দুটিতে এমনি অমিল যেন হাসি আর কান্না।

বেণুর চোখের দিকে চাহিলাম···

ঠিক তেমনি চক্ষু দুটি ; কোথায় প্রভেদ কোথায় নয়, মিল অমিলের কোথায় সন্ধিস্থল সে-বিশ্লেষণ নিমেষেই অতিক্রম করিয়া আমার দৃষ্টি সেই দৃষ্টির নীল পারাবারে ডুবিয়া গেলো।

···সহসা মনে হইলো, আমি যেন অপূর্ণ ; জীবনের অর্ধাংশ বিচ্ছিন্ন কক্ষচ্যুত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে···সর্বত্রই ঐক্য, শান্তি ; কেবল কী হইলে কী হইতো ইহারই একটা অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা.আমার একটা দিক যেমন শুষ্ক বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে একটা দুরু দুরু শঙ্কারও শেষ নাই—পাছে এই বেদনা অসাড় হইয়া একদিন মনে নিরাশার লোল স্থবিরত্ব আসিয়া যায়!···

ইন্দিরা আসিয়া অস্থির হইয়া গেলো—ছেলে কোলে করার রকম ঐ নাকি?

বেণুকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম,—রকম দুরন্ত হ'য়ে আসবে; যতোদিন তা না হয় ততোদিন পরের ছেলে একটু অসুবিধা ভোগ করলোই বা।

একটা ধমক খাইলাম।—

...আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিলো, ঈর্ষা। থাকিয়া-থাকিয়া বুক টনটন করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটা ছবি—

রাণু পরস্ত্রী—

...এই জ্ঞানটা অনায়াস মুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে-মনে লালন করিবার বস্তু নয়—

অনিবার্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।

ইন্দিরা একটা নূতন খবর দিলো,—রাণুটা একটা পাগল!

—মানে?

—বলে, আয় বৌ, তুই আর আমি এক হ'য়ে যাই।

—পাগলের লক্ষণই বটে। তুমি কী বললে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দিরা কী একটা উত্তরও দিলো—

কিন্তু ইন্দিরা তখন তাহার শব্দ-স্পর্শ লইয়া আমার সম্মুখ হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে...

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের কণ্টকোৎসব জাগাইয়া আনন্দের সুতীব্র শিখা আমার স্নায়ু-শিরায় প্রজ্বলিত লইয়া উঠিয়াছে।...

কতক্ষণ এই উদ্বেলিত আনন্দে মুহ্যমান হইয়াছিলাম, কী করিয়াছিলাম জানি না।—হুঁশ ফিরিলে দেখিলাম ইন্দিরা অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে।...একটু হাসির আমদানি করিয়া বলিলাম,—কী বলছিলাম যেন?

ইন্দিরা বলিলো,—তুমি কিছু বলছিলে না, আমিই বলছিলাম যে — বলিয়া হঠাৎ থামিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—উঠলে যে? হঠাৎ রাগ হ'লো কিসে?

—রাগ হয়নি, কিন্তু তোমার মতো অন্যমনস্ক লোকের সঙ্গে কথা বলাই বালাই।

—আচ্ছা, এবারকার মতো মাপ করো।...রাণু পাগলের মতো কী কথা কয়েছে, তুমি তাতে কী বললে?

ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করিলো সে-ই জানে, সহজ কণ্ঠেই বলিলো, 'আমি বললাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তাহ'লে বৌ খোয়াতে হবে।'—রাণু বললে, 'কানুদাকে জিগগেশ করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা।'

—'মোটেই না।' বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি-উঠি করিয়াই থামিয়া গেলো। বলিলাম, 'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ ক'রে নিতে পারলে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়। '

কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন নিবিয়া গেলো।

ছ-মাস কাটিয়াছে।

টেলিগ্রামে বসন্তবাবুর বদলির খবর আসিয়াছে।

রাণুর সঙ্গে এতোদিন মুখোমুখি দেখা হয় নাই। আমাদের বাড়িতে সে আসে নাই।

ইন্দিরাকে বলিয়াছে, 'বড়ো ঝামেলা, ভাই , গল্প জমে না।' ইন্দিরাকে সে ডাকিয়া লইয়াছে।

যাইবার আগের দিন রাণু আমাদের বাড়িতে আসিলো।...ছেলেটিকে ইন্দিরার কোলে দিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম রাখিয়া কহিলো,— 'কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।'

আমি বলিলাম,—'ভালমানুষ বৈ কি।' বলিয়া রাণুর দিকে চাহিয়া হাসিবো কি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিবো তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আইনের পুস্তকের দিকে চাহিয়াই একটু হাসিলাম।...

—'রাজি তো ?'

নিজেরই চমকানো দেখিয়া বুঝিলাম অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম।

—'কিসে ?'

ইন্দিরা বলিলো—'ঐ রকমই, কথায়-কথায় অন্যমনস্ক।'

রাণু বলিলো,— 'ঐ যে বললাম, বৌ রাত্তিরে আমার আছে শোবে। আর তো দেখা হবে না...'

কণ্ঠস্বর গাঢ় শুনাইল।

বলিলাম, — 'আচ্ছা।'

ইন্দিরা বলিলো,—'যা বলেছি ঠিক তাই।'

— 'কী?'

— 'রাণুটা একটা পাগল।'

— 'আবার কী বললে?'

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, — 'কে জানতো…'

বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিলো।

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, — 'কথাটা কী?'

ইন্দিরা বলিলো, — 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম। —

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক্ রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে!…আমি তৃপ্ত।

———

## শঙ্কিতা অভয়া

মেয়ে শান্তিময়ীর জন্য জননী অভয়ার মানসিক চাঞ্চল্যের এক মুহূর্ত বিরাম নাই, আর, চাঞ্চল্য এতো যে তার অন্ত নাই—তার সেই উদ্বেগ আর ভীতি এতো প্রবল আর অসহ্য যে সময়-সময় বিভ্রান্ত অস্থির চিত্তে সে আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি লাভের কল্পনা করে — দিবারাত্র মেয়ের অশুভ পরিণাম চিন্তা করিয়া করিয়া তারই বিষে তার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—

শান্তির বয়স সতেরো, অতিশয় সুশ্রী মেয়ে; শরীরের গঠন-নিবিড়তা এমন পূর্ণাঙ্গ চমৎকার সুস্থ যে, অভয়ার মনে হয়, তার তুলনা নাই; কিন্তু মনে হয় না যে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাকে নিরীক্ষণ কি আশীর্বাদ করা যায় — তার রূপ আর দোষের কথা মনে হইয়া অভয়ার শরীর আতঙ্কে শিহরিত হইতে থাকে —

সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকর তার চক্ষুদুটি—মেয়ের চক্ষু ঠিক মায়ের অতীত দিনের চক্ষুর মতো—গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির; মনে হয়, গভীরতার ভিতরে এমন চঞ্চল একটা স্রোত বহিতেছে যার লক্ষ্য নাই, ইষ্টকর গন্তব্য ক্ষেত্র নাই, প্রতি মুহূর্তে যার গতি পরিবর্তিত হইতেছে—

অভয়ার অত্যন্ত ভয় এখানেই —

তার মনে হয়, মেয়ে যেন কেবলই ভাবে, কাজের বেলায় লঘু-গুরু ন্যায়-

অন্যায় বলিয়া বাধা কিছু নাই ; দেখিতে হইবে, কাজে দুঃসাহস চাই কতোটা, আর, তাতে নূতনত্ব আর কৌতুক কতোটা।

অভয়ার ভয়ের আরো কারণ শান্তির মনের লীলাপ্রিয়তা, যাকে বৈজাত্য বলা যাইতে পারে—উদ্ভট আর উৎকট যা তারই দিকে তার অন্ধ আগ্রহ — আর, যতো উদ্ভট আর উৎকট আলাপ তার আর কার সঙ্গে তা জানা নাই, কিন্তু বাপের সঙ্গেও।

অভয়ার আরো মনে হয়, মেয়েটির প্রকৃতি আর রুচি এমনি তরল আর স্খলিত আর নিম্নগামী যাতে তাহাকে কেবল গৌণ আনন্দের হেতু মনে হইয়া মুখ্য উল্লাসের দু-দিনের সহচরী হিশাবে লাভ করিতে পুরুষ লালায়িত হইয়া ওঠে — বিবাহের পাত্রী হিশাবে সে বিচার্য নহে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের গুরুতর কথা বিশেষ হয় না। কোন্ ঔপন্যাসিক দুঃসহ স্বাধীনতার সহিত পরকীয়া প্রেমে সিদ্ধিলাভের স্তবরচনাপূর্বক যৌনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কোন্ নর্তকীর নৃত্যনিপুণতা ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়ার যোগ্য, কোন্ অভিনেতার কণ্ঠস্বর চমৎকার মাদকতাপূর্ণ আর স্বরগ্রামের প্রত্যেকটিতেই সমান খেলে, ইত্যাদি বিষয়ে অভয়া কী জানে। কিন্তু শান্তি তা জানে, বাপের সঙ্গে তর্ক করে ; জিতিতে চায়···

ফুটবল, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, এমন কি প্রেমের প্রসঙ্গ পর্যন্ত বাদ যায় না—

এমনও কি, 'প্লেটোনিক লাভ'-ও তাদের অবাধ চর্চার অন্তর্ভুক্ত—

গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চায়, বাবা, 'তা কি সম্ভব ?'

— 'কী ?'

— 'তুমি শুনছো কী তবে ! ঐ "প্লেটোনিক লাভ" ! স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হবে, অথচ স্ত্রী-পুরুষের নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হবে যাতে তা আদৌ ঘটবে না — তা কি হয় ?'

— 'কোথায় পেলে এ কথা ?'

— 'একখানা ইংরেজি বইয়ে পড়লাম। একটি যুবক আর একটি যুবতী ঐ শর্তে বিয়ে করেছিল ; স্ত্রীটি ছিলো নর্তকী। নৃত্যকলায় চরমোৎকর্ষ দেখানোই ছিলো তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, সব-কিছুকে বলি দিয়ে ; কিন্তু জয়মাল্য পেতে হ'লে সবুর স'য়ে থাকতে হয়···ছেলেটি তাকে ততোদিন প্রতিপালন করতে রাজি হ'লো — দু-জনাই ঐ কলা নিয়ে উন্মত্ত···'

— 'তারপর ?'

— 'খেয়ালের ঝোঁকে কিছুদিন বেশ চললো ; ছেলেটি কাছে ঘেঁষে না — চুম্বন পর্যন্ত নিষিদ্ধ···কিন্তু ক্রমশ ছেলেটির সম্বন্ধে দেখা গেলো, রক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে—হৃৎপিণ্ডে আঘাত করছে — বললে, 'আমরা ভুল করেছি ; তুমি এসো···'

মেয়েটি বললে, 'উঁহুঁ — আমি আর্টের উপাসিকা ; তোমাকে আমি ভালোবাসি ; কিন্তু সাবধান, তুমি আমার সম্মুখে এসো না — তুমি অত্যন্ত দুর্বল — দুর্বল পুরুষকে আমি ঘৃণা করি — তুমি যাও···'

ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে গেলে —

কিন্তু একদিন হ'লো কী···

— 'কী হ'লো ?' অতুল সাগ্রহে জানিতে চাহিলো।

— 'সেদিন জ্যোৎস্না রাত। স্বামী বাগানে ব'সে ছিলো ; অন্ধকার একটা জায়গায়। স্ত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ব্যালকনিতে — মিহি ঢিলে একটা আঙরাখায় দেহ আবৃত — বাহু তুলে সে চাঁদের দিকে ঊর্ধ্বনেত্র হ'য়ে রইলো ···বাহু আন্দোলিত ক'রে কাকে যেন সে আহ্বান করলো··'

সে-আহ্বান যাকেই করা হোক্ ছেলেটির মনে হ'লো, যেন তাকেই — বাহু-সঙ্কেতে সে অন্তরঙ্গ পুরুষকেই আশ্লেষে আহ্বান করেছে—এতোদিনে স্ত্রীর নারীত্ব দুর্দমনীয় হ'য়ে জেগেছে ; সে-আহ্বান আন্তরিকতায় এমনি গভীর আর উষ্ণ যে, ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসে দুর্বার হ'য়ে ছুটে এলো জ্যোৎস্নামণ্ডিত সেই অপরূপ মূর্তির কাছে আত্মার প্রথম বরণ সার্থক করতে···

কিন্তু তার আশা অমূলক—স্ত্রী তার কথা শুনে অবাক হ'য়ে বললে, সে তাকে ডাকে নাই—জ্যোৎস্নালোকে স্ফুট স্ফূর্ত জীবনকে সে অনাদি অনন্ত অমর জীবন-স্রোতে ঢেলে দিয়েছিল। শুনে ছেলেটি শাদা হ'য়ে কাঁপতে লাগলো···'

বলিয়া শান্তি যেন ক্লান্ত হইয়া থামিলো ; বলিলো, 'আরো ঢের আছে — অতো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বাবা।'

অতুল একটু হতাশ হইলো ; কিন্তু হাসিয়া বলিলো, 'শেষটায় কী হ'লো ?'

— 'যাকে দেখে, অর্থাৎ যার আকর্ষণে আর স্পর্শে মেয়েটির যৌবন উদ্বেল আর পূর্ণ সত্তা উন্মুখ হ'লো সেই পুরুষকেই সে আত্মসমর্পণ করলো···'

— 'স্বামী ?'

—'সে বেশ্যাসক্ত হ'লো।···আচ্ছা, বাবা, যৌন-আকর্ষণ কি এমনি দুর্বার ?'

অতুল শান্তির চোখে চোখে চাহিয়া বলিলো, 'তা-ই তো মনে হয়।'

-- 'কিন্তু আমি তো বোধ করিনে !'

— 'সেই অর্থে উগ্র স্পর্শ তুমি পাও নাই।' বলিয়া অতুল নিজের কথার তাৎপর্য ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলো ; বলিলো,—'নারীর উপর পুরুষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই ; পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে আর নিজেকে দান করে নিঃশেষ ক'রে। এটা হবেই ; সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী ক'রে রেখেছে ঐ নিয়মটি…'

অভয়া নিঃশব্দে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিল — তার স্নায়ু আর মন পুনঃপুনঃ কেমন করিয়া মোচড় খাইতেছিল তা সে-ই জানে। সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে যে-নিয়মটি তাহাকে পৌরাণিক কি আধুনিক উপাখ্যানের সাহায্যে অধিকতর গুণোপেত করিয়া উপলব্ধি করানো যাইতে পারে। মনে হইতেই অভয়া পর্দা ঠেলিয়া একটু বেগের সঙ্গেই প্রবেশ করিলো, নিয়মের ব্যাখ্যানকারীকেই সে বলিলো, — 'তোমার কি একেবারেই মতিচ্ছন্ন ঘটেছে ? এতদূর খেপেছো তুমি ?'

শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল ঈষৎ হাস্য করিলো, অর্থাৎ দেখো তামাশা ! তা-ই বটে। শান্তি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলো, বলিলো, 'মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে, পাঁজির মতো কেবল নিষেধে পরিপূর্ণ, আট-ঘাট বেঁধে দেওয়া।'

—'শাসন ক'রে, সংযত রাখার উপায় ঐ। অতো অশুভ-অন্যায় কথা আমি এখানে হ'তে দেবো না।…তোমরা সম্পর্ক ভুলেছো এমন একটা মোহের বশে যাকে ঘৃণা করতেও যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তাও যেন পারিনে।'

শান্তি মায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিলো, সুন্দর ভাষায় আর সুন্দরতর ভঙ্গি-সহকারে বলিলো, — 'মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে ; যতো গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টামি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন ? শিক্ষা নেবো না ?'

'নেও।' বলিয়া অতুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভয়া চলিয়া গেলো—ওদের নিষ্কৃতি দিলো।

অতুলের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয় ; শরীর সুস্থ এবং পুষ্ট, কিন্তু শরীরকে অতিক্রম করিয়াই বিবেচ্য যে-কথাটা তা এই যে, পিতৃসঞ্চিত দেড় লক্ষ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ পাইয়া সে বড়োলোক হইয়াছে। শিক্ষিতও সে খুব — বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, এম-এ পড়িবার সময় একটি ঘটনায় সে কলেজ এবং দেশ এক সঙ্গেই ত্যাগ করে।

শান্তিকে সে কেতাবি বিদ্যা শিক্ষা দেয় ; আবার শান্তিও তাকে শেখায় — এস্‌রাজ বাজানো শিখাইয়া লইয়াছে, এবং আরো শেখায়…

বলে, 'বাবা, তোমার হাত অতি চমৎকার, আমার চাইতেও ভালো, ভারি মিষ্টি। আমার কাছে শিখে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছাড়িয়ে যাও। মাস্টার মশায় সেদিন তোমার বাজনা শুনে গেলেন তো! আমাকে বললেন, শান্তি, তোমার বাবা একটি অদ্ভুত প্রতিভা ; শিক্ষকের শিক্ষাকে এমন দ্রুত আয়ত্ত আর উন্নত করতে আর কাউকে দেখিনি।'

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অতুল যথেষ্ট পুলকিত হইলো ; বলিলো, 'কিন্তু তার একটা মানে আছে…'

— 'মানেটা কী ?'

প্রচ্ছন্ন যে-জিনিশটা উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাকে নবজাতকের মরমি মর্যাদা দিতে শান্তি খুব প্রস্তুত ; মানে জিজ্ঞাসা করিয়া সে উৎসুক হইয়া রহিলো…

অতুল বলিলো, 'তোর কাছে শিখতেই আমার কতো আনন্দ! সেই মুখর আনন্দের আলাপ শুনে মনে হয়, মধুর জিনিশকে মধুরতর করা হচ্ছে।'…বলিয়া সে যেন চুরি করিয়া হাসিতে লাগিলো। তারপর বলিলো, 'তোর গুরুর কাছে শিখলে ওটা হ'তো না।'

শান্তি জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন ?'

অতুল তখনই কোনো জবাব দিলো না ; একটু পরে, যেন একটা কিছু সহিয়া লইয়া, বলিলো, 'সে অন্য কথা।'

– 'অন্য কথা থাক্। কেমন সুন্দর মেঘ করেছে দেখো, বাবা! অকালের মেঘ দেখে আমার খুব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটু বাজাবে, বাবা ?'

অতুলও মেঘ দেখিলো ; অপরাহ্নের সূর্যকে আবৃত করিয়া অত্যন্ত গাঢ় নীল পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—মেঘের সেই গতিটুকু যেন তার কান্তিরই বিলসিত হিল্লোল—চক্রবালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে…

বলিলো, 'বাজাবো যন্তরটা দে।'

শান্তি এসরাজ আনিয়া দিলো ; বলিলো, 'তুমি ততোক্ষণ সুর বাঁধো, আমি সেজে আসি।' বলিয়া সে এখনকার, অর্থাৎ মেঘলোকের সঙ্গে ভূলোকের মিলন-বার্তা বহন করে যে-নাচ সেই নাচের উপযুক্ত পোশাক পরিতে গেলো, অবশ্য নাচের ভঙ্গিতেই গেলো।

অতুল যন্ত্র বাঁধিলো—

শান্তি সাজিয়া আসিলো — অতি উজ্জ্বল চওড়া লাল পেড়ে মেঘবর্ণের শাড়ি ঘাগরার মতো করিয়া সে পরিয়াছে, আর সর্বাঙ্গে জড়াইয়াছে ঐ রঙেরই ওড়না, ওড়নার জরির পাড় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে ; গভীর কালোচুলের রাশি বিস্তৃত করিয়া এলাইয়া দিয়াছে···সমগ্র কৃষ্ণ-পরিবেষ্টনীর মাঝে তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে—

দেখিয়া অতুল মুগ্ধ হইয়া গেলো, বলিলো, 'বাঃ···'

—'মেঘ বিদ্যুৎ ঝড।' বলিয়া শান্তি হাসিলো।

তার হাসিটাও হঠাৎ চমৎকার হইয়া দেখা দিলো। পাদপীঠ রক্তাধারে প্রজাত হইয়া তার হাসি নিমিষেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে — সুসজ্জিত শুভ্র দন্তপংক্তি যেন তার যৌবনবাঞ্ছিত অন্তরের অপরূপ উদয়-জটায় আলোকিত হইতে থাকে, — সমগ্র মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়া যায়···

কিন্তু এখন তা দেখা দিলো আরো সুন্দর হইয়া — গৃহের অভ্যন্তরের এই শ্যামসুন্দর মেঘম্লানিমা উত্তীর্ণ হইয়া মেঘের নীলাঞ্জন-অঙ্গে যেন তার হাসির ঝলক লাগিলো—

অতুল মনে-মনে তার তারিফ করিলো ; বলিলো, 'সেজে তো এলে চমৎকার। কী বাজাবো ?'

শান্তি ভ্রূভঙ্গি করিলো ; বলিলো,—'তুমি যেন দিন-দিন নাবালক হচ্ছো, বাবা !'

এই ভৎ'সনায় অতুলের আনন্দ দেখা দিলো ; যেন কৃতার্থ হইয়া বলিলো, 'তা আমি জানি, কিন্তু নাচবে যে তুমি ! তোমার মন এখন কী বলছে আর কী চাইছে তা আমি কী জানি !'

— 'জানো।'

— 'আচ্ছা।' বলিয়াই অতুলের যেন সেই মুহূর্তেই মনে-মনে প্রতীক্ষার আর আয়োজনের শেষ হইয়া গেলো — শান্তির উদ্দীপ্ত দেহ-ভঙ্গির মাঝেই সে একটা ছন্দ খুঁজিয়া পাইলো······যন্ত্রের তারে তার একটিমাত্র আঘাতে শব্দ যেন আত্মার আবেগে কল্লোলিত হইয়া উঠিলো—

তারপর তার বাজনা শুরু হইলো···

শান্তি সর্বাঙ্গ অপরূপ একটা প্রযত্নের সহিত সংযত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে-ধীরে তার দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিলো···

নৃত্য শুরু হইলো—বাহু দেহ চরণের গতি-মর্মময় রূপ গ্রহণ করিলো···

কুমারী সে—কেহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই—সে কিছুই জানে না, কিছুই সে গ্রহণ করে না—প্রেম তার অজ্ঞাত···

তারপর, পুরুষ তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে—তার দেখা পাইয়াছে, কিন্তু পরিচয় পায় নাই—কুমারীর গহন অন্তর রহস্যে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ…তারপর সে প্রেমাভিলাষিনী, কিন্তু ছলনাময়ী…

অতুলের হাতে যন্ত্র যেন সজীব হইয়া সঙ্গীত ধ্বনিত করিতে লাগিলো…

শান্তি এইবার দেখাইবে, কুমারীর কল্পনার লাস্য আর কেলিপ্রবণতা তিরোহিত হইয়াছে—সে এখন মহিমময়ী—জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার প্রেমে সে এমন প্রদীপ্ত—সে তার আত্মার সহচরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে—সে এখন রাজ্ঞী অথচ পরিচারিকা, বিজয়িনী অথচ কোমলা, পূজারিণী অথচ উপাস্যা—রঙ্গিনী অথচ পরম পবিত্রা—পরবশার মতো চায় সবই, কিন্তু কাঁপিয়া সারা হয়; মন চায় আর না চাহিবার ভান করে আর ভয় পায়—তারপরই সহসা একসময় কুলভাঙা উদ্বেল প্রেমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্বস্ব সমর্পণ করে—পুরুষের আপন হয়…

তারপর আসিলো স্থিতি, গতি, গণ্ডির ভিতর—শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাহুতি…

ঐ ব্যঞ্জনাময় নৃত্য শেষ হইলো—শান্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—

মেঘ কাটিয়া অস্তমান সূর্যের আভায় পশ্চিমের আকাশ তখন লাল—ঘরেও তা প্রতিফলিত হইয়াছে…

কোলের উপর যন্ত্র নামাইয়া অতুল ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে তাকাইল…নূতন কিছু দেখিবে বলিয়া সে তাকায় নাই, কিন্তু দেখিলো যা তা প্রায় নূতনই—শ্রমে-উত্তেজনায় শান্তির মুখমণ্ডলে একটা রক্ত আভা ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে শিশিরকণার সঙ্গে তুলনীয় বিন্দু-বিন্দু স্বচ্ছতম ঘর্ম—

আর, নাচ শেষ হইলেও, অতুলের মনে হইতে লাগিলো, প্রেমের এই ব্যাখ্যা, ব্যঞ্জনা আর মূর্তি একটা উজ্জ্বল কলেবর ধারণ করিয়া সেই চিরন্তন মানুষের অন্তর-বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, যে-মানব প্রেমাকাঙ্ক্ষী, মেঘ ঘনাইলে যার বুকে পিপাসা আর নিশ্বাস সঞ্চিত হয়; বিদ্যুৎস্ফুরণে যার মনে হয়, মিলনাকুলা অভিসারিকা কেকাকুজিত বনভূমিতে পথরেখার সন্ধান করিতেছে —

অতুলের চোখের সামনে খেলিতে লাগিলো, তখনকার সেই রক্তপ্রান্ত অশেষ মেঘপুঞ্জের অপরূপ বর্ণ, আর, নিশ্চলতার সঙ্গে তার অপরূপ দ্যুতি আর গতি…

শান্তির নৃত্যে তা অব্যর্থ আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ঈষৎ অন্ধকার কক্ষটি ছিলো যেন মেঘের স্পর্শানুভূতির আবেশে মধুময়, আর মোহময়, — ঐ নীল শাড়ির প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া সঞ্চালিত উড্ডীয়মান ওড়নার মেঘের গতি

তরঙ্গায়িত হইয়া দেখা দিয়াছিল—ওড়নার সোনালি পাড়ে ঝলকিত হইয়াছিল বিদ্যুতের সর্পিল তীক্ষ্ণ স্ফুরণ···

পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিমান, সম্ভোগ প্রভৃতি নৃত্যে ব্যঞ্জিত করিয়া, অর্থাৎ আপনারই আবহস্বরূপটিকে রসে-প্রেমে রঞ্জিত আর প্রেমের রসে-রভসে নিমজ্জিত করিয়া শান্তি ঘনঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলো —

তার মুখের রক্তাভার সঙ্গে ঘর্মবিন্দু এবং ঐ দুটির সঙ্গে তার সঘন নিঃশ্বাস-পতনও অতুল দেখিলো, এবং দেখিয়া অতুলের অকস্মাৎ যা মনে হইলো, এমনি দৃশ্যের সমগ্র পরিবেশের অভ্যন্তরে তা অস্বাভাবিক নয়, অন্তত তার পক্ষে — এবং তারও পূর্বে নৃত্যভঙ্গিতে প্রেমের যে-ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল তাহাও ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলো, আর. সকলে মিলিয়া অতুলের মনে পড়াইয়া দিলো, নারীর সঙ্গে পুরুষের নিকটতম যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দেহ একবার হয় অগ্নিগর্ভ, একবার হয় রোমাঞ্চিত সেই সম্বন্ধটি···

শান্তি তখন নিজেকেই অধ্যয়ন করিয়া মুখভরে মৃদু-মৃদু হাসিতেছে —

জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেমন নাচলাম, বাবা ?'

— 'চমৎকার, কিন্তু প্রেমের তুই কী জানিস যে এমন সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুললি ?'—অতুল ঐ সংবাদটি জানিতে চাহিলো···

শান্তি বলিলো, 'স্বপ্নে পেয়েছি। যাই, পোশাক বদলে আসি!'

অভয়া এতক্ষণ ভূমিশয্যায় পড়িয়া প্রাণান্তকর বিক্ষোভে কেবলই ছটফট করিয়াছে; উহাদের, যারা বাজাইতেছে আর নাচিতেছে তাদের, কি ইহকাল-পরকাল ধর্মাধর্মজ্ঞান কিছুই নাই! উৎসন্নে যাইবার পথে কি উহাদের এক মুহূর্তের জন্য একটুও চৈতন্যের উদয় হয় না যে তারা ভদ্রলোক! নরকের ভয় নাই!···অভয়ার মনে হইতে লাগিলো, সে বড়ো অসহায়, আর বড়ো দুঃখিনী। প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া দুষ্কার্যের প্রতিবাদ করিবার মতো মনই তার নয় — সে তা পারে না! তার এই অক্ষমতা হয় তার আরো কষ্টের কারণ — সেই কষ্টেই সে আরো অবসন্ন হইয়া ওঠে। মনে হয় পাগল হইয়া যাইবে।

যন্ত্র সঙ্গীত এবং তার আনুষঙ্গিক নৃত্য, অথবা নৃত্য, এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত, সমাপ্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে অভয়া ধীরে ধীরে উঠিলো···দ্বিতলে গেলো — পর্দা সরাইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলো — দেখিলো যন্ত্রসঙ্গীতে যিনি নিপুণ, তিনি কৌচে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন, আর যিনি নৃত্যনিপুণা তিনি বসিয়া আছেন পালঙ্কে —

উভয়ে কথাবার্তা হইতেছে; মেয়ে বলিতেছে, 'বাংলা তিরিশে গগন

খাস্তগীরের বাড়িতে যে নৃত্য প্রতিযোগিতা হবে তাতে আমি এই নাচটা দেখাবো বাবা। আরো বারকতক রিহার্সেল দিতে হবে। তুমি বাজাবে, বাবা। তুমি বাজালে মেডেল আমি অনিবার্য পাবোই — ওস্তাদজিও খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। মা এসে দাঁড়িয়ে আছে।' বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া শান্তি হাসিলো।

অভয়া বলিলো, 'ঠাট্টা হচ্ছে !'— অতুলকে বলিলো, 'তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা ছিলো ...'

শান্তি বলিয়া উঠিলো, 'তোমার গোপনীয় কথা কিছুই নেই। আমি রসাতলে যাচ্ছি, বাবা তার সহায়—এই নিয়ে বাবাকে তুমি বকবে। এই তোমার কথা! আমার সামনেই বলো।'

মেয়েকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অতুলকেই অত্যন্ত বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অভয়া রাগের সহিত বলিলো, 'আমি এখনও তোমার অন্ন খাচ্ছি, এ-ই আমার সব দুঃখের বড়ো দুঃখ।' বলিয়া সে ক্ষিপ্র হস্তে পর্দা সরাইয়া ক্ষিপ্র পদে চলিয়া গেলো—

কিন্তু অতুল কিছুমাত্র বিদ্ধ হইলো না—

অভয়ার রোষ অকারণ এবং অসংবদ্ধ মনে হইয়া সে উল্‌টোভাবে হাসিতে লাগিলো।

রাত তখন আটটা—

পর্দার উপর ছায়া পড়িতেই চেঁচাইয়া উঠিলো, 'কে ওখানে ?'

—'আমি।' বলিয়া অভয়া মনে-মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া গত্যন্তর অভাবে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলো। তার মনে ছিলো না যে, চাঁদ উঠিয়াছে, আর অতুলের পড়িবার ঘর পূর্বদ্বারী।

শান্তি নাচে, এবং বড়ো বড়ো বইও পড়ে, অতুল যথাসাধ্য মর্ম গ্রহণ করায়, কিন্তু ভারি বাছ-বিচার; কারণ, কোনো একটা জিনিশকে বহুর ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়া তার অনমনীয় দুরন্ত গোঁড়া হওয়া আধুনিক সভ্যতার একটা সুলক্ষণ বলিয়া সে মনে করে...

মেকলে, থ্যাকারে আর এ্যাডিসনের ইংরেজি ভালো নয়, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ; শেক্‌সপিয়রের এতো পাঠান্তর আর এতো নিজস্বতা যে, বাঙালির পক্ষে তা বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব, ইহাও সে বলে; ইংরেজিতে অনুবাদ করা অন্যান্য দেশের বই পড়া কঠিন, কারণ, পুস্তকান্তর্গত নামগুলি দুরুচ্চার্য—কোনো প্রকারে কায়দা করিয়া বাগাইতে পারিলেও বেশিক্ষণ মনে থাকে না; আধুনিক লেখকগণ বেশি প্রগল্‌ভ আর ধড়িবাজ, মাঝে মাঝে অত্যন্ত নগ্ন— এতোটা প্রায়ই ভালো

লাগে না; প্রবন্ধ কি ভ্রমণবৃত্তান্তও ভালো লাগে না — মনে হয়, বৃংহন বড়ো বেশি…

— 'তবে তুই চাস কী? প্লেটোনিক লাভের বই?'

— 'আমি চাই সরল আনন্দ। ডিকেন্স আমি খুব পড়ি।'

অভয়া এতোক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সরল আনন্দের কথা শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলো না —ভৎ'সনা নির্গত হইলো; বলিলো, — 'তোমাকে দেয়া হবে গরল — সেই আয়োজনই বুঝি হচ্ছে।' বলিয়া সে অতুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলো —তার চোখের উপর চোখ পড়িলো; বলিলো — 'মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো তো?'

—'নষ্ট করতে চাই তা তুমি জানলে কী ক'রে?'

— 'তবে লাভের কথা ওঠে কেন? তুমি স'রে থাকো না কেন? ইচ্ছা ক'রে স'রে থাকো না দেখে তাই মনে হয়। তুমি গুরুজন; গুরুজনের সম্মান নষ্ট হচ্ছে, তা না বোঝার 'ভান করো কেন!…আমার অদৃষ্টে যা ছিলো তা ঘটেছে…'

অত্যন্ত শান্ত স্বরে অতুল বলিলো, —'তুমি যাও এখন।'

—'যাই। আমি কিন্তু আর যন্ত্রণা সইতে পারছিনে, নিজেকে বইতে পারছিনে —এতো ভয় আমি কোনো দিন পাইনি।'

—'ভয়ের কোনো কারণ নেই —'

—'আছে; তোমাকে আমি চিনি।' বলিয়া অভয়া চলিয়া যাইতেছিল, শান্তি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল; বলিলো—'তোমাদের কথা আমি বুঝলাম না কিছুই; কিন্তু মনে হ'চ্ছে, কথাটা দুঃখের — তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে ব'লে ভয় করছো। সেটা কী মা? বাবার কি চরিত্রদোষ ছিলো?'

অভয়া বলিলো, 'বলবো একদিন।'

অতুল এ-কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলো না, নির্বিকার ভাবে বলিলো, 'তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।'

—'তা জানিনে।' বলিয়া অভয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলো—

এবং শান্তি হঠাৎ জানিতে চাহিলো—'মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?'

এই প্রশ্নে অতুল একটু যেন কৌতূহলী হইলো; মুখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিলো।

অভয়া কথা কহিলো না।

অতুল বলিলো, 'কেন বলো তো?'

— 'আমি দেখি তা-ই। কোনোদিন তোমাদের মুখে অপর কারো কথা শুনিনে—কারো চিঠি আসে না। আমার কি মামা মাসি পিসি খুড়ো জ্যাঠা কেউ নেই?'

—'আছে...'

—'তবে?'

—'তারা আমাদের খোঁজ নেয় না, আমরাও তাদের খোঁজ নিইনে।'

— কখনো না?'

— 'না।'

— 'অপরাধ?'

অভয়া বলিলো, 'অপরাধ ওঁরই—উনি তা অস্বীকার করুন দেখি··'

মুখ-চোখ দেখিয়াই মনে হইলো, অতুল যেন বিপন্ন হইয়াছে—মনে-মনে ভারি ছটফট করিতেছে; নিষ্পলক চোখে সে কয়েক মুহূর্ত অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো, যেন, করুণা প্রার্থনা করিতেছে··

কিন্তু মুখে সে বলিলো, 'তুমি এখন কী পড়ছিলে?'

জিজ্ঞাসা করা হইলো অবশ্য শান্তিকেই; এবং শান্তিই বলিলো, 'তুমি কথাচাপা দিচ্ছো বাবা; আচ্ছা তাই হোক—অতীতকে আর কথা কইয়ে কাজ নেই।' বলিয়া হাসিয়া উঠিলো; বলিলো,—'পড়ছিলাম ডিকেন্স। ডিকেন্সের লেখায় আমি যেমন সরল আনন্দ পাই, অপর কারো লেখায় তা পাইনে। কিন্তু মা এসে রসভঙ্গ ক'রে দিলো। তুমি যাও, মা।'

উভয়েরই কাছে অপ্রস্তুত হইয়া অতুল কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া রহিলো — অভয়া বাহির হইয়া আসিলো, এবং বাহিরে আসিয়াই সে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলো না—অসহ্য অতীত উত্তরোত্তর অতিশয় উচ্চকণ্ঠ আর যন্ত্রণাকর হইয়া উঠিয়াছে।

—তাহাকে উদগীরণ না করিলেই নয়।

অভয়াকে যেন কণ্টকবনে বিচরণ করিতে হইতেছে — তাহাকে সেখানে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে — অষ্টপ্রহর এমনি তার শশব্যস্ত হইয়া নিষ্কৃতির উপায় অন্বেষণ আর যন্ত্রণা। মেয়েটিকে কোন পথে লওয়া হইতেছে তা সে নিঃসংশয়ে জানে না, কিন্তু লক্ষণ আর অসম্ভব যা তা ভয়ঙ্কর ভাবিতে গেলে আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিতে হয়—হুঁশ থাকে না—বুকের স্পন্দন অচল হইয়া আসে।

শান্তি একদিন গল্প করিয়াছিল যে, সে আর তার বাবা রাস্তায়

বেড়াইতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া গেলো একটি ভদ্রলোক, কিন্তু নিরীহ সেই লোকটিকে দেখিয়াই থতোমতো খাইয়া তার বাবার পলায়ন করিবার সে কী চেষ্টা! তার বাবা যেন চোর—ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে…

অভয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'সে-লোকটা কী করলো?'

—'চোখ বড়ো ক'রে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো। অনেকক্ষণ পরে যেতে যেতে পিছনে তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়েই আছে, ঠিক সেখানেই, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

— 'মুখখানা কেমন?' ওঁর মতো দেখতে?'

— 'না, বাবার মতো নয়, তোমার মতো তো নয়ই। কে, মা? চেনা মানুষ নিশ্চয়ই; আর, তার কাছে বাবা লজ্জাকর গুরুতর অপরাধে অপরাধী, এ-ও নিশ্চয়। ব্যাপারটা কী? তুমি নিশ্চয়ই জানো…'

শান্তি রাগ করে নাই, ভয় পায় নাই, ব্যথিত হইয়াছিল।

কিন্তু অভয়া সে-কথার জবাব না দিয়া প্রাণপণে অনুমান করিতে গিয়াছিল, লোকটা কে, কোন বাড়ির। তার শ্বশুর বাড়ির না বাপের বাড়ির।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'খুব বুড়ো নাকি লোকটা?'

বিরক্ত হইয়া শান্তি বলিয়াছিল,—'বুড়ো বই কি; বয়স ঢের হয়েছে মনে হ'লো। আরো যদি বর্ণনা চাও, দিতে পারি। খুব ফরশা রং, লম্বা, মোটা নয় বেশি, তবে পাতলাও নয়। পেলে? ভালো কথা, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই—টাকার মানুষ ব'লে মনে হ'লো—টাক প'ড়ে আসছে। তোমরা দিন-দিন আমাকে বিষম ক'রে তুলছো, তা জানো।'

অত্যন্ত ক্লান্ত ম্লান চক্ষে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অভয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, লোকটা কে।

অতুল দিয়াছিল সদুত্তর —

শান্তির প্রশ্নের জবাবে সে বলিয়াছিল, ঐ লোকটা তাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া—

— কখন?

— যখন আমরা পৃথক হই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার ভিতরে তার আসার দরকারই ছিলো না আমরা কেউ তাকে ডাকিওনি; দাদাকে ওকালতি কুপরামর্শ দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতেই একদিন দিলাম ক'ষে প্রহার। সেই থেকে লোকটা পরম শত্রু হ'য়ে আছে…

বলিয়া অতুল এমন উন্মুক্ত একটি উচ্চহাস্য ধ্বনিত করিয়াছিল যে, প্রহারের অপমান আর যন্ত্রণা লোকটা আজও যে ভুলিতে পারে নাই তাহা প্রচণ্ড নির্মল একটি কৌতুকের বিষয়।

শান্তির মনে হইয়াছিল, ঘটনা সত্যিই বুঝি তা-ই; কিন্তু অভয়া এই জাজ্বল্যমান মিথ্যা উক্তির দরুন নয়, যথার্থ ব্যাপার সন্দেহ করিয়া বিবেকদংশনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অতুল শান্তিকে লইয়া সিনেমায় গিয়াছে। কিন্তু ফিরিতে বড়ো বিলম্ব করিতেছে। শো শেষ হয় সাড়ে ন-টায়; কিন্তু এখনো তারা ফেরে নাই — রাত দশটা বাজে। এই বিলম্বেই অভয়া উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে; নিজেদের কারে গিয়াছে, তাতেই ফিরিতে এতো বিলম্ব হইতেছে কেন! সিনেমায় যাইতেছি বলিয়া অন্য কোথাও যায় নাই তো!···ত্রাসে অভয়ার মাথায় ঠিক আসিতেছে না — একটা অগ্নিদাহে পড়িয়া তার চৈতন্য যেন ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে···ছটফট করিতে-করিতে অভয়া যাইয়া দাঁড়াইল দরজায় কিন্তু সেখান হইতে বড়ো রাস্তায় যে উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে একটি বাড়ির গায়ে তারই খানিকটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। গলির দুটি বাড়ি পার হইয়া গেলে তবেই সোজা রাস্তা পাওয়া যায়, এবং সেখানেই চলে যানবাহন প্রভৃতি···

অভয়া ফিরিয়া আসিলো — জানালায় যাইয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতেও দেখা গেলো ঊর্ধ্বগামী আলোকপুঞ্জের আভায় উজ্জ্বল শূন্য খানিকটা তার উপরে অন্ধকার—তার উপরে নক্ষত্র—অতুলের গাড়ি সে-পথে আসিবে না—

সরিয়া আসিয়া সে দরজায় চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলো—দূরে একটা উচ্চ শব্দ হইতেছিল, যন্ত্রের গর্জনের মতো সেই শব্দের দিকেই যেন সে চোখ মেলিয়া রহিলো···

তারপর যাইয়া সে শুইয়া পড়িলো মাটিতেই।

রাত তখন সওয়া দশটা; ওরা এখনো ফেরে নাই···

শুইয়া থাকিতে-থাকিতে তার সর্বাঙ্গ একবার নড়িয়া উঠিলো—একটা অনুচ্চ আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেলো। তারপরেই সে উঠিলো, অকারণেই রান্নাঘরে গেলো—সেখান হইতে ফিরিয়া ছাদে উঠিলো—কোনোদিকেই না তাকাইয়া নামিয়া আসিলো—শান্তির পড়িবার ঘরে গেলো—সেখান হইতে

তৎক্ষণাৎ গেলো নিজের শোবার ঘরে—পাতা বিছানা টান মারিয়া উল্টাইয়া দিলো—বসিয়া পড়িলো

তার মনে হইতে লাগিলো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে, তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধতা, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ, কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সংবিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে

তখনই পাওয়া গেলো সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ

অভয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো, যেন অনিবার্য আর অপরিহার্য একটা শোচনীয় দৃশ্য তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, আর বুক পাতিয়া দুর্জয় শোকের ঝঞ্ঝা গ্রহণ করিতে হইবে··

শান্তি হাসিতে-হাসিতে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল, তার পশ্চাতে অতুল, তাহারও হাসিমুখ। শান্তি বলিলো, 'মা হয়তো ভাবছিল, মটোর অ্যাক্সিডেন্ট হ'য়ে আমরা হাসপাতালে চালান গেছি। তা-ই ভাবছিলে না, মা?'

অভয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলো, 'না, আমি তা ভাবি নাই। এতো দেরি হ'লো যে?'

কৌতুকে-পুলকে ছিটকাইয়া উঠিয়া শান্তি বলিতে লাগিলো, 'বাবার কী কাণ্ড। মটোর ফেরৎ দিয়ে বললে, চলো হেঁটে যাই। তারপর রাস্তায় আসতে-আসতে বাবার বারবারই দাঁড়ানো শুরু হ'লো, ভিখিরিটা কেমন ভঙ্গি ক'রে বেঁকে-চুরে শুয়ে আছে, তা দেখলো দাঁড়িয়ে, চানাচুরওয়ালার সুর ভাঁজা আর বুলি শুনলো দাঁড়িয়ে, রেলিং-এ লটকানো ছবি দেখলো দাঁড়িয়ে, একটা শতছিন্ন কাপড়-পরা মেয়েমানুষ ব'সে আছে পা ছড়িয়ে একটা উলঙ্গ ছেলে আছে তার পিঠের উপর উপুড় হ'য়ে, তা দেখলো দাঁড়িয়ে। ইত্যাদি। ঈশ, এগারোটা বাজে যে!'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে, শেখানো কথা উনি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বলতে। তুমি পাষাণ, পাষণ্ড।'

অত্যন্ত ঝাঁজালো সুরে শান্তিকে অবিশ্বাস করিয়া আর অতুলকে গালি দিয়া অভয়া প্রস্থান করিলো।

'মা বলতে চায় কী! হঠাৎ খেপে গেলো নাকি! বাবা তোমাকে কেন মা গাল দিয়ে গেলো?' শান্তি বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলো।

'ঈশ্বর জানেন। চিরকালই দেখে আসছি, মাঝে-মাঝে অমনি আবোল-

তাবোল বকে।' বলিয়া অতুল নির্লিপ্তের মতো ধীরে-ধীরে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে গেলো।

খাইতে বসিয়া 'মাধুকরী' ফিল্মের উপাখ্যানভাগের আলোচনাই চলিতে লাগিলো ; শান্তি বলিলো, 'বাবা মা যদি দেখে তবে মা কী বলবে ! মূর্ছা যাবে হয়তো। সন্তানের উদরান্নের জন্য নানা পুরুষের পরিচর্যা করা অথচ কায়মনে যথার্থ সতী। উঃ, মা তা ভাবতেই পারে না।' বলিয়া হাসিয়া উঠিলো।

অতুল কেবল বলিলো, 'হুঁ।'

'কিন্তু বন্ধু নরেন্দ্র সেই মেয়েটিকেই ভালোবেসে বিয়ে করলে ! ঐ জায়গাটায় কী রকম হাততালি পড়লো ! তুমিও তো হাততালি দিয়েছিলে বাবা।'

'না, আমি দিইনি।'

'দিয়েছিলে।'

অতুল আবারও অস্বীকার করিলো, 'না, আমি দিইনি।'

ক্ষিপ্র একটা মেজাজের উপর অভয়া বলিয়া উঠিলো, 'তুমি নিশ্চয় দিয়েছিলে—তাইতেই তো এতো রাত হ'লো।'

'তোমার চরিত্র চিরকাল কু।'

শান্তি বুঝিলো, মা উত্তেজনাবশতই অসংলগ্ন কথা বলিয়াছে ; সে বিহ্বলের মতো একবার তার বাপের মুখের দিকে, একবার তার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল ; দেখিলো, তার বাবা নির্বিকার চিত্তে আহারে ব্যাপৃত ; মায়ের চোখে প্রচুর জল আসিয়াছে। বলিলো, 'ব্যাপার কী তোমাদের ! মা, তোমাকেই আমি দোষ দিই। বাবার চরিত্র কু হ'লেও সে-ইঙ্গিত বারবার কেন করছো, আর আমার সামনে কেন করছো ! আমাকে জানানো উচিত নয়।'

'তোকে ও কুসংসর্গ দিচ্ছে—কেন বলবো না ! পড়ায় তোকে কদর্য বই, নাচায়, কথা কয় খারাপ-খারাপ—আমি চুপ ক'রে থাকবো ?'

কিন্তু তারপরই তিনজনই চুপ করিয়া রহিলো আনন্দের আকাশ যেন দূষিত বাষ্পে ঘোলা হইয়া গেলো—এই নিরানন্দ আবহাওয়া শান্তিকেই আঘাত আর বিব্রত করিলো বেশি।

রাত্রি তখন অনেক—

অভয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলো—মেয়ের ঘরের দরজায় গেলো—চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কী ভাবিলো—

তিনটি শয়ন কক্ষ পাশাপাশি—ভিতরের দরজা খোলাই থাকে, অর্থাৎ অর্গলে

আবদ্ধ থাকে না। অভয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিলো, শান্তির অগভীর ঘুম ভাঙিয়া গেলো; বলিলো, 'কে?'

'আমি তোর মা। উঠে আয়, কথা আছে।'

কথা যে আছে তাহা শান্তি বুঝিয়াছে—শুইয়া-শুইয়া সে আজ অনেক কথাই ভাবিয়াছে। তার বাবাকে তাহারই সমক্ষে চরিত্রহীনতার অপরাধে পুনঃপুনঃ লাঞ্ছিত করার কারণ গভীরই; নিরীহ ভদ্রলোককে পথে দেখিয়া তার বাবার চোরের মতোন দ্রুতগতি পলায়ন করিবার কারণও গভীর—কেবল পারিবারিক কারণে বিবাদ নয়।

বাপের কুশিক্ষায় আর প্রশ্রয়ে সে অধঃপাতে যাইতেছে, মায়ের এই ধারণা—মায়ের উদ্বেগ স্বাভাবিক, কিন্তু মা গোপনে লক্ষ রাখিতে সচেষ্ট কেন!—তার বাবা অবশ্য তাহাকে কুশিক্ষা দিতেছেন না—যে-সব কথাবার্তা তাঁর সঙ্গে হয় তা এখন সর্বদেশেই সর্বজনীন ভাবে আলোচিত হইতেছে—মায়ের সেকেলে মনে আর শ্লীলতাবোধে তা আঘাত করিলেও মা খুব প্রকাশ্যে তাহাকেই শাসন কি-সাবধান করে না—মায়ের যতো আক্রোশ বাবার প্রতি—যতো ভর্ৎসনা তাঁকেই—আর, এমন কী হইয়াছে যে কাঁদিতে হইবে! মা খুব কাঁদেও।

শান্তির ইহাও মনে হইলো, আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তারা জীবনে কেউ একবারও দেখা করিতে আসিলো না কেন! সে দুষ্কৃতিটা কী, যাহার দরুন সবাই দূরে সরিয়া আছে একেবারে চিরদিনের মতো!

ইত্যাদি বিষয়ে এবং বিষয়ান্তরও পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া শান্তি ব্যাপারের হেতু এবং পরিণাম অনুমান করিতে পারে নাই—অপরাধ কোন্ জাতীয় তাহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই; এবং ইহাও তাহার স্মরণ হইয়াছে, যে তার বাবার মুখে কোনোদিন পাপের কুণ্ঠা সে লক্ষ করে নাই—

না ঘুমাইয়া শান্তি ঐ সব যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছে, এবং বিস্মিত হইয়াছে—

তার মা একটা বেদনার দুর্গতির ভিতর দিয়া দিনাতিপাত করিতেছে ইহা যেমন সত্য, তাহাদের জীবন রহস্যাবৃত তাহাও তেমনি সত্য—

মা ডাকিতেই তাড়াতাড়ি সে উঠিলো—বলিলো, 'চলো শুনিগে।'

উভয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠিলো, এবং উঠিয়াই অভয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো—চরম ব্যাকুলতার সহিত মেয়েকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া যে-কথা সে জানিতে চাহিলো সে-কথা কেহ-যে উচ্চারণ করিতে পারে তাহা বিশ্বাস হয় না—

অভয়া বলিলো, 'আমি পাগল হ'য়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি ক'রে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?'

এ-প্রশ্ন মানুষকে কেবল অবাক নয়, পাণ্ডুর করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট. শান্তি পাণ্ডুর হইয়া উঠিলো ; প্রশ্নের মর্ম সে বুঝিলো , মায়ের স্পর্শ ত্যাগ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিলো, 'নষ্ট করার মানে কী ? আর "ও" ব'লে তুমি কার কথা বলছো ?'

'বেটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিস্‌নে ?'

'বুঝলাম। কিন্তু "ও" মানে কী ?'

'অতুল।'

শুনিয়া শান্তি যেন বুকে ঘা খাইয়া নড়িয়া উঠিলো আর সরিয়া দাঁড়াইল বলিলো. 'বাবার কথা বলছো ?'

'হ্যাঁ। ও ইচ্ছে করলে যে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।'

'তুমি সত্যিই খেপে গেছো মা,—একেবারে উন্মাদ হয়েছো। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখে বেরলো কী ক'রে ? বাবা চরিত্রহীন, এ-কথা তুমি অনেকবার বলেছো , কিন্তু এ-কি কথা তোমার মুখে ! বাবা—'

বাধা দিয়া অভয়া বলিলো, 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয় ; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম···'

বলিতে-বলিতে হঠাৎ সে নিঃশব্দ হইয়া গেলো—

শান্তির একটা নিশ্বাস পতনের শব্দ হইলো—তারপর চরম নিঃশব্দে একটি-একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত কাটিতে লাগিলো।

## তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে

শ্রীচন্দ্রপুরের বঙ্কু গুঁই বিবাহ করিবে না বলিয়াই মনে করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু বিবাহ তাহাকে করিতেই হইলো। এটা বঙ্কুর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা।

বঙ্কু বিশ্বাসঘাতক নহে—চপল তো নহেই ; উপরন্তু স্ত্রী-সম্পর্কে যাবজ্জীবন-ব্যাপী একটা ঢল-ঢল দ্রবভাব আর গুণগ্রহিষ্ণুতাই যেমন তার চির-প্রতিপাল্য মৃদুতার কারণ, তেমনি তার একনিষ্ঠারও ভিত্তি। পরের গুণ উপলব্ধি করিয়া অতি মাত্রায় বিগলিত আর নমনীয় হইয়া পোষ মানিয়া যাওয়ায় তার ঐহিক কী ইষ্ট লাভ হইয়াছে, মনের কী মান বাড়িয়াছে, তাহা খুঁজিতে গেলে অনেক খুঁজিতে হইবে—তথাপি সারবান কিছু পাওয়া যাইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে ; তার উপর বঙ্কুর প্রাণে এতো দীপ্তি নাই যে, প্রবহমাণ বিগত অনুভূতি-পুঞ্জকে দিবারাত্র চোখের সম্মুখে ভাসাইয়া রাখিয়া তার অমৃতত্বের স্বাদগ্রহণ আর

নিগূঢ় অর্থসুখ সম্ভোগ করিবে, অথবা অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। বঙ্কু পূজারীও নহে, সাহসীও নহে।

স্ত্রীর ধমক খাইয়া বঙ্কুর মনে হইতো, এ-তৃষ্ণার সময় জল দেয়, সুতরাং ধমকে দুঃখের কী আছে?

তারপরই সে জলের কথাও ভুলিয়া যাইতো, ধমকের কথাও ভুলিয়া যাইতো, বহন করিবার মতো বিপুল বক্ষ বঙ্কুর নাই।

কিন্তু প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর কথা তার সমগ্রভাবে মনে আছে—যেমন একটি পিণ্ডাকার অদ্ভুত বস্তুর কথা মানুষের দৈবাৎ মনে থাকিতে পারে।...মনে থাকিতেই সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলো...দ্বিতীয়া গিরিজাকে বিবাহ করিয়াও যে প্রথমা গুণবতীকে ভুলিলো না...এবং না-ভুলিতেই একটি পুত্রসন্তান গিরিজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলো।

পাইয়া স্ত্রী বর্তিয়া যাইবে এমন স্বামী বঙ্কু গুঁই কদাপি নয়। তার আর্থিক অবস্থা আর দৈহিক রূপ দুই-ই অসচ্ছল—মোটেই চিত্তাকর্ষক নহে। বঙ্কু গুঁইয়ের সম্মুখীন হইয়া তটস্থ হইয়া থাকা দূরের কথা, আত্মসংবরণ করিয়া থাকিবার প্রয়োজনীয়তা আজ পর্যন্ত কেহ অনুভব করিয়াছে বলিয়া জানা নাই।

বঙ্কু নিস্তেজ—গাঢ় আস্তরণে আবৃত জ্যোতি-আধারের মতো নিস্তেজ নহে; পূর্ণায়তন অথচ শুষ্ক যে-বীজটিকে দেখিলে মনে হয়, ইহার গর্ভকোষে সে-প্রাণসত্তা নাই যাহা আপন আনন্দের বেগে অঙ্কুর-আকারে বিকশিত হইয়া উঠে—সেই বীজটির মতো সে নিস্তেজ।

বঙ্কুর জীবনযাত্রা অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা পরিব্যাপ্তিহীন মসৃণ প্রাত্যহিকতা—নিত্য নব সম্ভাবনায় তাহা চঞ্চল, উদ্‌গ্রীব, শিহরিত নহে।

বর্তমানের স্পর্শের ভিতর হইতেও বঙ্কু যেন নিজেকে গুটাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে—লোকে তা-ই তাহাকে বলে পুরাতন। বাহিরের লোকের কাছে বঙ্কু চিরকালই সেকেলে বলিয়া পরিচিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার তাড়াতাড়ি নড়িতে পারে, জিহ্বা যার কারণে-অকারণে আন্দোলিত হইতে জানে, দৃষ্টি যার ছুটিতে ভোলে না, দশজনের কাছে যার যাতায়াত আছে, ব্যসনে যে আনন্দ পায়, সে বুড়া হইলেও তার বৃদ্ধত্বের আবহাওয়া লোকে অনুভব করিতেই পারে না; কিন্তু বঙ্কুর সে স্বভাবই নয়। নিজেকে একান্তভাবে জড় করিয়া লইয়া চিরদিন সে গৃহকোণে বসিয়া কাটাইয়াছে বলিয়া চঞ্চল-বিহারী পৃথিবী তাহাকে

তাহার নিজের অচঞ্চলতার গভীরেই যেন সমাধিস্থ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। বঙ্কু বুড়া নয় তো বুড়া কে? মরা পুড়াইতেও তার স্বজাতিরা তাহাকে ডাকে না।

স্বামীর যৌবনকালের স্ত্রী ছিলো বলিয়া প্রথমা গুণবতী দ্বিতীয়া গিরিজার বুক ঈর্ষানলে দগ্ধ করিতেছে ইহা সত্য নহে। গিরিজা শুনিয়াছে, গুণবতীর স্মরণীয় যতো গুণই থাক তার রূপ ছিলো না অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত মৃগের মতো স্বামীকে নিজের রূপমণ্ডলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত করিয়া সে তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাসুরা পান করাইতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, বঙ্কুর সহিত পরিচিত হইতেই গিরিজার সন্দেহ রহিলো না যে, স্বামী কস্মিনকালে এখনকার চাইতে এক-কলা বেশি উজ্জ্বল ছিলেন—কোনোদিন ওঁর প্রাণের উল্লাস তীর অতিক্রম করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে; আর, স্ত্রী-প্রীতি ওঁর যতোই থাক, অত্যন্ত মোটা আর তৃতীয় শ্রেণীর বাস্তব জিনিশ অশন ও বসন ব্যতীত অতি অকারণ, স্পষ্ট এবং সূক্ষ্মোপভোগ্য আনন্দের মাল্যভূষণ উপহার দিতে উনি সক্ষম হইয়াছেন।

তথাপি, এ-সম্মান আর আত্মদানের গৌরব গুণবতী আর বঙ্কুকে দিতে হইবে যে, সময়ের সোপানে তাহারা সমছন্দে পা ফেলিয়া দীর্ঘদিনের সুস্বাদু সহচরী ও সহচর হিশাবে না হোক, সাহচর্যের সুই একটা জ্ঞানসহ তিলে-তিলে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছিল।

প্রৌঢ় বয়সে একটি সাত বৎসরের পুত্র এবং স্বামীকে রাখিয়া গুণবতী মারা গেলো। গুণবতী মরিবার সময় বলিয়া গেলো—'ছেলের মুখ দেখে ম'লাম, এই আমার ঢের। আশা তো ছিলোই না...'

কিন্তু বলিলো না যে, হাতে শঙ্খ আর মাথায় সিঁদুর লইয়া গেলাম—ইহাই আমার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।

গুণবতীর শ্রাদ্ধ-বাসরেই একটা গুঞ্জন শুনা গেলো...বঙ্কুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করা কর্তব্য—ইহাই সেই গুঞ্জনের উপজীব্য। না দেখিয়া বঙ্কুকে যাহারা ভুলিতে বসিয়াছিল তাহারা ভোজে বসিয়া বঙ্কুকে বঙ্কুর চোখে দেখিলো...

শ্রাদ্ধের ভোজ চলিতেছিল গুণবতীর মৃত্যুর একমাস পরে; সুতরাং শোক পুরাতন এবং নির্জীব হইয়া আসিয়াছে—অর্থাৎ দাগ থাকিলেও ক্ষত নাই—মনে করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ অম্বুজাক্ষ বলিলেন, 'ছেলেটাকে যত্ন করবার লোক রইলো না...'

কথাটায় গভীরতা কিছুই নাই। তবু কথাটা বলিয়া আর কে কী বলে শুনিবার জন্য অম্বুজাক্ষ মনোযোগী হইলেন…

মহেশ বলিলো, 'বন্ধু তো ঐ! নিজেকেই ভুলে আছে…ছেলের কথা তো ছেলের মায়ের সঙ্গেই চুকে গেছে।'

মহেশের এই কথায় মাতৃহীন সন্তানের অসহায় অবস্থাটা খুবই নির্দয় আর স্বচ্ছ হইয়া আসিলো।

মাধব বলিলো, 'হ'লেই হ'লো…মেয়ে তো আমিই তিনটে দিতে পারি।' বলিয়া ঢোঁক গিলিবার জন্য এক মুহূর্ত নিঃশব্দ হইয়া মাধব পুনরায় বলিলো,—'এক সারিতে সাজিয়ে এনে।'

বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব নাই; একটির দরকার হইলে তিনটি, অর্থাৎ বাহুল্যভাবেই তাহাদের পাওয়া যাইতে পারে এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া বন্ধুর পুত্রের হিতৈষীগণ পুলকিত হইয়া লুচির সঙ্গে প্রচুর হাস্য করিলেন…

কিন্তু বন্ধু গুণবতীকে ভুলিতে পারেন নাই—সকাতরে বলিলো, 'আমাকে আপনারা ঐ আদেশটা করবেন না।'

অনুনয়ে নম্র কিন্তু বিরুদ্ধ উক্তি শুনিয়া অম্বুজাক্ষের কণ্ঠ অধিকতর সজীব হইয়া উঠিলো; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন করবে না?…স্বর্গীয়া তোমার কেমন স্ত্রী ছিলো তা আমরা জানি—চাবি হারিয়ে গেলে মানুষ আবার চাবি আনে, না বাক্সো ফেলে দেয়? কী করে? ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে না?'

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধু পরাস্ত হইয়া গেলো—

'ঐ তো বিপদ!' বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিলো।—

মাধব বলিলো, 'অমন বিপদে পড়ার কী দরকার? ছেলের একটা মা চাই-ই, চাইনে?' বলিয়া একেবারে বন্ধুর চোখের উপর দৃষ্টি ফেলিলো—

এ দৃষ্টির অর্থ—নির্বোধ, তুমি ধ্বংসের দিকে চলিয়াছ; এখনও সাবধান হও, নতুবা—

বন্ধু থতোমতো খাইয়া গেলো—

মাথা চুলকাইয়া বলিলো—'দেখতে গেলে চাই বই কি, কিন্তু মনে যে ভাবতে পারিনে।'

অম্বুজাক্ষ বলিলেন, 'পাগল…'

মহেশ বলিলো, 'অবাক করলে!…শোককে আগলে ব'সে নিজের কথা ভাববার দায় তোমার এখন তেমন নাই; কিন্তু ছেলের কথা তোমাকে ভাবতেই হবে…তাকে তো মেরে ফেলতে পারো না!'

শুনিয়া বন্ধু শিহরিয়া উঠিলো !

আত্মরঞ্জনের অর্থাৎ স্ত্রীর স্মৃতিপূজা নিরর্থক বলিয়া হাস্যকর উদ্দেশ্যে পুত্র সংরক্ষণের কৃচ্ছ্রতা ভোগে অর্থাৎ বিবাহে অনিচ্ছার দরুন বন্ধু ভর্ৎসিত হইয়া মাথা নামাইয়া রহিলো···

তারপর ভোজন করিতে-করিতে ওঁদের অনেক কথাই হইলো···

মানবজাতির যেন আদৌ বংশধর নাই, সব লোপ পাইয়াছে, এমনি একটা দুস্তর ও দুঃসহ ঘটনা অকারণেই কল্পনা করিয়া লইয়া নির্বংশ হইবার নানা কারণ, নানা ফল, মানুষের নানা দুর্গতির আলোচনা হইলো···পিণ্ডলোপের বীভৎসতা, তিল-জলের অভাবে পরলোকগত তৃষিত আত্মার হাহাকার, তাঁহারা এমন নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিলেন যেন ঐসব তাঁহারা জীবন্ত আলোকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন·· পূর্বপুরুষকে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ঘৃণাক্ষরেও বঞ্চিত করিলে কতো জন্ম নরকস্থ হইয়া থাকিতে হয় তাহাও নির্ণীত হইলো···

যাহারা এ-সব তত্ত্ব জানিতো না তাহারা বিশেষভাবে অবগত এবং অবাক হইলো···যাহারা জানিতো তাহারা আরও নিঃসন্দেহ হইয়া গেলো—

এবং সকলে মিলিয়া করুণ নেত্রে তাকাইয়া রহিলো বন্ধুর দিকে—যেন, পিণ্ডদাতা যাহাদের নাই বন্ধু তাহাদের সকলের প্রতিনিধি···পরলোকের কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া উঁহাদের কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে···তাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ উঁহাদের খুবই আছে, কিন্তু ক্ষমতায় বোধহয় কুলাইবে না···

ঐ সংশয়গ্রস্ত অবস্থায় উঁহারা ভোজন শেষ করিয়া উঠিলেন···ক্রমশ প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু ক্ষীণমস্তিষ্ক আর দুর্বলচিত্ত বন্ধুর সম্মুখে জাগিয়া রহিলো, যেমন করিয়া জাগে আলোকশূন্য শব্দশূন্য একটা রাত্রি, তেমনি ভীষণ পুত্রশূন্য একটা পৃথিবী···

যত্ন না পাইয়া, জলের অভাবে শিশু-বৃক্ষটির মতো, পুত্র শুকাইয়া মরিয়াছে···

সুতরাং দশজনের কথায় আর পুত্রের পালনার্থে বন্ধু পুনরায় বিবাহ করিলো—মাধব সারি দিয়া সাজানো যে তিনটি মেয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদেরই একটিকে।

অল্পদিনেই দেখা গেলো, গিরিজা অসামান্য একটা সপ্রতিভতা, আর আত্মপ্রকাশের বাঞ্ছা ও উদ্যম লইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।···বৃদ্ধের দ্বিতীয়,

পক্ষের স্ত্রী পিছাইয়া থাকিবার দিকেই একটা ধিক্ ধিক্ আকর্ষণ বোধহয় থাকে ; কিন্তু গিরিজা সোজা সম্মুখের দিকে সটান আগাইয়া গেলো। চোখ ঝলশানো রূপ তারও নাই, চমক-লাগানো বুদ্ধিও তার পরিস্ফুট হইলো না, কিন্তু দেখা গেলো জলের গতি যে মাঝি চেনে তাহারই মতো সে অনায়াসকুশলী—প্রবীণা গৃহিণীর মতো গাম্ভীর্যের সহিত সে বাড়ি-ঘরের চেহারা ফিরাইয়া পরের চোখে না পড়িয়া পারে না এমনি ঝকমকে করিয়া তুলিলো—শুধু ঝাঁটার জোরে নহে, গৃহস্থালি গুছাইয়া তুলিতে ব্যবহারে যে সংযম আর পরার্থপরতার প্রয়োজন তাহাও তাহার আছে বলিয়া স্বীকৃত হইলো। যার চোখে কিছু এড়ায় না এবং যার কিছুই নিখুঁত মনে হয় না শ্রীপতির সেই দুর্জয় মা-ও বলিলো : 'মেয়ের শিক্ষে ভালো।'

বুঝাই গেলো না, নিজের যৌবনকে সে ধিক্কৃত করে কিনা, মন তার অদৃষ্টকে গালি পাড়ে কিনা···কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠিলো সুন্দর এই সত্যটাই যে, যৌবনের উত্তাপে বিব্রত বোধ করিয়া নিজের সর্বনাশকে আহ্বান করিবার রুচি তাহার নাই। গিরিজা যথার্থ ভদ্র বধু।

নন্দ মা বলিয়া ডাকে—তাহাতে গিরিজা গদগদ হয় না, আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানও করে না, অর্থাৎ সে স্বাভাবিক।

কিন্তু তাহার মনে হয়, স্বামী যেন নিজেকে অত্যন্ত অন্তরালে রাখিয়া তাহাকে আর তাহার সপত্নী-পুত্র নন্দকে এক ঠাঁই করিয়া একটা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন···

দেখিয়া-দেখিয়া গিরিজা একদিন বলিলো—'আমার সতিনের ছেলের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন তা গোপনে লক্ষ করবার দরকার নেই। আমাকে বাদ দিয়ে ছেলের আচরণেই তা স্পষ্ট টের পাবে···আর, পাড়ার লোককে ব'লে দিও, ছেলেকে ডেকে পরামর্শ দেয়ার চাইতে চুপ ক'রে দেখে যাওয়াটাই ভালো। তোমরা ষড়যন্ত্র ক'রে ছেলেকে পর ক'রে দিও না—তাহ'লেই যথেষ্ট হবে···তার পরের ভার আমার উপর। মোটামুটি দেখে যাও।'

আদেশ শুনিয়া বঙ্কু কুঁকড়াইয়া গেলো।···চোখ দুটি তাহার বারকতক পিটপিট করিলো···মনে হইলো, অন্যায় হইয়াছে···তারপর তাহার মনে হইলো, টকটা বেশ রাঁধে···ভাতে রুচি হইতেছে।

পাড়ার মেয়েরা তাহাকে অবিরাম চোখ-কান খোলা রাখিতে বলিয়া দিয়াছে—ছেলেকে তাহার মামার বাড়িতে চালান করিয়া দিবার পরামর্শও কেহ কেহ দিয়াছিল—

শুনিয়া বঙ্কুর মনে হইয়াছিল, এ কেমন হইলো! বিবাহ না করিলে এক বিপদ, করিলে অন্য বিপদ। কিন্তু বঙ্কু মুখে বলিয়াছিল, 'দেখি কিছুদিন।' কিন্তু

সেই কিছুদিনের দু-একদিন না-যাইতেই তাহার দেখা ধরা পড়িয়া গেলো—বন্ধু চোখ ফিরাইল।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মানুষ একটু বাড়াবাড়ি আদরে রাখিতে চায় বলিয়া হাসির সঙ্গে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে—কিন্তু সে-আদর বোধহয় অনুশোচনার কণ্টকোৎপাটন—প্রথমার প্রতি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একদা যে-অনাদর দেখানো হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে, তাহারই বেদনা ক্ষয় করিবার আগ্রহ এটা। কিন্তু বন্ধুর স্বকৃত এমন কোনো ঘটনার কথাই মনে পড়ে না যাহার আঘাতে গুণবতী ব্যথা পাইয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে। বন্ধুর। আদরে বাড়াবাড়ি নাই। এই অকপটতায় গিরিজা সুখী হয়—কিন্তু সহ্য হয় না তাহার যাহাদের স্বামী বৃদ্ধ নয়—তাহাদের আকাশে ভরা গল্পগুলি। তাহারা যেন বলিতে চায়, যে-সুখের তৃষ্ণায় পৃথিবীর অপরাপর মানুষ ছটফট করিতে চোখ উল্টাইয়া হিক্কা তুলিয়া মরিতেছে, সেই সুখের নাগাল, এই দেখো, আমরা পাইয়াছি। তাহাদের রসনার তীব্র উল্লাস আর চোখের উচ্ছল ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, আনন্দ যেন ফোয়ারার মতো সাত রঙের বিজলী খেলাইয়া ঝলকে-ঝলকে বাহির হইতেছে…বুকে সাগর থই থই করিতেছে…কোথাও তাহার কূল নাই, কোথাও কঠিন দ্বীপ-মৃত্তিকা চোখে পড়িয়া রসভঙ্গ ঘটিতেছে না—কেবলই একটা একটানা গাঢ়ছন্দ উন্মত্ত কলরোল ধ্বনিত হইতেছে…এই আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরাও যেন সুখের।

কিন্তু গিরিজার মনে হয়, কেথায় যেন ইহারা একটা শুভ সুষ্ঠু নীতিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে…কেবল শান্ত বন্ধনবোধই যার একমাত্র স্বাদ তাহাকেই ফেনাইয়া তুলিয়া যেন ইহারা সুরার মতো একটা উগ্র অস্বাস্থ্যকর আর উত্তেজক রসায়নে পরিণত করিয়া লইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া চক্ষু, রক্ত আর অঙ্গকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে…পরিপূর্ণতার মূর্তি ইহা নহে, ইহা স্ফীতি, অতিরিক্ততা; প্রদাহকে ইহারা সুখ মনে করিতেছে।…অন্তরঙ্গভাবে পরস্পর মিশিয়া যাওয়াই কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনের চরম সার্থকতা নহে? তাহার অতিরিক্ত যাহা তাহা কি বন্যার বাড়তি জলের মতো অকল্যাণকর নহে? একদিন…

কিন্তু সে-কথা না বলাই ভালো—অভিসম্পাতের মতো শুনায়। তথাপি সেই কথাগুলিই গিরিজা না ভাবিয়া পারে না…ভাবিতে-ভাবিতেই ভাবনাকে চাপা দিবার জন্য এক সময় সে চমকিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠে।

স্বামী বৃদ্ধ, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? নেশার ঘোরে দিবা-স্বপ্ন দেখিয়া

যাহারা মনে করে, ইহাই সত্য, ইহাই সুখ, ইহাই শেষ আর ইহাই সার্থকতা, তাহারা কৃপার পাত্র। অপরাহ্নের সূর্য কি সূর্য নয়?…কিশোরী রাধিকা কেবল প্রেমিকা; কিন্তু উমা শিবানী—তপস্যার দ্বারা তিনি মহেশ্বরী। কে বড়ো? বড়ো শিবানীই—তাঁহাকে বুঝিতে হাত ঘুরাইয়া নাক দেখাইতে হয় না, অর্থাৎ তিনি অতি সরল নির্বিকার নির্মল ভক্তি-সাধনাতেই চিরমধুর হইরা বিরাজ করিতেছেন। ভাবিয়া গিরিজা সন্তুষ্ট হয়।

নন্দ জিজ্ঞাসা করে, 'মা, আমার সে মা তো ম'রে গেছে—আর আসবে না বুঝি?'

গিরিজা বলে, 'আমিই তো এসেছি তোর মা হ'য়ে। আমি তোর সেই মা-ই।'

নন্দ তাহার মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া কী যেন অনুসন্ধান করে… তারপর কী বুঝিয়া সে চুপ করিয়া থাকে তাহা বুঝা যায় না; কিন্তু গিরিজার বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে।

ওদিকে, বঙ্কু স্ত্রীকে সুখেই রাখিয়াছে বলিতে হইবে, গরমিল ঘটাইবার লোক সে নয়—সে সাহসই তাহার নাই; নন্দকে প্রহরা দিয়া রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা অকারণ বুঝিয়া সে ত্যাগ করিয়াছে।

নন্দ বলিতে দু-জনাই অজ্ঞান—

এমন সময় গিরিজা গর্ভবতী হইলো…তাহার একটি পুত্র জন্মিলো এবং পুত্র জন্মিতেই অশেষ আরামের সঙ্গে দেখা গেলো যে, বঙ্কুর সঙ্গে তাহার বয়সের পার্থক্যটা লোকের সম্মুখ হইতে আপনিই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পুত্রের জনক আর জননী তাহারা—দুটি নদীর একত্র মিশ্রণের মতো এই স্বাভাবিক সংযোগে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিসাবি কলম বয়সের বাঁধ বাঁধিতে কেন আসিবে?…পড়শিরা গুণবতীকে ডাকিতো নন্দর মা বলিয়া, গিরিজাকে ডাকিতে লাগিলো চন্দরের মা বলিয়া—অর্থাৎ এই সংসারের চক্ষুতে গুণবতী চক্ষুতে যে-স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলো, চন্দরের মাকেও তাহারা পুনরায় সেই আসনেই নির্বিবাদে বসাইয়া দিয়াছে, সুতরাং বয়সের হিসাব এখন কেবল অবান্তর নহে, অশুভ ক্রূর ভাষণ। যে মা হইয়াছে তাহার পরিচয় কেবল মা—স্ত্রীর দেহ তখন, স্বর্গ আর মর্তের তুলনায় মর্তের মতো, নিম্নতর স্তরের জিনিশ; স্বামীর সঙ্গ-চিন্তা তখন কেন্দ্রচ্যুত, পতনশীল।

নন্দ চন্দরের অত্যন্ত অনুগত বাহন—

বঙ্কু বলে, 'ছেলেটাকে মারবে টেনে-টেনে—প্রাণ বা'র ক'রে দিলে।... ওগো, দেখে যাও কী করছে।'

নন্দ তখন চন্দরকে কাঁধে তুলিতে অক্ষম হইয়া তাহার ডানা দুখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে হাঁটু বরাবর ঝুলাইয়া ধরিয়াছে, আর উপরের দিকে প্রাণপণে টানিতেছে···

বঙ্কুর ডাকে গিরিজা দৌড়াইয়া আসিয়া দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগলো··· বলিলো, 'তুমি উঠে এসে একটু সাহায্য করতে পারলে না! ছেলেটা ঘেমে হাঁপিয়ে উঠেছে।' বলিয়া চন্দরকে নন্দর কাঁধে তুলিয়া দিয়া জুৎ করিয়া বসাইয়া দিলো; তারপর নন্দর মুখের আর গায়ের ঘাম আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলো।

নন্দ বলিলো, 'এইবার হয়েছে।' বলিয়া সে চন্দরের কোমর বাঁ হাত দিয়া বেড়িয়া বাগাইয়া ধরিলো···

বঙ্কু বলে, 'ওটাও তেমনি! অতো টানাটানিতেও কান্না নেই!—ওরে,··· ঘুরিস্‌নে অমন ক'রে···ওটার ভারে তুই পড়বি ট'লে, আর ও দেবে বমি ক'রে।'

তিনবার পাক খাইবার পর নন্দ বাপের ঐ হৈ-হৈ নিষেধে দাঁড়াইল···চন্দর তখন হাসিতেছে···

গিরিজা তাকাইয়া-তাকাইয়া তাহা দেখিতে লাগিলো।

বঙ্কু তাকাইয়া-তাকাইয়া তাহা দেখিতে লাগিলো।

চন্দর এখন ছয় বছরের। শৈশবে সে অত্যন্ত মোটা ছিলো—এখন তাহার একহারা চেহারা দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছে।

ইতিমধ্যে গিরিজার একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া সূতিকাগারেই মারা গিয়াছে···আর হয় নাই।

বঙ্কুর শরীর আরো খারাপ হইয়া গিয়াছে; তাহার দেহের চর্ম লোল হইয়া আসিতেছে—তাহা তাকাইলেই চোখে পড়ে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকার হয় না; গাল আরো চুপশিয়া গিয়াছে; দাঁত আরও কয়েকটি পড়িয়া গিয়াছে; নিদ্রার প্রভাব দুর্বল হইয়া আসিতেছে; মাথাটা ঝুঁকিয়া থাকে···

কিন্তু বঙ্কু অন্তরে সুখী—গিরিজার গুণে আর সেবায় সে সুখী; নন্দ আর চন্দরের সমান যত্ন হইতেছে দেখিয়া সে সুখী; দেহের সামর্থ্যগত আর কামনাগত অনৈক্য যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে আবিল করিতে পারে এ চিন্তা তাহার মনে

কখনও জাগে নাই বলিয়া সে সুখী। গিরিজা নিজেই তা স্বীকার করে না— অপরকে জানিতে দিবে কি!

বঙ্কুর মাঝে-মাঝে অসুখ করে—শরীরের উত্তাপ একটু বৃদ্ধি পায়, বোধহয় জ্বরই হয়—পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় কোমর আর হাত-পায়ের অস্থিসন্ধিগুলি কন্‌কন্‌ করে…

তার সেইটুকু অসুস্থতা দূর করিতে কবিরাজ মহাশয় একদিন অন্তর একদিন বৈকালে একমাত্রা মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিয়াছে—

বৈকালে খলে মকরধ্বজ মাড়িয়া লইয়া গিরিজা তাহার বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল—

বঙ্কু শুইয়া ছিলো, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলো…চাহিয়া তাহার মনে হইলো, স্ত্রীর মুখাবয়ব যেন ভালো করিয়া চোখে পড়িতেছে না।…বেলাশেষের স্তিমিত আলোক ঘরের ভিতর আরও স্বল্পজ্যোতিঃ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর মুখাবয়ব ভালো করিয়া চোখে না পড়িবার কারণ তাহা নহে—

বঙ্কুর মনে হইলো, তাহার চোখের সামনে যেন দ্রুত-কম্পনশীল একটা বাষ্পীয় যবনিকা রহিয়াছে…নিম্নের বায়ুর ভিতর হইতে তরঙ্গে তরঙ্গে উত্থিত হইয়া তাহা ঊর্ধ্বের বায়ুর ভিতর মিলাইয়া যাইতেছে…

তাহার আর গিরিজার মাঝখানে ঐ তরল অস্বচ্ছতা হঠাৎ দুস্তর মনে হইয়া বঙ্কুর যেন অসহ্য হইয়া উঠিলো…তাড়াতাড়ি চোখের উপর আঙুল বুলাইয়া সে উঠিয়া বসিলো, হাত বাড়াইয়া বলিলো, 'ওষুদ এনেছো? দাও।' বলিয়া আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলো—এবার মুখ তার স্পষ্ট দেখা গেলো…

মুখে সুন্দর একটি কলরবহীন নিরুত্তেজক শান্তশ্রী—এই আসন্ন সন্ধ্যার বর্ণ নয়, তার প্রতিবিম্বিত আভার ম্লানিমা যেন সেখানে ফুটিয়া আছে…

নিবিড় সেবায় অক্লান্ত হাতখানি বাড়াইয়া গিরিজা ঔষধের খল তাহার দিকে আগাইয়া ধরিলো…বঙ্কুর ইচ্ছা হইলো, সেই হাতখানাকে দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতের উপরেই ঢলিয়া পড়িয়া আর অশ্রু ঢালিয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে—

কিন্তু তাহা সে করিলো না—

মনে-মনে বলিলো: 'ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং'—বলিয়া হাত বাড়াইয়া খল হইতে মধু-মিশ্রিত মকরধ্বজ চাটিয়া-চাটিয়া খাইতে লাগিলো…

বঙ্কু খল হাতে ধরিয়াই আছে এমন সময় বাহিরে রাস্তায় একাধিক তীব্র কণ্ঠস্বর শুনা গেলো…ছেলেরা ঝগড়া করিতেছে।

স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলো, 'চন্দর কোথায়?'

গিরিজা বললো, 'খেলতে বেরিয়েছে।'

'ঝগড়ার মধ্যে সে নেই তো?'

ছিলো, কারণ বঙ্কুর মুখের কথা শেষ হইতেই উহাদের কানে আসিলো একটি ছেলে বলিতেছে, — চন্দর না হন্দর…

শুনিয়া অন্যান্য বালকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলো…ওরা স্বামী-স্ত্রী উদ্‌গ্রীব হইলো…

বঙ্কু বিছানাতে বসিয়াই ডাকিলো, 'চন্দর…'

কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠের সে ডাক কেবল চন্দরের মা গিরিজার কান পর্যন্ত গেলো…

তখনই সেই ছেলেটি আবার বলিলো, 'দেমাক দেখো! বুড়োর বেটা। চন্দর তার বাবার নাতি, জানিস্ তোরা?'

ছেলেগুলি আবার হাসিয়া উঠিলো…তারপর আরও কী কী বলিতে-বলিতে বালকের দল দূরে চলিয়া গেলো…

চন্দর ঘরে ঢুকিলো —

বঙ্কু তখন চোখ নামাইয়া রহিয়াছে —

গিরিজার চোখ জ্বালা করিতেছে —

বঙ্কু তখন কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীর্ণতার সঙ্গে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে…গিরিজা তার দ্বাবিংশতি বর্ষের একটি অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘুরপাক খাইতেছে…

## হাড়

এটাও হত্যা —

আহার্যে বিষ মিশাইয়া নয়, গলায় ছুরি দিয়া নয়—

আইনে তার সাজা নাই—

তবু এটা হত্যাই।

স্বাভাবিক মৃত্যু, তবু এ মরায় আর স্বাভাবিক মরায় যে কত প্রভেদ, তাহা যে মরে, সেই কেবল জানে। লোকে চোখে দেখে কেবল বাহ্যিক দেহটা, প্রাণহীন। কিন্তু নেপথ্যে তার কি ঘটিয়া আছে তাহার খোঁজ কেউ রাখে না…

লোকে মন-বুঝানো ভারি ভারি কথা কয় —

রক্ষাও মরিলো।

কেন মরিলো তাহার খোঁজ-খবর কেহ রাখিলো না, তবে তাহার এই মৃত্যুটা কারো কারো মনের কোমলতায় একটা ঘা দিয়া গেল।

রাগ করিলো সবাই —

কারো মুখ ফুটিলো, কারো ফুটিলো না।

যাদের ফুটিলো তাদের মধ্যে রসি একজন।

রক্ষা রসিকে মাসি বলিতো। রসি রক্ষা দাসীকে রক্ষাকবচ দিতে পারে নাই, কিন্তু দুঃখে কাঁদিতো।

রক্ষার স্বামী সনাতন লোক ভালো নয়।

···সনাতন একদা কাপড়ের দোকানে কিনিতে যাইয়া বাছাই করিতে-করিতে ন-গজি একখানা ধুতি চুরি করিয়া মার যা' খাইয়াছিল তাহা ঢের···পরপর তিনমাস জেলও খাটিয়াছিল।

সনাতন বেপরোয়া —

তোয়াক্কা কারুর রাখে না —

দুনিয়ার লোকের মুখের সামনে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া বেড়ায় —

তার কটু-কর্কশ কথায়, দম্ভে-দাপটে লোকে অস্থির।

কথায়-কথায় সে লাঠি লইয়া তাড়িয়া আসে; লাঠি পড়িবার আগেই লোকে পালাইতে পারে; কিন্তু তার গলার আওয়াজ আর গালের ভাষা এমন উচ্চ এবং কু, যে কানে আঙুল দিলে কেবল তার প্রতিধ্বনিটা নিবারিত হয়।···প্রতিবেশীর ছাগল-খাসি তার চারাগাছে মুখ দিতে না দিতে একবার ব্যা করিয়াই আর নড়ে নাই এসব দৃষ্টান্ত বহু আছে।

এই সনাতন — রক্ষার স্বামী।

কিন্তু ছ-বছরের একটি ছেলে রাখিয়া রক্ষা মরিয়া গেল।···শুধু আয়ুঃশেষ হইয়া যায় বলিয়াই মানুষ মরে এমন নয়; আয়ু থাকিতেও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাটার যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও মানুষ মরে। রক্ষার ঘটিয়াছিল তাই — সনাতনের অত্যাচারে তার বাঁচিবার সাধ ফুরাইয়া গিয়াছিল।···দেহখানা তারপরে দিন দিন শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইয়া একদিন বাহিরের বায়ু, ভিতরে প্রবেশ করিতে একেবারেই চাহিলো না। তখন কাছে ছিলো রসি।

রক্ষা বলিয়া গেল—'মাসি, দেখো মথুরকে; যেন বাপের মতো না হয়।'—

রসি ভাবিয়াছিল, মথুরকে কাছে লইয়া মানুষ করিবে। কিন্তু তাহাতে ছেলের বাপের অনুমতি চাই।…তাই সনাতনের ভ্রূকুটিকুটিল মুখের দিকে চাহিয়া অনেক স্বস্তিবচন আত্মীয়তা ভূমিকার পর রসি একদিন কথাটা পাড়িতেই সনাতন দস্তুরমতো লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলো না বটে, কিন্তু তাই করাই ছিলো ভালো।—

সনাতন রসির সম্মুখেই তাহার স্বার্থ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব অন্যায় কথা বলিয়া গেল যার ওজন লাঠির চেয়ে ঢের বেশি।… শেষে বলিলো, মাগি ডাইনি।

মাগি শব্দটা গাল—

ডাইনি শব্দটাও গাল, উপরন্তু নারীর মাতৃ-হৃদয়কে অপমান !

কিন্তু রসি কাঁদিলো না—

তার বুকের ভিতর যেন আগুন ধরিয়া গেলো।—

কথাটা শুনিতে ভালো নয়—

কিন্তু কেন যেন রটিয়া গেছে, রসি মন্ত্রতন্ত্র 'গুণজ্ঞান' জানে ; লোকের সে মন্দ করিতে পারে , তাহাকে 'ঘাঁটানো' দুঃসাহসের কাজ, বিপদসঙ্কুল তো বটেই।—

কথাটা যে বিশ্বাস করে না সেও রসিকে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলে ; যে বিশ্বাস করে সে ভূত-প্রেত যক্ষ-রক্ষ দৈত্য-দানব-পিশাচ, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি জ্ঞাত-অজ্ঞাত অনেক বিভীষিকা রসির সঙ্গে জড়াইয়া তাহাকে এমন ভয়ের চক্ষে দেখে যে ভগবানকে তাহার বিরুদ্ধে অক্ষম নাচার বলিয়া মনে হয়।…মাত্র একটি শিকড়ের ছোঁয়া দিয়া রসি যে-কোনো মানুষকে যে-কোনো জন্তুতে পরিণত করিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই সাড়ে তিন হাত লম্বা রসি হাত বাড়াইয়া তাল গাছের মাথা ছুঁইতে পারে ; কবর খুঁড়িয়া মড়ার মাংস সে চিবাইয়া খায় ; অসংখ্য মড়ার মাথা তার ঘরের মেঝেয় পোঁতা আছে…ইত্যাদি।

তিনটি বিল্বপত্র, তিনটি কড়ি, একটুখানি সিঁদুর, আর তিনটি শিকড়—এই সামান্য কয়টি বস্তুর রসি যাহা ঘটাইতে পারে বলিয়া খ্যাত তাহা অসামান্য—একসঙ্গে দেশের ঘর জ্বলিয়া উঠিতে পারে—

খেতের যাবতীয় পাকা ধানের ভিতরকার শাঁস অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে—

মানুষের পা হইতে মাথা পর্যন্ত অসহ্য চুলকানিতে ভরিয়া উঠিতে পারে—

ওলা দেবী কি মা শীতলা তো যখন-তখন দেখা দিতে পারেন।…তার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নাই, শাস্ত্রের সজীব মন্ত্র একেবারে নিরুপায় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবাক্য

একেবারে নিষ্ফল, রক্ষাকালীও সরিয়া দাঁড়ান।

ইহাদের উপর যদি পুং-শকুনের বিষ্ঠা আর স্ত্রী-ভেকের লালা পাওয়া যায় তবে তো—

কাজেই রসিকে সনাতন অপমান করিয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোক কাঁপিয়া উঠিলো—

না জানি কী ঘটে।

সনাতন অপ্রিয় ছিলো, এখন লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলো। গ্রামের সকলেরই চালা ঘর, সকলেরই ছেলেপিলের ঘর।··· বাগে পায় তো সনাতনের তলপেটে শড়কি ফুঁড়িয়া দেয় এম্নি লোকের মনের বাতিক।···

যাই হোক, আরামের কথা এই যে, উৎকণ্ঠা কণ্ঠের কাঁটার মতো অসহ্য হইলেও, দিন পনেরো পার হইয়া গেল, কিন্তু আপামর কাহারও অমঙ্গল ঘটিলো না!—

একটি ছাড়া —

সেটাও রসির মন্ত্রবলে কি মানুষের আহাম্মকিতে তাহাও বিবেচনার বিষয়।

দাশুর পুত্রবধূ মানী লোক ভালো, কেবল ভয়-কাতুরে; ভয় পাইলে তার জ্ঞান থাকে না। --মানী একদিন পুকুরঘাটে যাইয়াই দড়বড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দড়াম করিয়া উঠানে অজ্ঞান হইয়া গেল।·· দাশু তার মুখের ভিতর আঙুল দিয়া দেখিলো, দাঁত লাগিয়া গেছে—কেহ বলিলো, হাঁচাও নাকের ভিতর কাঠি দিয়ে।

কেহ বলিলো, কোঁকে শুড়শুড়ি দাও।

কিন্তু দাশুর স্ত্রী আনিয়া দিলো দাশুর হাতে জাঁতি—এবং জাঁতি দিয়া চাড় দিতেই দাঁত ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু একটা দাঁতের এক টুকরো ভাঙিয়া পড়িলো।

মিরগি না হিস্তিরি?

তা কিছু নয়—

মূর্ছা ভাঙিয়া মানী বলিলো—বাঁশের ঝাড়ে কে পা ঝুলিয়ে ব'সে রয়েছে, বাবা গো! শাদাপারা! জল দাও, জল খাবো।—বলিয়া মানী কাঁপিতে লাগিলো; এবং জ্বর আসিতে বিলম্ব হইলো না।

কিন্তু দেখা গেল, বাঁশের ঝাড়ে পা ঝুলাইয়া কেহ বসিয়া নাই; ছেলেদের

একখানা ঘুড়ি সুতা ছিঁড়িয়া আসিয়া বাঁশের ঝাড়ে লট্‌কিয়া আছে। শাদা কাগজের ঘুড়িখানা ঠিক মানুষের মতো না দেখাক, আঁধারি জ্যোৎস্নায় ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়।···

মানীর ঐ দাঁত ভাঙা ছাড়া আরো একটি অনিষ্ট হইলো। সে পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিলো ; ভয় পাওয়ার দুদিন পরেই গর্ভ নষ্ট হইয়া গেলো।···রসির সঙ্গে এই ঘটনার সংস্রব এইখানে যে, ঘটনার ঠিক পূর্বদিনে রসি মানীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল, যাহা পরম্পর শুনা যাইতেছে তাহা যথার্থ কিনা, এবং যথার্থ যদি হয়, তবে ক' মাস ?

গ্রামের অন্তঃপুরে এবং অন্তঃপুরের বাহিরেও ফিশফিশ চলিতে লাগিলো— রসিই খেয়েছে ওর ঐ পেটের ছেলেটাকে।

রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো।·· ইহজন্মে রসিককে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই···কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই··· তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত—

তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে—

এ যে বড়ো লোভের জিনিশ···

কিন্তু গুজব শুনিয়া সনাতন দ্বিতীয়বার রাগিয়া আগুন হইয়া গেল।

গর্ভের সন্তান যে বাহির করিয়া খায় সেই রাক্ষসী চায় তার ছেলেকে !··· সে কথা না হয় না ধরা গেল ; দুপুরের মাঠে তাহার জন্য জল-ভাত বহন করিবে কে ঐ ছেলেটি ছাড়া !···

মনে মনে অতিশয় কটু হইয়া ঐ কথাটাই তোলাপাড়া করিতে-করিতে সনাতন পথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তার সম্মুখেই পড়িয়া গেল সেই রসিই।

সনাতন আগে বাহির করিলো দাঁত ; তারপর বলিলো—আঁটকুড়ি, ডাইনি !

দুই জনে চোখাচোখি হইয়া দাঁড়াইল—

সনাতন বলিতে লাগিলো—আমার ছেলের কথা ফের যদি তোর মুখে শুনি, বুড়ি, তবে তোর মুখে দেবো গোবর গুঁজে। বলিয়া থু থু করিয়া খানিকটা থুথু মাটিতে ফেলিলো।

রসি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলো।—

তার হাড় পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিলো।

সনাতন তার মুখের সামনে এক জোড়া বুড়ো আঙুল নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিতে লাগিলো, – তোকে আমি ভয় করবো ভেবেছিস্? ·· তোকে আমি পাঁকে পুঁতে না মারি তো আমি··

এদিকে রসি, ওদিকে সনাতন –

উভয়েই ভয়ঙ্কর।

কাজেই কাহাকেও না চটাইয়া যদি সালিশে কাজ হাঁসিল হয় তবে সে-ই উত্তম।·· আইন সনাতনের অনুকূলে , মা অভাবে জন্মদাতাই ছেলের মালিক ; সে যদি ছেলেকে নিজের কাছে রাখিতে চায়, তাহাতে কারো কিছু বলিবার নাই।

আবার এদিকে রসি—

হাতে তেমন জোর নাই, মুখেও দম্ভ নাই , কিন্তু মনের জোর বেজায়।···সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

সংঘর্ষ এই দুটিতে।

সনাতনের দেহে চুলকানিতে ভরিয়া উঠে নাই বা তার ঘর জ্বলিয়া ওঠে নাই—কেবল সে মথুরের বাপ বলিয়া।

কিন্তু গ্রামের লোক নির্ভাবনায় কোনো পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া দুর্ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিলো।

দুদিকই বজায় থাকে ইহারই একটা উপায় চিন্তা করিতে করিতে চট করিয়া চাটুজ্যে মহাশয়ের একটা বুদ্ধি খুলিয়া গেল। বলিলেন,—এক কাজ করা যাক। বলিয়া উভয় সঙ্কট উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যে মধ্য-পথটা তিনি দেখাইয়া দিলেন তাহা পরিষ্কার চোখে পড়িলেও আপত্তি তুলিলেন নিস্তারণদা। বলিলেন,—সেটা হ'তে পারে বটে, কথাটা অনেক আগেই আমাদের মনে পড়া উচিত ছিলো ; কিন্তু—

তারপর বোধহয় আরো সহজ একটা পথ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তাই ব'লে দেখো।

তখনই সনাতনকে ডাকা হইল।

চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন, সনাতন, তোর ছেলেকে তার মাসির কাছে পাঠিয়ে দে। আমার আশীর্বাদে সেখানে সে থাকবে ভালো।

শুনিয়া সনাতন, বুড়ো আঙুল নয়, মাথা নাড়িতে লাগিলো। বলিলো, তা হয় না, ঠাকুর।

—কেন হয় না?

—তারা বড়ো গরিব, তাছাড়া ছেলেকে দিয়ে আমার কাজ আছে। বলিয়া সনাতন চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে সুস্থ দেহে শ্রীবৃদ্ধি হইবে—এই কথাটা ভালো করিয়া কানে তুলিলো না প্রথম এই সনাতন; এবং ব্রাহ্মণের আদেশ অবহেলিত হইল গ্রামে এই প্রথম।

রসির সঙ্গে দেখা হইলেই সনাতন মিছিমিছি থুথু করিয়া থুথু ফেলে; বলে—আঁটকুড়ি ডাইনি, তুই মরবি কবে?

রসি চুপ করিয়া থাকে।

এমনি করিয়া সনাতনের পক্ষ হইতে প্রাণপণ আক্রোশ প্রকাশ, এবং রসির পক্ষ হইতে প্রাণপণ ধৈর্য রক্ষা চলিতে চলিতে একদিন রসির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলো।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

হাতে কোঁচ, রসি, বৈঠা লইয়া সনাতন মাছ মারিতে চলিয়াছে; সঙ্গে নৌকা ঠেলিবার লগি লইয়া ভুবন।

পথে রসির সঙ্গে তাহাদের দেখা হইয়া গেল।

বুড়ি তুরতুর করিয়া চলিয়াছে; সনাতনের গলার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া আজ সে-ই পিচ করিয়া খানিকটা থুথু মাটিতে ফেলিলো—

এমন অপমান আর নাই—

সনাতন এক নিমিষেই খুন চাপিয়া হাতের বৈঠা মাটিতে ফেলিয়া রসির বুক বরাবর কোঁচ তুলিলো।

রসি আর্তনাদ করিয়া পিছাইয়া যাইতেই—

খানিক আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল—

পিছলে পা দিয়া দুবার টাল খাইয়াই সে মাটিতে পড়িলো। ভুবন তাহাকে ধরিয়া তুলিলো বটে, কিন্তু রসির মূর্তি তখন ক্রুদ্ধ মার্জারীর মতো ভয়ঙ্কর।... রাগে তার গা ফুলিয়া রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে.. দৃষ্টি স্থির... চক্ষু জলপূর্ণ... ...চোখের উপরকার লোল চর্মটা পর্যন্ত যেন কাঁপিতেছে।—

ভুবনের বুক কাঁপিতে লাগিলো—

কিন্তু সনাতন দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিলো।

দেখিতে-দেখিতে লোক জমিয়া গেল—

রসি কাঁপিয়া-কাঁপিয়া সবারই সম্মুখে অভিসম্পাত দিলো,—অল্পেয়ে, আমায় মারতে উঠেছিলি? ভগমান তা' দেখেছেন। তুই মাছ মারতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে। বলিয়া রসি চলিতে আরম্ভ করিলো।—

দু-একজন বসিয়া পড়িলো।

কোঁচ রশি বৈঠা কুড়াইয়া লইয়া সনাতন আবার রওনা হইলো, কিন্তু ভুবন পিছাইয়া দাঁড়াইল; বলিলো, সনাতনদা, তুমি আজ একাই যাও, ভাই। আজ যাত্রা ভালো নয়।

সনাতন ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল—খ্যাপা না পাগল! শেপেছে আমাকে; মরি তো আমি মরবো। আয়।

কিন্তু যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইত্যবসরে চোখ টিপিয়া ভুবনকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। ভুবন নড়িলো না, বলিলো—না, আমি যাবো না, দাদা, ক্ষমা করো। পারো তো আর কাউকে সঙ্গে নেও।

—দরকার নেই; আমি একাই একশো। ঐ মাগির কথায় যদি মানুষ মরতো তবে তো বাঁচতাম, তোদের মুখ আর দেখতে হ'তো না।

বলিয়া সনাতন একাই গেল।

বর্ষার জল-নদী ছাপাইয়া ধানের খেতে প্রবেশ করিয়াছে। খেতে আধ-হাত জল।

বড়ো-বড়ো রুই-কাৎলা, বোয়াল, আড় প্রভৃতি মাছ সেই অল্প জলে চরিয়া বেড়ায়—

সনাতনের শিকার তারাই।

কোনো মাছের পিঠটা জলের উপর জাগিয়া থাকে, কাহারো গতিটা শুধু লক্ষ্য হয়…

অতি সন্তর্পণে ডিঙি বাহিয়া তাহাদের সন্ধানে ফিরিতে হয়; এবং চোখে পড়িলেই অব্যর্থ সন্ধানে কোঁচ নিক্ষেপ করিতে পারিলেই কাজ প্রায় শেষ হইয়া যায়; বাকি যা থাকে তা অতি সামান্যই।—

ছোটো নদী।

সনাতন ডিঙি ভাসাইয়া দিয়া ওপারের ধানের খেতে প্রবেশ করিলো।

একখানা যাত্রীর নৌকা গুন টানিয়া উজান দিকে বাহিয়া গেল…সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই—সময়টি অতি সুন্দর…মেঘের গায়ে বর্ণ বৈচিত্র্যের সমারোহ…জলে-স্থলে সোনার আভা…গাছের মাথায় আলোর মুকুট।…

কলসি ঘাড়ে এক ব্যক্তি ঘাটে জল লইতে আসিয়া হাঁকিয়া বলিলো,—সনাতন, হলো কিছু ?

কিন্তু সনাতনের মন-প্রাণ জলের উপর একটি রেখার সন্ধানে নিমগ্ন হইয়া গেছে—কৌতূহলের প্রত্যুত্তর দিবার সময় তার নাই।

সনাতনের ডান হাতে উদ্যত কোঁচ—

বাঁ হাতে লগি—

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সে ডিঙি ঠেলিয়া চলিয়াছে, চারিদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।…

চলিত-চলিতে অকস্মাৎ চোখে পড়িয়া গেল সেই রেখাটি, জলের উপর একটা চেরা দাগ—

একেবারে সম্মুখে।

সঙ্গে-সঙ্গে সনাতনের ডান হাতখানি আর একটু উর্ধ্বে উঠিয়া গেল ; কোঁচ নিক্ষিপ্ত হইল।…

লক্ষ্য অব্যর্থ—শিকার বিদ্ধ হইয়াছে—

জলের উপর রক্ত—

কিন্তু পরক্ষণেই শক্তিশালী জীবের দেহ মোচড় খাইয়া উল্টাইয়া যাইতেই সেই টানে সনাতনও জলে পড়িলো।—

জল তোলপাড় করিয়া জায়গাটা একেবারে কাদায় রক্তে পিঙ্গল গাঢ় হইয়া উঠিলো।

এমন আর কোনোদিন হয় নাই—

সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল—

নিঃশব্দ আকাশে যেন একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিলো—তুই মর্।

কোঁচ মাটির ভিতর চাপিতে-চাপিতে সে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলো—দৃষ্টির পরিধির মধ্যে মানুষ কোথাও নাই, বৃত্তাকার অন্ধকার যেন কেন্দ্রের পানে গুটাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ সেই জীবটা জলে একবার লেজ আছড়াইল। মাছই বটে ; কিন্তু এখন ইহাকে তুলিবার উপায়! মাটির সঙ্গে চাপিয়া পড়িয়া আছে…টানিলে তিলার্ধ নড়ে না।

শিকারে ধৈর্যের দরকার, সনাতনের তাহা জানা আছে। মাছ ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য—

এবং ঘটিলোও তাই।

গাছের মতো প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ, পিঠ কালো, কিন্তু দেহখানা যেন রজতনির্মিত। সনাতনের অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিলো।

মাছের ক্ষয়িতবল অসাড় দেহ জলের উপর ভাসিতে লাগিলো। সনাতন কোঁচ ধরিয়া তাহাকে টানিতে-টানিতে নৌকার কোলে আনিয়া নিজে নৌকায় উঠিয়া পড়িলো—

কিন্তু মাছটাকে ও নৌকার উপর টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই মাছের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকিয়া পড়ায় তাহাকে তোলা গেল না—

ঠেলিয়া তুলিতে হইবে।

সনাতন কোঁচ নামাইয়া আবার জলে নামিলো—

কিন্তু না নামিলেই ভালো হইতো।

সনাতন দুই হাতে মাছটাকে বেড়িয়া ধরিয়া হাত তোলা করিয়া নৌকায় তুলিবার উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়া পড়িতেই মাছটা লাফাইয়া উঠিলো।

মৃতপ্রায় মাছের দেহে অতো শক্তি কোথা হইতে আসিলো কে জানে—

মাছের সমস্ত দেহের গতিবেগ আর ওজনটা মুদ্গরের মতো উঠিয়া সনাতনের বুকে লাগিলো--

কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইলো—

পৃথিবীতে বায়ু নাই—

সম্মুখে আলো নাই—

কটি মুহূর্ত—

কটি মুহূর্ত চেতনার বাহিরে কাটাইয়া সনাতন যখন জাগিয়া উঠিলো তখনও সে কোঁচের হাতল চাপিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। বুকের উপর কয়েকবার সে বাঁ হাতখানা বুলাইয়া লইলো···ব্যথাটা যেন নিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে না।—

নাকালের একশেষ করিয়া এবং বহু চেষ্টার পর মাছ নৌকায় উঠিলো—

সনাতনের মনে হইলো, এইবার তোমায় পেয়েছি, বাবা।

কিন্তু পায় নাই—

মাছের শক্তি অতো শীঘ্র নিঃশেষ হয় না।

কোঁচের বঁড়শিগুলি এ-পিঠে বিদ্ধ হইয়া ও-পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেছে—তাহাই লইয়া মাছ নৌকার উপর যেন কুস্তি জমাইয়া দিলো—মোচড় খাইয়া, পুচ্ছ আছড়াইয়া সনাতনের কোঁচের কাঠির চার-পাঁচটা মট্‌মট্‌ করিয়া ভাঙিয়া দিয়া ডিঙি কাৎ করিয়া, কয়েক ঝলক জল তুলিয়া দিলো।

সনাতন মনে-মনে শপথ করিলো—ভবিষ্যতে ধারালো কাটারি একখানা যদি সে না আনে তবে সে—

মাছ খাবি খাইতেছে।

মৃত্যুর দৃশ্যে সনাতনের আনন্দ উপছিয়া পড়িতে লাগিলো। সনাতন চিতলের চোয়ালের ভিতর গুণের দড়ি পরাইয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিয়া ডিঙি ঠেলিয়া বেশি জলে দিলো।

কিন্তু তার বুকের ব্যথাটা তখনও মরে নাই। ডিঙি ঘাটে যখন পৌঁছিলো তখন মাছের মৃত্যু ঘটিয়া গেছে।

গ্রাম ভাঙিয়া লোক আসিলো মাছ দেখিতে। অতো বড়ো মাছ সে-তল্লাটে আর দেখা যায় নাই।

পাঁচ-সাত জনে হেঁও হেঁও করিয়া সেই অদ্বিতীয় মাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলো। এবং গ্রামময় বিতরণ করিবার পরও অবশিষ্ট যাহা সনাতনের নিজের জন্য রহিলো তাহাও বিস্তর।

রসির অভিসম্পাত যে কেমন করিয়া ফলিতে-ফলিতে সনাতন রক্ষা পাইয়াছে সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডটি সনাতনের মুখে অবগত হইয়া মাছের ভাগ হাতে করিয়া অনেকেই কাঁপিয়া উঠিলো। কিন্তু কাঁপুনিটা কম —

বক্রোক্তি, পরিহাস এবং হাসাহাসি যাহা হইলো তাহাই প্রচুর। সকলেরই একমত দেখা গেল—

রসির মন্ত্র-তন্ত্র সব ফক্কা—

গ্রামের লোকগুলি ভয় পাইয়া এতোদিন চূড়ান্ত আক্কেলহীনতার পরিচয় দিয়াছে। এখন হইতে—

কিন্তু ঐ পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল।

রসির মন্ত্র-তন্ত্র পদদলিত করিয়া চলিব, এটা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া

ব্যক্তিগতভাবে প্রচার করা এতো দিনের অনভ্যাসে যে-কাহারো পক্ষেই বড়ো দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।—

মাছ রান্না হইলো—

সেই মাছের ঝোল, আর ভাত।

মথুরের আনন্দ দেখে কে। সে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলো··

সনাতন মথুরকে লইয়া খাইতে বসিলো—

সম্মুখে থালায় ভাত, মালসায় এক মালসা মাছ আর ঝোল চিতল মাছের লম্বা লম্বা পেটির ডগা মালসার কাঁধ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

মথুরের খুব পুলক—

এমন ভোজ তার জীবনে এই প্রথম।

সনাতনেরও খুব ফুর্তি।

দুজনে হাসিয়া-হাসিয়া খাইয়া চলিয়াছে—মাছ আর ভাত। কঞ্চির মতো বড়ো-বড়ো পেটির কাঁটা পাতের গোড়ায় স্তূপীকৃত হইয়া উঠিলো।

সনাতন বলিলো, মাছের কাঁটা বেছে খাস, গলায় বাধবে।

মথুর বলিলো,—তাই খাচ্ছি বাবা।

বাপের গাল-ভরা আদর মথুরের এই প্রথম পাওয়া। মথুর কলকণ্ঠে বলিয়া চলিলো,—এমন মাছ কোনোদিন খাই নাই, বাবা। বড়ো ভালো লাগছে। সব মাছ দিয়ে দিলে কেন? আমরা রেখে রেখে এক মাস দু-মাস ধ'রে খেতাম। আবার যেদিন মারবে সেদিন যেন কাউকে দিও না, ওরা মেরে খেলেই পারে— হি হি হি·

মথুরের হঠাৎ হাসির কারণ এই—

একগ্রাস ভাত গিলিয়াই সনাতন দুই হাত দিয়া নিজেরই গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, ·চোখ ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ ভিতর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে।

বাপের চেহারা দেখিয়া মথুর খুব হাসিতে লাগিলো।

সনাতন আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলো—

কণ্ঠের ভিতর বারংবার আঙুল দিয়া এমন সব উৎকট শব্দ করতে লাগিলো যাহার মতো তামাশা আর নাই।·· মুখ লাল আর স্ফীত হইয়া আকারে যেন গোল হইয়া উঠিলো, সনাতন আর স্থির হইতে পারে না— বসিয়া পড়িলো।

গলা দিয়া এক ঝলক রক্ত আর একটা যন্ত্রণার অব্যক্ত নিনাদ বাহির হইলো—

তারপর শুইয়া পড়িয়া সনাতন দুই হাত আছড়াইয়া মাটি পিটিতে লাগিলো—গড়াইতে শুরু করিলো ; দেহ তার বেঁকিয়া চুরিয়া ভাঙিয়া দুমড়াইয়া গলা দিয়া খালি গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিলো।

মথুর এতক্ষণে ভয় পাইয়া হাসি থামাইয়াছে ; কাছে যাইতে সাহস হইলো না ; দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলো,—বাবা, থামো থামো।

কিন্তু তার বাবা তখন পরের হাতে, নিজে থামিবার উপায় নাই।—

মথুর ছুটিয়া বাহির হইলো—

উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চিৎকার করিতে লাগিলো,—বেহারী কাকা! বেহারী কাকা!

'যাই' বলিয়া সাড়া দিয়া কিছু বিলম্বে যখন বেহারী আসিয়া হাজির হইলো তখন সনাতনের দেহের আক্ষেপ শান্ত হইয়া গেছে।

দেখিতে-দেখিতে লোক জমিয়া গেল।

ডাক্তার আসিলেন, বলিলেন,—অ্যাস্‌ফিক্সিয়া। মাছের শিরদাঁড়ার হাড় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া মধ্যপথে আটকাইয়া আছে।—

রসিও আসিয়াছিল ; অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।

## পাইক শ্রীমিহির প্রমাণিক

জমিদার জাহ্নবী দাশগুপ্তের একটি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক চাই—কেরানি নয়, পাইক। জাহ্নবীর ধারণা, কেরানি চাইলেই মেলে এবং এক কথাতেই ভালোই মেলে—নির্বাচনে বিশেষ বুদ্ধি খাটাবার দরকার নাই, কিন্তু পাইকনিয়োগের বেলায় তা আছে। প্রজাশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে পাইক হচ্ছে রাজ্যশাসনে পুলিশের মতো—নির্জীবতা তার গুন ; হুকুম তামিল করবার জন্য প্রতি মুহূর্ত প্রস্তুত এবং উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকা তার প্রধান ধর্ম। সুতরাং জাহ্নবী মনে করেন, পাইক-নিয়োগে রাষ্ট্রবুদ্ধি সজাগ রেখে খুব হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

এবিষয়ে তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনাও করেছেন, কিন্তু

কার্যকালে দেখে-শুনে জাহ্নবী নাম করলেন এমন একটা লোকের যা শুনে তাঁর কদম-চুলো ছোটো মুহুরিটি পর্যন্ত হেসে উঠলো।

আগেকার লোকটি, ক্ষেত্তর, বেশ উপযুক্ত ছিলো। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ছিলো তার প্রত্যেকটি কাজে, আর সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলো প্রভুর ইজ্জতের দিকে। একটু অত্যাচার, যা করা নেহাৎ অনিবার্য হ'য়ে উঠতো, তাতে সে রাজিই ছিলো। পিতার আমলের এই ক্ষেত্তর মারা যেতেই ক্ষেত্তরের অভাবে জাহ্নবী একেবারেই অসহায় হ'য়ে না পড়লেও এবং সন্ত্রাসসৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য না হ'লেও, অনুভব করলেন, তিনি যেন খানিক শিথিল হ'যে পড়েছেন, অর্থাৎ শিরোধার্য জমিদার হিশাবে তাঁর দুর্গতি একটু ঘটেছে—প্রজার সান্নিধ্য থেকে দূরে স'রে গিয়ে তাদের চোখে তিনি যেন খানিক দুর্বল হ'য়ে দেখা দিচ্ছেন।

জাহ্নবীর এ অনুমান সত্য না-ও হ'তে পারে; কিন্তু ক্ষেত্তরের মতো তেমনি গুণসম্পন্ন একটি পাইক তার চাই।

শক্ত জিনিশের গায়ে বাইরে থেকে উত্তাপ দিয়ে তাকে নত ক'রে আনতে ক্ষেত্তর পারতো, অর্থাৎ সঙ্গতি সত্ত্বেও খাজনা আদায় দিতে যারা অনিচ্ছুক এবং পূর্ব পূর্বপুরুষ কর্তৃক অনুকৃত ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের ছেড়ে কথা কইতো না—খাজনা আদায় হ'তো এবং সাক্ষী'র অভাব হ'তো না।

সুতরাং ক্ষেত্তরের অভাবটা অনুভব ক'রে জাহ্নবী ম্রিয়মাণ হয়েছিলেন··· এবং ক্ষেত্তরের স্থান সর্বতোভাবে পূর্ণ করতে পারে এমন একটি পাইক তাঁর চাই ব'লে তিনি জানিয়েছেন।

জাহ্নবীর আহ্বানে তাঁর আমলাবর্গ আজ প্রাতঃকালে একত্রিত এবং অবহিত হয়েছেন—কাজকর্ম তাঁরা এখনকার মতো সরিয়ে রেখেছেন। সভাপতি স্বয়ং জাহ্নবীবাবু।

কর্মখালির বিজ্ঞাপন যথারীতি প্রচারিত হয়েছে এবং পাইক-পদের জন্য প্রার্থী হয়েছে অনেকেই। জাহ্নবাবাবু পদপ্রার্থীগণের লিখিত দরখাস্ত নিয়েছেন, কারণ, আধুনিক সভ্যপদ্ধতিই ঐ—সকল কাজই অফিস-সংক্রান্ত কার্যবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে—সেকালের ব্যবস্থা ছিলো কতক এলোমেলো, কতক ঘরোয়া।··· আঙুলের টিপ দিয়ে দিয়ে প্রার্থীগণ দরখাস্ত দাখিল করেছে এবং তলব পেয়ে এখন হাজির আছে।

কদম-চুলো ছোটো মুহুরি নাম ডেকে-ডেকে দরখাস্ত পেশ করতে লাগলো—

—হারান বাগ দি?

হারান বাগদি এসে জাহ্নবীর টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। ···জাহ্নবী তখন হারানের বকলমে স্বাক্ষরিত দরখাস্তখানা পড়ছেন।

হারানের হাতে মস্ত একখানা লাঠি—চোখ দুটো খুব বড়ো, আর চোখের কোণ লাল। লাঠি সে বাইরেই রেখে এলে পারতো! —লাঠি সমেত জমিদারকে প্রণাম করতে তার খানিক অসুবিধাই হ'লো। যা হোক, লাঠি মাটিতে নামিয়ে সে উপুড় হ'য়ে প্রণাম করলো—প্রত্যুত্তরে জাহ্নবী কেবল তর্জনীটা একটুখানি নাড়লেন···

এবং হারান যখন প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালো, তখন তাঁর চোখে পড়লো একরাশ চুল—হারানের মাথায় নির্ভীকতার এবং বীরত্বের সাক্ষীস্বরূপে খুব কতগুলো চুল আছে। ঐ চুলে ঝাড়া দিয়ে হারান অনেক বাচালকে নিঃশব্দ এবং অনেক চতুরকে জব্দ এবং অনেক একগুঁয়ের ঘাড় ফিরিয়ে দিয়ে কার্যোদ্ধার করেছে ব'লে প্রকাশ।

কদম-চুলো ছোটো মুহুরি বললো,—হারান আগে ছিলো ভবানন্দপুরের রায়বাবুদের সদর কাছারির পাইক। রায়বাবুরা একে জবাব দেন, গুজব তা-ই; কিন্তু এ বলে, সে-ই কাজে ইস্তাফা দিয়ে চ'লে এসেছে।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন,—বয়স কত?

ছোট মুহুরি বললো, বায়ান্ন।

—কে আছে?

—ছেলেরা আছে। নিজে বিপত্নীক।

—বাদ দিন। তারপর।

তারপর দেখা দিলো কেশব দাস—

চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তবে স্কন্ধ দেখেই মনে হয়, বোঝা বইতে সক্ষম, তা যতো ভারীই হোক্ না।

প্রণামাদি গ্রহণের পর বাবু নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছে তোমার?

—ইস্ত্রি আছে হুজুর।।

ছোটো মুহুরি হেসে বললো,—কাজের লোক বটে; তবে বড়ো অসুখী। স্ত্রীটি ভারী মুখরা।

—তাই নাকি? বাদ দিন। তারপর।

তৃতীয় ব্যক্তি প্রিয়নাথ গরাঞি—

জাহ্নবী পূর্ববৎ তর্জনী আন্দোলিত ক'রে এ-ব্যক্তিরও প্রণতি লক্ষ করলেন··· শারীর-সামর্থ্য যৎকিঞ্চিৎ ব'লেই মনে হ'লো।

ছোটো মুহুরি পেশ করলো,—বিশ্বাসী বটে। বড়ো ছেলেটা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক হিশাবে ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই, অনেককে ডিঙিয়ে, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের সরকারি চাকরি পেয়েছে। ভালো গৃহস্থ।

—বাদ দিন। তারপর।

চতুর্থ প্রার্থী রামলাল ভাণ্ডারী—

জাহ্নবী প্রণাম নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, ভাণ্ডারীর দেহ যতো বড়ো এবং যতো দৃঢ়ই হোক্, ভুরু নাই এবং তা না-থাকাতে তার মুখখানা যেন চক্ষুলজ্জাহীন গণ্ডারের মতো দেখাচ্ছে।

ছোটো মুহুরি বললো,—দাদারা জাত-ব্যাবসা করে·

জাহ্নবী হঠাৎ বললেন,—বাদ দিন। তারপর। পঞ্চম ও শেষ ব্যক্তি, রমণ রায়—চেহারায় শিক্ষিতের মতো মৃদুতা আর নিঃস্পৃহা আছে ব'লে জাহ্নবী অনুমান করলেন—আর সেই সঙ্গে সে বলবানও। কিন্তু রমণের প্রণামের স্বীকৃতি হিশাবে জাহ্নবী এবার কেন তর্জনী নাড়লেন না তা তিনিই জানেন।

ছোটো মুহুরি বললো,—জাতিতে সদগোপ।·· দরখাস্তে যা লেখা আছে তার অতিরিক্ত কথা হচ্ছে এই যে, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে একবার ফৌজদারির ফেরে পড়েছিল। অভাবগ্রস্ত বটে।

—বাদ দিন। তারপর।

ছোটো মুহুরি বললো,—আর দরখাস্ত নেই।

—দু' আনা ক'রে খোরাকি-খরচ দিয়ে ওদের যেতে বলুন।

পয়সা দেবার আদেশে ছোটো মুহুরি চমকে উঠলো,—এখানকারই লোক যে।

বাবু বললেন, তা হোক কাজের ক্ষতি হ'লো তো।

বাবুর এই কর্মপ্রণালীটা ছোটো মুহুরি অনুমোদন করেনি, আহত হবার সুর নিয়ে সে বললো,—সব ক'টিকেই ছেড়ে দিলেন বাবু! লোক একটি তো চাই-ই আপনার!

জাহ্নবী বললেন,—দেখা যাক্। চাই-ই ব'লে তাড়াতাড়ি ক'রে অনুপযুক্ত লোককে তো নিতে পারিনে।

তারপর দু-চারখানা কাগজে সই ক'রে জাহ্নবী কাছারি ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তাঁর চোখে পড়লো প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে একব্যক্তি ব'সে আছে—তাঁর মনে হ'লো, খুব অন্যমনস্কভাবে সে ব'সে আছে···তার হাতের

কাছেই একটি নাদুশ-নুদুশ ছেলে কাছারি ঘরের দিকে পিছন ফিরে শান্তভাবে ব'সে আছে···লোকটার আর কিছু কাজ নেই—সে মাথা হেঁট ক'রে দেশলাইয়ের মাথাপোড়া একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত শিথিলভাবে সেটাকে মাটিতে বুলিয়ে চলেছে···জাহ্নবী আরো লক্ষ করলেন, তার পরনের কাপড় নেহাৎ নেংটি-ধরনের ছোটো নয়, আর ময়লা নয়।

জাহ্নবী কাছারি ঘরের বারান্দা পার হ'য়ে উঠোনে নামলেন, এগিয়ে চ'লে ক্রমশ লোকটির নিকটবর্তী হ'তে লাগলেন···তবু তার হুঁশ নেই—

জাহ্নবী পাশ কাটাবেন এমন সময় হঠাৎ সে চোখ তুলে জমিদারকেই একেবারে সামনে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো·· আবার তখনই সে নতজানু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে হাত জুড়লো···তারপর তার আনত ললাট আরো নত হ'তে-হ'তে একেবারে ধুলোয় পৌঁছে তবে থামলো, কিন্তু তার এই প্রণাম করা যেন আর শেষ হ'তে চায় না···

সময়ের পরিমাপ মতো প্রণাম করা শেষ না করলে ব্যাপার হাস্যকর হ'য়ে ওঠে—পরের পদপ্রান্তে দাসভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আত্ম-নিবেদন করারও সীমা আছে। জাহ্নবী হাসলেন না, কিন্তু তাঁর মনে হ'লো, তিনি যতো বড়োই হোন, এই লোকটার ধূলিলুণ্ঠিত আনুগত্যের সীমা তাঁর প্রভুত্বকে লেহন করতে করতে ঢের দূর বেড়ে গেছে।

কিন্তু শুনতে আশ্চর্য, এই ব্যক্তিকেই তিনি তৎক্ষণাৎ মনে-মনে তাঁর পাইকের শূন্য পদে নিযুক্ত ক'রে নিলেন!

জাহ্নবী ফিরলেন; ফিরে গেলেন কাছারি-ঘরে এবং নিজের অভিলাষ বা নির্বাচন প্রকাশ করলেন···

এবং তা শুনে কদম-চুলো ছোটো মুহুরিটি পর্যন্ত আদবকায়দার গণ্ডি লঙ্ঘন না ক'রে হঠাৎ হেসে ফেললো—না হেসে কেউ পারলো না।

ছোটো মুহুরি বললো,—মিহির প্রামাণিককে! ওর মতো আল্সে দুনিয়ায় আর নাই। তার উপর এতো ভালো মানুষ যে, সাত চড়ে মুখে রা নেই। বাপে কিছু টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিল—তা-ই ভেঙে করেছিল এক নুন-তেলের দোকান। দোকানের সমস্ত মাল দেখতে দেখতে কেটে গেল, কিন্তু ধারে। সে-পয়সাগুলো আদায় করবার উৎসাহ পর্যন্ত ওর নেই।

শুনে জাহ্নবী বললেন,—দেখা যাক্। কে আছে ওর?

—স্ত্রী, আর ঐ ছেলেটি।···একটু বাবু-ধরনের—খেতে পাক না পাক সোডায় সিঝিয়ে কাপড়খানা কাচা চাই-ই।

—ওকেই বহাল করলুম। ব'লে জাহ্নবী চূড়ান্ত ক'রে দিলেন…

এবং তৎক্ষণাৎ কাছারিঘরে একটা কলরব না হোক্ ব্যস্ততা প'ড়ে গেল…

ছোটো মুহুরি ব'সে-ব'সেই চিৎকার ক'রে ডাকলো মিহির‌কে…মিহির ধীরে ধীরে উঠে ছেলেটাকে কোলে ক'রে নিয়ে এসে দাঁড়ালো…ছোটো মুহুরি খবর দিলো যে, তাকেই বাবু পাইক মনোনীত করেছেন—

শুনে মিহির বিচলিত হ'লো না—

—আট টাকা মাইনে হ'লো তোর। বুঝলি ?

মিহির ঘাড় নেড়ে জানালো, বুঝেছে।

তখন একখানা ফর্মের ঘরপূরণ ক'রে তাতে মিহিরের টিপসহি নেয়া হ'লো…ঘরপূরণ ক'রে লেখা হ'লো নিয়োগের তারিখ, মিহিরের নাম ও ধাম, পিতার নাম, জাতি, বয়ঃক্রম এবং বেতনের পরিমাণ… তারপর সিন্দুক খুলে তার হস্তে অর্পণ করা হ'লো লাল একটা পাগড়ি এবং পিতলের এক চাপরাশ। ঘরের কোণ থেকে এনে তার হাতে দেয়া হ'লো পাকা একখানা বাঁশের লাঠি—জমিদারের দুর্দান্ত শাসনশক্তির ওরাই প্রতীক। ছোটো মুহুরি বললো,—নে রাখ্ তোর কাছে।…তারপর বাবু ইত্যবসরে চ'লে গেছেন দেখে বললো,—তোকেই বাবু পুষবেন।…একটু তামাক সাজ দেখি।

জাহ্নবী দাশগুপ্ত অত্যাচারী জমিদার ব'লে কারো কারো ধারণা। উপর-উপর দেখতে গেলে তা-ই, কিন্তু জমিদার বন্ধুদের কাছে নিজে যা কৈফিয়ৎ দেন তা শুনলে নির্বিবাদে মতের পরিবর্তন করতে না হ'লেও হঠাৎ ধোঁকায় পড়তে হয়। তিনি বলেন, যতো টাকা বার্ষিক আদায় হয় দেখতে পাও তার চাইতে ঢের বেশি টাকা প্রজার কাছে বাকি পড়েছে। তার কারণ এই যে অনেক প্রজাই সংসারের ব্যয় নির্বাহ ক'রে বৎসরের খাজনা বৎসরে শোধ করতে পারে না—অনেকের কাছেই তিন-চার বছরের খাজনা বাকি থাকে। আমি জানি, তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাদের যা আয় তাতে পোষ্য দুটির মুখে সারা বৎসর ভাত দেয়াই দুষ্কর—কিন্তু তবু তোমাদের স্বীকার করতেই হবে, আয় তারা যা-ই করুক তা তারা জমিদারের জমি থেকেই ক'রে থাকে, কাজেই জমিদারের কিছু প্রাপ্য এখানে আছে।—দুঃস্থ প্রজাকে তামাদির পূর্ব পর্যন্ত অনুকম্পা করা যেতে পারে, কিন্তু তার ওদিকে নয়; খাজনা তামাদি হোক্, অর্থাৎ জমিদারের অপূরণীয় ক্ষতি হোক্ এ কেউই বোধ করি চাও না।…নালিশ করলে প্রজা মরবে—তা করতে পারিনে, চাইও নে; কিন্তু টাকা কিছু আমার আদায়

হ'তেই হবে। তার উপায় তাহ'লে হাতে রইলো মাত্র একটি—তা হচ্ছে, প্রজাকে ধ'রে এনে ধমক দেয়া, আটক রাখা—গোরু-বাছুর ঘটি-বাটি বেচে তামাদি রক্ষা করতে বাধ্য করা।...এ তো অত্যাচার নয়—যথার্থ অত্যাচার করা হবে আদালতে গেলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাইক মিহিরের কর্তব্য এখানে গুরুতর। লোকের নিত্য-ব্যবহার্য থালা-ঘটি-বাটি কিংবা সাদরে প্রতিপাল্য গোরু-বাছুর প্রভৃতি লোকের বাড়ি থেকে বলপূর্বক নিয়ে এসে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত করা—

কিন্তু মিহির প্রামাণিক বিখ্যাত ভালো মানুষ· তাকে যারা হাতে-নাতে জলজ্যান্ত ফাঁকি দিয়েছে তাদের কাছেই সে অধোবদন হ'য়ে আছে—মুখ তুলে পাওনার কথা বলতে পারে না।

মিহির নিঃসন্দেহে নিযুক্ত হ'য়ে গেল—পাগড়ি আর চাপরাশ আর লাঠি তার হাতে এসে গেছে, কিন্তু এতো বড়ো পদে নিযুক্ত হ'য়েও মিহিরকে তখনই টলতে দেখা গেলো না।

ছোটো মুহুরি ব'লে দিলে, বেলা ঠিক দুটোর সময় তাকে আজ হাজির হ'তে হবে—কাছারিতে উপস্থিত থাকতে হবে রাত আটটা পর্যন্ত। কাল থেকে সে অষ্টপ্রহর 'যো হুকুম' শব্দ দুটো ওষ্ঠাগ্রে নিয়ে মনিবের হুকুমের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবে··· কুঁড়েমি এবং ঘর, এই দুটির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হ'লো।

এই সব হুকুম অর্থাৎ স্বাধীনতাবিলোপের মন্ত্র, মিহির কান পেতে গ্রহণ করলো এবং কিছু সে বললো না ব'লেই মনে ক'রে নেয়া হ'লো যে ব্যাপারটা সে বুঝেছে এবং রাজি হয়েছে।

ছোটো মুহুরি বললো,—যা খেয়ে-দেয়ে আয়গে। ব'লে সে উঠলো।

ছোটো মুহুরি সেদিন বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে জমিদারের আক্কেল-বিবেচনার গল্প ক'রে খলখল ক'রে খানিক হাসলো, তারপর বললো, আর ভদ্রস্থা নেই। গেল সব রসাতলে।

চাপরাশ এবং পাগড়ি এবং লাঠিখানা নিয়ে, আর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মিহির বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। তার পরিবর্তন শুরু হ'লো পথের মাঝে এবং অকস্মাৎ।...চাকরিলাভ হয়েছে—অন্নের দুঃখ ঘুচলো, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব তার অন্নের দুঃখ অপহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সে আনন্দও তেমন গভীর নয়—গভীর আনন্দের হেতু পাওয়া গেল অন্যত্র।...

এখন জমিদারের পাইক সে, অর্থাৎ জমিদার যে-ক্ষমতা পরিচালনা করবার হকদার, যে-ক্ষমতা প্রতিরোধ করবার বিরুদ্ধ-ক্ষমতা কারো নাই, লাল পাগড়ি আর পিতলের চাপরাশ আর বাঁশের লাঠির দিকে তাকিয়ে মিহিরের মনে হ'লো, জমিদারের সেই দু:সহ ক্ষমতার সে মূর্তি।···ভূতপূর্ব পাইককে আসতে দেখে সে কতবার গা-ঢাকা দিয়েছে এবং কতবার তার গায়ে কাঁটা দিয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নাই।···জমিদারকে আর নিজেকে যুগপৎ এবং পুনঃপুনঃ আর ক্রমশ ব্যাপক সুতীক্ষ্ণ ক'রে অনুভব করাবার ক্ষমতা যদি কারো থাকে তবে ঐ চিহ্নধারী আর আরোপিতশক্তি পাইকেরই আছে। মানুষের সম্ভ্রম আর সম্পত্তিতে নির্ভয়ে হস্তার্পণ করতে কেবল সে-ই পারে—কারণ, অভয় দিয়ে তারই পশ্চাতে রয়েছে অর্থ, বুদ্ধি এবং আইন। মিহিরের রক্ত গরম হ'তে লাগলো।···

পথে দেখা হ'লো গ্রামস্থ বৃদ্ধ ভূপতি রক্ষিতের সঙ্গে। ভূপতি রক্ষিত চিরকাল তাদের 'ছোটোলোক' ব'লে অবজ্ঞাভরে তফাতে এবং 'ভালোলোক' ব'লে স্নেহভরে কোলের দিকে টেনে রেখেছে, অর্থাৎ কোথাও স্থান দেয় নি—তুই-তুকারি ক'রে এবং আশকরা না পায় সেদিকে সে লক্ষ্য রাখে।

মিহিরের সামনে প'ড়ে যেতেই ভূপতি রক্ষিত হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে গেল; বললো,—ব্যাপার কী রে?

আগেও পথে-ঘাটে এমন দেখা-সাক্ষাৎ অনেক হয়েছে, কিন্তু মিহিরের সঙ্গে কথা বলবে কিনা সেটা ছিলো নিতান্তই ভূপতির ইচ্ছাধীন। আজ যেন সে মিহিরকে সম্ভাষণ করতে বাধ্য হ'লো।

মিহির বললো,—বাবু আমাকে পাইক নিযুক্ত করলেন।

—সত্যি? তবে তো ভালো।—ব'লে পাগড়ি, চাপরাশ আর লাঠিখানা নিরীক্ষণ ক'রে ভূপতি যেন অবাক হ'য়ে পুনরায় বললো,—এগুলো সব দিলে বুঝি?

—হুঁ। আপনাদের আশীর্বাদে···

কিন্তু আশীর্বাদের কথা অর্থাৎ মিহিরের ভাগ্যোদয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা, ভূপতি কানে তুললো না; অন্য কারণে খুশি হ'য়ে বললো,—বড়ো খুশি হলাম শুনে।···তারপর মিহিরের দিকে ভূপতি খানিক ঘেঁষে এলো; বললো,—চিরকালের স্নেহের পাত্র তোরা। তোর বাবা তো ছিলো আমার ছেলেবেলাকার—খালি ছেলেবেলাকারই বা বলি কেন?—চিরকালের সঙ্গী।···চিরকালের দোহাই পেড়ে ভূপতি রক্ষিত পুনরায় বলতে লাগলো, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি; আমাকে তুই একটু রাখিস্ বাবা।···তারপর সঙ্কটের অবস্থাটা আরো

পরিস্ফুট করতে ভূপতি বললো,...নেহাৎ নাচার না হ'লে কি জমিদারের অসন্তোষের কাজ কেউ করে, না করতে সাহস পায়!...বুঝলে?

তুই ছেড়ে ভূপতির মুখে তুমি এসে পড়েছে।

মিহির বললো,—হ্যাঁ।

—এখন আসি বাবা। কাজ আছে।...বিশেষ ক'রে আমি খুব বিপন্ন এখন।...তোমাকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে আর দেরি করাবো না। এসো।...ব'লে ভূপতি রক্ষিত প্রস্থান করলো।

মিহিরের চোখ ফুটতে আর রক্ত গরম হ'তে বাকি ছিলো, ভূপতি রক্ষিত তোশামোদ ক'রে তা সুসম্পূর্ণ আর সুতীব্র ক'রে দিয়ে গেল।..

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে তারপর তার মনে হ'তে লাগলো এই ভূপতি রক্ষিতের কথাই। তাদের অনেক জিনিশ ভূপতির ঘরে ঢুকেছে—বড়ো কষ্ট দিয়ে তা বেরিয়েও এসেছে, কিন্তু টাকায় মাসে এক-আনা সুদের একটি পয়সা সে মাপ করেনি—মানে, ভূপতির টিপে তার স্ত্রী করেনি। মিহিরের ঠাকুমা মিহিরের মায়ের মুখ দেখে যে সোনার মাকড়ি দিয়েছিল, তার একটা তিন টাকায় রেখে ভূপতি তা দিলোই না।

হঠাৎ মিহিরের একটু হাসি পেলো—

তার মনে হ'লো, রক্ষিত মহাশয় অতিশয় ক্ষুদ্র ব্যক্তি; তাঁর পূর্ব ব্যবহার যতোই গর্হিত হোক, ক্ষমা করা যেতে পারে।...কোপে পড়লে উনি বাঁচবেন না।

সুসংবাদ নিয়ে মিহির বাড়িতে ঢুকলো; হেঁকে বললো,—কোথায় গো তোমরা?

—এই যে। ব'লে হরিমতি বেরিয়ে এলো। স্বামীর মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, ভারি স্ফূর্তি দেখছি যে!

—চাকরি পেলাম।

—বলো কি!

—হ্যাঁ, জমিদারের পাইক!

হরিমতি বললো, যাক, কষ্ট ঘুচলো।

—কিচ্ছু বোঝো না। খালি কষ্ট ঘুচলো? অনেক আপদও ঘুচলো। ছিলাম দাস, হলাম প্রভু; ভূপতি রক্ষিতের মতো মানুষও তা স্বীকার করেছে। ধ'রে বসলে হয়তো পায়ের ধুলোও নিতো। ব'লে মিহির হাসলো।

স্বামীর মুখের উজ্জ্বলতা, কণ্ঠের প্রগলভতা আর সর্বাঙ্গের হিল্লোল খুব

অভিনব মনে হ'য়ে হরিমতি অবাক হ'লো ; বললো,—কী যে বলো !

—সে কথা যাক্। ছেলেটাকে ধরো ; আর, খানিক্ তেল আর তেঁতুল দাও দিকি। আছে ঘরে ?

—আছে, কী করবে ?

—তেল মাখাবো লাঠিতে, আর তেঁতুল দিয়ে মাজবো এই চাপরাশ। আর কিছু না হোক, আমার দোকানের বিলেত-বাকিটা এবার আদায় হবে। কোলে ছেলে নিয়ে হরিমতি তেল আর তেঁতুল আনতে গেল···

মিহির বলতে লাগলো,—বলো দেখি, গয়না চাও রুপোর না সোনার ?··· ইত্যাদি সুখের আর আজগুবি সব কথা মিহিরের মুখে যেন আর শেষ হ'তে চায় না !

তারপর সে লাঠিতে মাখালো তেল, তেঁতুলে মাজলো চাপরাশ, আর পাগড়ির ধুলো ঝেড়ে মেলে দিলো রোদে !···মনে হ'লো, চাকচিক্যশালী আর পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এই শাসন প্রহরণগুলি প্রভুর হিতার্থে যেন আরো উদ্যত হ'য়ে উঠেছে !···

কাছারির দেয়াল-ঘড়ির ঠিক দুটোর সময় মিহির কাছারিতে এসে দেখলো. আর কেউ নেই , কেবল ছোটো মুহুরি জানালার ধারে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। রোদ এসে পড়েছে তার চাঁদিতে···

দেখে মিহির তামাক সাজতে বসলো···

—মুহুরিবাবু উঠুন, তামাক সেজেছি। মুহুরিবাবু চোখ মেলতেই মিহির বললো, মাথায় রোদ লাগছে আপনার।

—এই উঠেছি। ব'লে মুহুরি উঠে বসলো , বললো, এসেছিস ? বৌ কী বললে রে ?

মুহুরির হাতে হুঁকো দিয়ে মিহির বললো, ভারি খুশি। তারপর সে একটি মিছে কথা বললো ; বললো,—বললে, এবার সব জব্দ হবে।

– জব্দ হবে কারা রে ?

—যারা আমাদের ঠকিয়েছে ? উপরঅলা ছিলো।

তাহ'লে তো দেশের গাঁয়ের প্রায় সবাই। মিহির রক্তে একটা উত্তাপের ঢেউ অনুভব করলো ; বললো,

—তা হিশেব দৃষ্টে-দেখে নিতে হবে।

মিহিরের বর্তমান কথার ধরনে ছোটো মুহুরি বিস্মিত হ'লো খুব—একেবারে এ-পিঠ. ও-পিঠ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে !···হুঁকো টানতে-টানতে বললো,—

ভেবেছিলাম, পারবিনে, তা পারবি তুই।

—পারবো বৈ কি! বাবু কখন আসবেন?

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মুহুরি বললো—তিনটেয়। বাবু আসবেন, তাঁকে সেলাম করতে হবে। মিহির প্রস্তুত হ'তে লাগলো—

পাগড়িটা জড়িয়ে মাথায় বাঁধলো, চাপরাশ বাঁধলো কোমরে—মালকোচা মেরে কাপড় পরলো এবং লাঠিখানা হাতে ক'রে দরজায় দাঁড়িয়ে সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো···তখন উত্তাপ তার শিরায় শিরায় বইছে।

তিনটেয় বাবু এলেন—

মিহির হাত তুলে গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে অভিবাদন ধ্বনিত করলো, সেলাম, হুজুর।

জাহ্নবী ঘরে ঢুকে একবার ছোটো মুহুরির মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসলেন···মুহুরি তখন হাসছে।

## গুরুদয়ালের অপরাধ

গরিব গুরুদয়াল বড়োলোক চন্দ্রশেখর সান্যালের একেবারেই যে মোসাহেব হইয়া আছে তা নয়—জল কাৎ এবং বেগুনের গুণাগুণ বিবৃতি সম্বন্ধে যে হাস্যকর মো-সাহেবি গল্প প্রচলিত আছে, সেরকম গল্পে সায় দিবার দরকারই আর হয় না—চন্দ্রশেখর ধনী এবং অলস হইলেও অতোটা নন।

গরিব গুরুদয়ালের তরফ হইতে উপকারের সূত্রেই আলাপের সূত্রপাত।

চন্দ্রশেখর একদিন গাড়িতে গঙ্গারামপুর যাইবেন—কিন্তু বহুৎ তোড়জোড় পূর্বক হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ব্যাপার দুরূহ, ইহাকেই লোকারণ্য বলে; তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন···

'মালপত্তর' ভৃত্য এবং কুলির সাহায্যে প্লাটফর্মে নির্বিঘ্নে আনা হইয়াছে—কিন্তু সেখান হইতে চতুর্দিকে তাকাইয়া তাঁর মনে হইলো, এই জনতার আর কোনো কাজ নাই, কেবল তাঁহাকেই বাধা দিবার জন্য চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখরের অবশ্য স্মরণ হইলো না যে, হাওড়া স্টেশনের সাধারণ রূপই ঐ—

তার উপর কুলিদের উৎপাত খুব। কয়েকটি বাকশো বিছানা আর চাঙারি গাড়িতে তুলিয়া দিবার পারিশ্রমিক তাহারা যাহা দাবি করিতেছে তাহা স্বপ্নাতীত না হইলেও অসম্ভব উচ্চ···

সুতরাং তিনি রাগিয়া উঠিলেন ভৃত্য হারার উপর; বলিলেন—ওরে ব্যাটা হারা, ভ্যাবাচ্যাকা খাস্‌নে—হাঁ ক'রে কী দেখ্‌ছিস? গাড়ি ধরতে পারা যাবে

কিনা ভেবে দেখেছিস্? কথা বুঝছিস্ না কেন তুই? তোকে সঙ্গে এনেই আপদ হ'লো।

হারা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলো।

টিকিট-ঘরের সম্মুখেও ঠেলাঠেলি লাগিয়াছে যেন 'জান কবুল' করিয়া চন্দ্রশেখর হতোদ্যম হইয়া গেলেন—এতো বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গাড়িতে যাইয়া উঠা তাঁর সাধ্য নয়।...এই অবস্থায় পড়িয়া প্রচুর লগেজ, স্ত্রী ও সন্তানগণ এবং কুলিগণের মধ্যে অস্থির হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তিনি যখন ভারি বিব্রত এবং প্রবলভাবে অসংলগ্ন কলরব কারতেছেন, আর তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট-ঘরের জানালায় ভিড় দেখিয়া অকারণেই ভাবিতেছেন ফিরিয়া যাইবেন কিনা, আর চিৎকার করিয়া পুনঃপুনঃ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমরা কেন সঙ্গে এলে?—আর কুলিগণকে ধমক দিতেছেন,—এই, হঠ যাও!—আর লগেজ গ'নিয়া দেখিতেছেন, ছোটো-বড়োয় দশটা ঠিকই আছে, আর হতাশ হইয়া বলিতেছেন,—যাওয়া কেমন ক'রে হয়? হ'লো না।.. ঠিক তখনই দেখা দিলো গুরুদয়াল।

তফাতে দাঁড়াইয়া সে ব্যাপারটা দেখিতে'ছিল, সম্মুখে আসিয়া ব'ললো,—বাবু, ব্যস্ত হবেন না; আমি তো সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আপনি বসুন।

চন্দ্রশেখরের মনটা ভারি অদ্ভুত—অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট হইতে 'বাবু' সম্বোধন পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চরিতার্থ হইয়া গেলেন- ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—দিন দেখি।

গুরুদাস বলিলো,—যে আজ্ঞে।—বলিয়া সে স্নেহসূচক পিতৃসম্বোধন করিয়া কুলিদিগকে বশীভূত করিলো—চন্দ্রশেখরের বড়ো ছেলে ন্যাটার দুঃসহ জলপিপাসা পাইয়াছিল—জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল—চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস দিলো যে, এখনও বিস্তর সময় আছে—তারপর লগেজের তিনটি স্তূপ প্রস্তুত করিলো, যথাক্রমে তিনটি কুলির মাথায় যাইবে বখ্‌শিশের বন্দোবস্ত করিয়া কুলিদের মুখে হাসি ফুটাইল এবং চন্দ্রশেখরকে সঙ্গে লইয়া মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কাটাইল—

সেখানে ভিড় না দেখিয়া চন্দ্রশেখর হাসিয়া বলিলেন, এখানে ভিড় নেই।

গুরুদয়াল বলিলো, আজ্ঞে না।

গুরুদয়ালের পরিশ্রমে সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইয়া চন্দ্রশেখর ভারি কৃতজ্ঞ হইলেন।...কুলিদের হাঁকাইয়া লইয়া আর চন্দ্রশেখরের মধ্যম পুত্রটির হাত ধরিয়া গুরুদয়াল সঙ্গে সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেল...চন্দ্রশেখর তার নাম আর ঠিকানা জানিয়া লইলেন; বলিয়া গেলেন, ফিরিবার সময় তিনি পত্র দিবেন, গুরুদয়াল বাবু যেন স্টেশনে আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান। গুরুদয়াল ঘাড় কাৎ করিয়া

বলিলো, যে আজ্ঞে, যাবো।

— ভুলবেন না।

যেন অনুচিত অভিসম্পাত কানে আসিলো, এমনি চমকিয়া গুরুদয়াল আগে দাঁতে জিব কাটিলো, তারপর বলিলো,—দেখুন দেখি বাবুর কথা ?···আজ্ঞে না, ভুলবো না।

চন্দ্রশেখর কথা রাখিলেন—পত্র দিতে ভুলিলেন না ; গুরুদয়ালও কথা রাখিলো—স্টেশনে হাজিরা দিয়া সপরিবার চন্দ্রশেখরকে লইয়া নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়া দিতে ভুলিলো না।

চন্দ্রশেখর তাহাকে সাদরে বসাইয়া সযত্নে জলযাগ করাইলেন, আদ্যন্ত পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যহই তাঁহার কাছে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিবার এবং 'গল্পগুজব' করিবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ করিয়া সুন্দর ভাবে হাস্য করিলেন··· বলিলেন,—ভারি আনন্দ পাবো।

গুরুদয়াল মাথা নোয়াইয়া আনন্দের বার্তা শিরোধার্য করিয়া লইলো— বলিলো,—যে আজ্ঞে।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা সামান্য ঘটনা ইত্যবসরে ঘটিয়াছে—তাহাও উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রশেখর প্রথম আলাপে গুরুদয়ালকে 'আপনি আজ্ঞা' করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার মিলনের প্রথম ভাগটাতেও তাই···কিন্তু যত্নপূর্বক জলযোগ করাইয়া দিবার পূর্বে বলিলেন, 'তুমি', বলিলেন,—এসো কিন্তু রোজ!

গুরুদয়ালকে ছোটো ভাবিবার কারণ ইহাই যে, পরিচয় লইয়া তিনি জানিয়াছেন, গুরুদয়াল ভারি গরিব, তার পয়সা নাই, বয়সে প্রায় সমান হইলেও জাতি সন্নিবেশে তার স্থান নিম্নে। আরও একটা কারণ আছে। চন্দ্রশেখর ধনী এবং অলস হইলেও খুবই নির্বোধ নন—বুঝিতে তার বিলম্ব হয় নাই যে, লোকটার পরসেবাবৃত্তি অর্থাৎ দাস্যই প্রবল।

প্রত্যহই আসিবার পুনরায় আহ্বানে গুরুদয়াল বিগলিত হইয়া একেবারে গলিয়া পড়িলো—তার উপর জলযোগের দ্বারা আপ্যায়নে তার নিজকে কত যে ধন্য মনে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাই নাই···গদগদ কৃতার্থ হইয়া সে বলিলো,—যে আজ্ঞে আসবো।

—হ্যাঁ, এসো।

'আপনি' হইতে 'তুমিতে' ঝম্পপ্রদান গুরুদয়াল অনুভবই করিতে পারিলো না।

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরান্নের গ্রাস ভয়ে-ভয়ে আর অরুচির সঙ্গে মুখে তুলিতে হইলে যে অধঃপতন ঘটে, গুরুদয়াল এবং তার নূতন বন্ধু চন্দ্রশেখর তাহা টের না পাইলেও, তাহাই তার ঘটিয়াছে।·· মর্মে মর্মে অনুভূত আর অনিশ্চিত পর-প্রত্যাশী পরম দারিদ্র্যের যে কুফল এ তারই অভিব্যক্তি—গুরুদয়ালের মনে হয়, আর সে জানাইতে চায়, সে সবারই ভৃত্য, কৃপাজীবী।

গুরুদয়ালের হাতে সঞ্চিত পয়সা-কড়ি কিছুই নাই—উপার্জনও নাই। মাতুলান্নেই চিরদিন সে প্রতিপালিত হইতেছিল—মাতুলই তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নেহাৎ ক্লিষ্ট মুখে বহন করিতেছিলেন·· কিন্তু সম্প্রতি কন্যার বিবাহ দিয়া কিছু ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজন এবং দুর্ভাবনা হইয়াছে—তিনি বোঝার উপর হইতে শাকের আঁটিটাকে নামাইয়া দিয়াছেন। মাতুল বলিয়াছেন যে, থাকিবার স্থান দিতে তিনি অবশ্যই সম্মত আছেন, কিন্তু নগদ খরচ তিনি করিতে পারিবেন না—না পারার ক্লেশ অসহনীয় হইলেও তিনি নিরুপায়, কারণ, ভদ্রাসন রক্ষা করিতে হইলে ঋণপরিশোধ তাঁহাকে করিতেই হইবে।··· স্পষ্ট কথা বলিয়া দিয়া গুরুদয়ালের মাতুল অনঙ্গমোহন হাল্কা হইয়াছেন। মাতুলানীর অল্প-স্বল্প গোপন স্নেহ ব্যতীত গুরুদয়ালের দ্বিতীয় সম্বল নাই।

সুতরাং কিছু উপার্জনের আশায় গুরুদয়াল এক্ষণে 'চারি চতুর্দিকে' সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে···বেড়াইতে-বেড়াইতে হাওড়ার পুলের উপর সে কেন আসিয়াছিল তাহা সে-ও জানে না—প্রবল বায়ু ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই·· তারপর কেমন করিয়া এবং কেন সে হাওড়া স্টেশনের মতো হুড়হাঙ্গামার স্থানে উপনীত হইয়াছিল, ভাবিতে গেলে, সেও এক রহস্য বৈকি; কিন্তু মেঘের মাথায় রজত রেখার মতো তার নিরুদ্দেশ ভ্রমণান্ধকারের সীমায় দেখা দিলেন চন্দ্রশেখর—তার শুভ হইল, অর্থাৎ ধনী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার পূর্বোক্তরূপে সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়া গেল।

চন্দ্রশেখর ধনী—সর্ববাদীসম্মতরূপে ধনী; বাড়ির গাড়ি আছে, খান পাঁচেক বাড়ি আছে—মাসে মাসে যে বাড়ি-ভাড়া আদায় হয় তাহাই তের, নগদ টাকা কত আছে তাহা সঠিক কেহ জানে না—সবাই অনুমান করে যে, প্রচুরই আছে।

সুতরাং দরিদ্র গুরুদয়ালের প্রতি ধনী চন্দ্রশেখরের এই প্রীতির সঞ্চার অর্থাৎ নেকনজর, শুভ বলিতে হইবে--নিজের অবস্থা গুরুদয়াল অকপটে বলিয়াছে।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করেন,—গুরুদয়াল তোমার মামাবাড়ির খবর কি?

গুরুদয়াল বলে,—আজ্ঞে, ভালোই আছেন সবাই।

চন্দ্রশেখর চোখ বড়ো করিয়া গুরুদয়ালের মুখের দিকে তাকাইয়া কী যেন ভাবেন…তারপর ঘাড় আরও খানিক খাড়া করিয়া বলেন,—মামার বাড়ি, আদর ভারি, মধুর হাঁড়ি—আচ্ছা, তুমি কেমন কবি দেখি—চট্ ক'রে আর এক লাইন মিলিয়ে দাও দেখি !

গুরুদয়াল আসিয়া থপ্ করিয়া মেঝেতেই বসিয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতেই সহজ ভাবে হাসিয়া সে বলিলো,—আমি তো কবি নই, বাবু ! তবে আপনি যখন বলছেন তখন ভেবে দেখি।

—দ্যাখো।

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন,—হ'লো হে ? তুমি বড়ো স্লো কবি। এসব ব্যাপার সঙ্গে-সঙ্গে না হ'লে রস মাটি হয়।

—হয়েছে।

শুনিয়া চন্দ্রশেখর গা-ঝাড়া দিয়া উৎকর্ণ হইলেন…গুরুদয়াল একটু থম্‌কিয়া থাকিয়া স্বীয় রচনাটা মনে-মনে আওড়াইয়া লইলো, তারপর বলিলো,—দুধ গড়ায় এই ভাগনে বেটার ব'য়ে গোঁফ দাড়ি।

চন্দ্রশেখর লাফাইতে লাগিলেন ঃ বা বা, বহুৎ আচ্ছা। আশাই করিনি যে, তুমি পারবে। ভারি সুন্দর হয়েছে। সত্যি, ভারি সুন্দর হয়েছে।

গুরুদয়াল নিজের কৃতিত্বে আর বাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জায় লাল হইয়া মাটির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গেল…এবং চন্দ্রশেখরের মনে হইল, তিনি যেন গৌড়াধিপতি কিংবা বিক্রমাদিত্য—তাঁর সভায় দেশদেশান্তরাগত কবিগণের রচনাশক্তির পরীক্ষায় তাঁহারই সভাকবির জয় হইয়াছে…মনে হইতেই তৎক্ষণাৎ তিনি পকেটে হাত ভরিয়া দুটি টাকা বাহির করিয়া ঝম্ করিয়া গুরুদয়ালের সামনে ফেলিয়া দিলেন ; বলিলেন,—নাও পুরস্কার দিলাম। বলিয়া মাথা তুলিয়া তাকাইয়া রহিলেন…

গুরুদয়াল তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইয়া বদান্যবরের পদধূলি গ্রহণ করিলো। সূর্যের উত্তাপ গ্রহণে সূর্যের যেমন আপত্তি নাই, অনুকম্পাপ্রার্থী কেহ ভক্তিভরে পদধূলি লইলে চন্দ্রশেখরের তেমনি আপত্তি নাই।

শক্তির পরিচয় পাইয়া চন্দ্রশেখর আজ গুরুদয়ালকে পুরস্কৃত করিয়াছেন

ধন্য ম৻

'রটা দেখাইল সেই রকমই—ভারি উত্তম ; কিন্তু তার মনে যথেষ্ট পাপ

আজ্ঞে আস৻

'পুরস্কার দিলাম' বলিয়া টাকা দুটো নিক্ষেপ করিয়াই তাঁর মনে

—হ্যাঁ, এসে

গিলো এই কথাই যে, অভাবীকে ভিক্ষা দিলাম।…মনে মনে অনেকটা

'আপনি' হইত

চন্দ্রশেখর বলিলেন, মামাকে দেবে এই টাকা ?

না।

গুরুদাস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দিবে। বলিলো,—না দিলে নিমকহারামি হবে, বাবু। বলিয়া অতিশয় উৎফুল্ল চোখে বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলো—আর বাবুর মনে হইতে লাগিলো, পদপ্রান্তে বসিয়া আর প্রদীপ জ্বালিয়া লোকটা তাঁহার আরতি করিতেছে··

অর্চনাটা চন্দ্রশেখরের খুব ভালো লাগে, আর নিজেকে অভ্রভেদী মনে হয়।

সেদিন চন্দ্রশেখর বলিলেন,—ওহে দয়াল, গিন্নি তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন·

শুনিয়া গুরুদয়াল পুনরায় লজ্জায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়া একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলে গুরুদয়াল অমনি করে—যতোবার তা' ঘটে ততোবারই সে অমনিই করে।

গুরুদয়ালের লজ্জারুণ মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের মনে হইলো, লোকটাকে ভারি উপকৃত করা হইয়াছে।···বলিলেন, বখ্‌শিশ কিছু চাও, দয়াল? গিন্নি খুশি হয়েছেন, এই আমার পুরস্কার কিন্তু তোমার তো কিছু চাই। চাও?

বলা বাহুল্য, গুরুদয়ালের অধিকতর অবনতি ঘটিয়াছে। মনে-মনেও হাত পাতিতে সে পারিতো না, কিন্তু আজ 'চাও' বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রশ্ন করিতেই সে লোলুপ হইয়া উঠিলো··

বলিলো,—পুরস্কার কিছু চাইনে, বাবু। গিন্নি মা খুশি হয়েছেন, শুনেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছি, তবে দান পেলে কৃতার্থ হবো।

চন্দ্রশেখর যে-দান দয়াবশত অযাচিতই করিতেন তাহাও যে অনাবিল প্রেম নয়, ভিক্ষাই, এ-সত্য গুরুদয়ালের মনে স্বচ্ছ একটা রূপ লইয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে···আগে 'অযাচিত দান' লইতেই তার কুণ্ঠা আসিতো, কিন্তু ওদিকে মাতুল রহিয়াছেন—তাঁহার চাহিদা পূরণ করিতেই হইবে···গুরুদয়াল বাধ্য হইয়া প্রতিবিম্বটাকে আবৃত করিয়া ধরিতো—টাকাটা-সিকিটা যা-বাবু সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিতেন তাহা সে মুখের ছায়া গোপন করিয়া কুড়াইয়া লইয়া যাইতো, কিন্তু আজ সে অবাধ কণ্ঠে চাহিয়াই বসিলো।

কিন্তু চন্দ্রশেখর আরো পরিচর্যা চান, বলিলেন,—দেবো। কিন্তু শুনে আমি খুব হাসবো এমন গল্প জানো তুমি।

গুরুদয়াল বলিতে পারিলো না যে, কেমন ধারা গল্প শুনিয়া তিনি হাসিবেন তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে?···গুরুদয়ালের বুক কাঁপিতে লাগিলো—যদি না পারে!···বলিলো,—চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, বাবু।

বাবু বলিলেন,—করো দেখি তো চেষ্টা।···এই আমি গম্ভীর হ'য়ে

বসলাম—হাসাও দেখি। বলিয়া ঠোঁটের খুব শক্ত করিয়া চাপ দিয়া চন্দ্রশেখর গম্ভীর হইয়া রহিলেন।···

এ-প্রস্তাব খুব হৃদ্য প্রস্তাব—অনুগ্রহজীবীর কাছে ধনী ব্যক্তি যে এই প্রস্তাব করিয়াছেন ইহা খুবই উদারতা, আত্মভোলার পরমানন্দ, সন্দেহ নাই ; কাজেই গুরুদয়াল কৃতার্থ হইলো যতো, চন্দ্রশেখরের সেই অতুলনীয় আর পূজনীয় গাম্ভীর্যের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলো ততো—বিনয়ের ভারে তার মেরুদণ্ডই বেঁকিয়া গেল···

বলিলো,—কিন্তু একটু ইয়ে হবে, বাবু···

—কিয়ে হবে ?

—একটুখানি, অর্থাৎ কথাগুলো ঠিক শ্রাব্য হবে না।

—খেপেছো। এযুগে অশ্রাব্য কথা নেই, তা-ও জানো না ? বলো তুমি—কিন্তু হাসানো চাই। না হাসাতে পারলে তোমার জরিমানা হবে।

শুনিয়া গুরুদয়ালের অল্পে-অল্পে স্ফূর্তি জাগে—সেই গল্পটা বলিতে শুরু করে—গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা, যাতে গোপাল নিজের স্ত্রীকে লেবু তুলিতে পাঠাইয়া জামাইয়ের কাছে বিষম অপ্রস্তুতে ফেলিতেছে···প্রথমটায় চন্দ্রশেখরের একেবারেই হাসি পাইলো না···তারপর দেখা গেল, ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যভাগে যেন টান পড়িতেছে, ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হইতেছে—তারপর তাঁর স্থূল গণ্ডে টোল দেখা দিলো···

তারপর গল্পের উপসংহার হইতেই অর্থাৎ গোপালের জামাই গোপালের স্ত্রীকে চোর মনে করিয়া অন্ধকারে যেখানে জড়াইয়া ধরিয়াছে সেইখানে আসিতেই, চন্দ্রশেখর না হাসিবার সঙ্কল্পে অটুট থাকিতে মুহূর্ত দুই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ফাটিয়া পড়িলেন—হাসি তাঁর আবদ্ধ দম বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলো···সে হাসি আর ফুরায় না—এমন বেদম হাসি তিনি কখনোই হাসেন নাই···

কিন্তু এক সময় তাঁর এ হাসিও ফুরাইল—ফুরাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, স্ত্রীকে গল্পটা শুনাইতে নয়, টাকা আনিতে···টাকা লইয়া চন্দ্রশেখর ফিরিলেনও তাড়াতাড়ি আর হাসিতে হাসিতে···

পাঁচটি টাকা তিনি গুরুদয়ালের গল্পের দরুন বখশিশ দিলেন, কিন্তু ছুঁড়িয়া দিলেন না, গুরুদয়ালের যুক্ত করতলের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

গুরুদয়াল তাঁর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলো···বহুশ্রুত এক গল্পের জন্য পাঁচ টাকা ! বাবুর দিবারই ইচ্ছা ছিলো—গল্প বলিয়া হাসাইবার পরীক্ষাটা

বাবুর ক্রীডামোহ একটু। এতো অনুগ্রহ! গুরুদয়ালের মুক্তকর অনেকক্ষণ একোদ্দিষ্ট হইয়া যুক্ত হইয়া রহিলো।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষেরই অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল খারাপ। এক পক্ষ অনুগ্রহ করিতেছে, অপর পক্ষ তা গ্রহণ করিতেছে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ইহার চাইতে ভালো—কাজের মূল্য কি সেবার মূল্য নগদ-নগদ লওয়ায় অন্তরে-অন্তরে বোঝাপডা হইয়া ব্যাপাব চুকিয়া যায়—অনিষ্ট কিছু ঘটে না, কষ্টপূর্বক এতোটা জের টানিয়া তা চলে না, কিন্তু যেখানে বন্ধুত্ব নাই, স্পষ্টাক্ষরে ভিক্ষা দেওয়া নাই, দারিদ্র্যের প্রতি করুণা নাই, কেবল আছে মানুষকে ভ'ডায় খাটাইবার প্রয়াস আর সম্পর্ক, সেখানে অন্তরের অকুশলী মিথ্যাচার শাস্তি একদিন পাইবেই।…চিত্তরঞ্জন আর অবসর বিনোদনের জন্য একটি ব্যক্তিকে প্রলোভনে বন্দী করিয়া রাখার ভিতর যে নির্মম উল্লাস আর ক্ষুদ্রতা আছে তাহা একদিন হতাশ হইতে বাধ্য।

গুরুদয়াল একদিন বড়ো বিমর্ষ হইয়া দেখা দিলো—চন্দ্রশেখর তা লক্ষ করিলেন না, বলিলেন—এসো।…তোমার উপর বড়ো মায়া বসেছে হে! যতোক্ষণ না আসো ভারি ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

ফাঁকা-ফাঁকা লাগে সত্যই, কিন্তু তা প্রেমাস্পদের অভাবে নয়—কেহ নিম্ন ভূমি হইতে ঊর্ধ্বপানে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে না বলিয়া।

গুরুদয়াল তা বুঝিলো না—

বলিলো,—বাবুর অশেষ অনুগ্রহ।

—অনুগ্রহ তো বটেই! একটা জামা কিনবে বলেছিলে না?

—বলেছিলাম, বাবু।

—কত হ'লে হয় একটা?

—সিকে পাঁচেক।

—এই নাও দেড় টাকা। বলিয়া টাকা দেডটি করতলের উপর নাচাইতে লাগিলেন, বলিলেন,—কিনে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে…

গুরুদয়াল নৃত্যশীল টাকার দিকে লুব্ধচক্ষে চাহিয়া খানিক ইতস্তত করিয়া বলিলো,—তা যাবো। কিন্তু আমার অন্যত্র যাবার একটু তাড়াতাড়ি আছে, বাবু।

—কোথায় যাবে হে? তোমার তো ত্রিসংসারে কেউ নেই!

—না থাকারই মধ্যে। বিধবা এক মাসি আছে—উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু সেই মাসিই হঠাৎ চিঠি লিখেছে দেখা করতে—খুব দিব্যি দিয়ে-দিয়ে চিঠি লিখেছে। অসুখ তার।

—যাবে না কি?

—যাবো মনে করছি। চিঠিখানা প'ড়ে ভারি কষ্ট পেয়েছি।...আপনি অনুমতি করুন।

—তা যাও; কিন্তু দু'দিন—তার বেশি দেরি ক'রো না যেন। তোমার গিন্নি মায়ের গায়ের কাপড একখানা কিনতে হবে—আড়াইশো টাকা এস্টিমেট। গিন্নি বলছেন, গুরুদয়ালকে সঙ্গে না নিয়ে খবরদার নিজে ওস্তাদি ক'রে কিনতে যেও না—আমার পছন্দসই জিনিশ কিনতেও পারবে না, দামেও ঠকবে।

গিন্নি মায়ের এই স্নেহের পরিচয়ে গুরুদয়ালের চোখ ভিজিয়া উঠিলো; বলিলো,—গিন্নিমা আমার যথার্থই মা; পুত্রের প্রতি তাঁর অশেষ স্নেহ কৃপা।...ফিরে এসেই আমি আপনার সঙ্গে বেরুবো। দামি জিনিশ, দশ দোকান ঘুরে দেখে-শুনে কিনতে হবে বৈ কি!

—তা হ'লে এসো কিন্তু শিগগিরই। পথ খরচা কিছু চাই নাকি?

গুরুদয়াল কথা কহিলো না—নখ খুঁটিতে লাগিলো...চন্দ্রশেখর হাসিয়া বলিলেন,—হ'লে হয়, না? কত দূর সে জায়গা?

—অজয়ের ধারে মানদপুর।

—মরুকগে, অতো পরিচয়ে আমার কাজ কি!...এই তিনটে টাকা নিয়ে যাও—জামাটাও এর ভেতর থেকেই কিনে নিও।

'যে আজ্ঞে।' বলিয়া টাকা তিনটি হাত পাতিয়া লইয়া আর শীঘ্র ফিরিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং বাবুর চরণে প্রণত হইয়া গুরুদয়াল চলিয়া গেল। চন্দ্রশেখর উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন—দুদিনের স্থলে সাত দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তবু গুরুদয়ালের দেখা নাই। চন্দ্রশেখরের মন একটা শূন্যতার মাঝে পড়িয়া আইঢাই করিতেছে।

সেদিনও একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল—চন্দ্রশেখর তার কন্যাদায়ে নিষ্কৃতি দিতে 'যৎকিঞ্চিৎ পাঁচটি টাকা' তাহাকে দান করিয়াছেন।...খঞ্জ অন্ধ ভিক্ষুক আসে—তাহাদেরও দুটি-একটি পয়সা তিনি না দেন এমন নয়; বাবাজি গান শুনায়—তাহাকেও কিছু তিনি দান করেন; কিন্তু এমনি ভাবে দান করিয়া তার মন ভরিতেছে না। দাতা ও গ্রহীতার মাঝে ছেদ-রেখা পড়িয়া দান যদি সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্পন্ন হইয়া যায়—দরিদ্র যদি দানের রেশ না টানিয়া রাখে—তবে সে-দানের উপভোগ্যতা দাতার পক্ষে এতো কমিয়া যায় যে, পরক্ষণেই তার আর স্বাদই মেলে না।...ওরাও ভিক্ষা পাইয়া গালভরা কথায় প্রচুর আশীর্বাদ করে,

কিন্তু তাহা নিছক মৌখিক বলিয়াই মনে ছাপ পড়ে না; কিন্তু গুরুদয়ালকে ভিক্ষা দেওয়ার ফল আলাদা···সে দিবা-রাত্র তার ধ্যান আরাধনা করে—অবিরাম মুখের দিকে তাকাইয়া সে তাহারই ক্ষীণতম প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া থাকে।···অন্যান্য খুচরা ভিক্ষার্থীর দশ দরজায় স্থান আছে, কিন্তু গুরুদয়ালের তিনি একা।·· ভাবিতে-ভাবিতে চন্দ্রশেখর সর্বান্তঃকরণে স্ফীত হইতে থাকেন—নিজেকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়।···এই সব কারণে গুরুদয়ালের উপস্থিতির অভাবে চন্দ্রশেখরের নিদারুণ কষ্ট হইতেছে—মনে হইতেছে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার কেহ নাই—তিনি হারাইয়া গেছেন।

আটদিনের দিন চন্দ্রশেখর অতিষ্ঠ হইয়া বাহিরের দরজায় যাইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন···তবু গুরুদয়াল আসিলো না, কিন্তু আসিলো সে সেইদিনই।

গুরুদয়াল ঘরে ঢুকিয়া দেখিলো, বাবু যথাস্থানে বসিয়া আছেন—মুখ বিমর্ষ, বিমর্ষ চক্ষু দুটি মেলিয়া বাবু তাহাকে দেখিলেনও, কিন্তু কথা কহিলেন না—বাবু রাগ করিয়াছেন—তাঁহাকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় রাখিয়া কষ্ট দেওয়ায় তিনি নিদারুণ অভিমান করিয়াছেন।···কিন্তু অভিমান কতক্ষণ! বাবুর অভিমান শূন্যে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের মতো দ্রুত অবতরণশীল—জলের তিলকের মতো তা ক্ষণস্থায়ী। গুরুদয়াল যাইয়া চরণে প্রণত হইতেই তিনি প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—এলে? ভেবে মরি তোমার জন্যে। এতো দেরি হ'লো যে?

প্রশ্ন একেবারেই মধুময়—গুরুদয়ালের তৃষিত হৃদয়-আধার পরিপূর্ণ করিয়া রুদ্ধ প্রীতি ঢালিয়া পড়িলো·· বাবুকে কষ্ট দিয়াছে মনে করিয়া অপরাধের জ্ঞানে কাতর হইয়া ছলছল চক্ষে গুরুদয়াল জিজ্ঞাসা করিলো, বাবুর শরীর ভালো আছে?

—হুঁ।

—গিন্নি মা?

—ভালো আছেন।—তিনিই তো অস্থির ক'রে তুলেছিলেন বেশি। তাঁর ব্যাপার কেনা মুলতুবি আছে।

—যে আজ্ঞে। খোকাখুকুরা ভালো আছে?

—আছে।

তারপর বহুদিন অদর্শনের পর সাক্ষাৎ বলিয়া চন্দ্রশেখর গুরুদয়ালকে আজ বিশেষভাবে সম্মানিত করিলেন;

বলিলেন,—দাঁড়িয়েই কথা বলছো—ব'সো।

গুরুদয়াল তার জায়গায়, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ দূরবর্তী বেঞ্চিতে বসিলো—

চন্দ্রশেখর জানিতে চাহিলেন,—মাসি-মাসি ক'রে সেদিন দৌড়ে পালালে—কেমন মাসি?

—মায়ের সোদর বোন।

—বটে! কী দরকারে ডেকেছিলেন? ভারি জরুরি ডাক মনে হ'লো?

—অসুখ হয়েছিল খুব।

—বটে! কেমন আছেন এখন?

—মারা গেছেন।

—বটে! মারা গেছেন! আ হা হা।

পুনঃপুনঃ বটে শব্দটা চন্দ্রশেখর প্রয়োগ করিতেছেন—ওটা নূতন অভ্যস্ত মুদ্রাদোষ নয়—আশ্রিত অনাথ ব্যক্তির প্রতি প্রশ্রয়ের ভাব প্রকাশের নব আবিষ্কৃত ভঙ্গি উহা···

প্রশ্রয় পাইয়া গুরুদয়াল পুনরায় বলিল,—আজ্ঞে, হ্যাঁ। দিন সাতেক ভুগেই তিনি মারা গেছেন।

—বটে? তা' তোমাকে ডেকেছিলেন কেন?

—অন্তিমকালে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। নিঃসন্তান ছিলেন—আমিই মুখাগ্নি করলাম।

—তাই নাকি? উত্তম। ঐটুকুই লাভ—অধিকারী হ'তে হয় কিনা! তারপর?

—কিছু টাকা হাতে ছিলো; আমাকেই তা' দিয়ে গেছেন।

—বটে! কত?

—হাজার তিনেক।

বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে চমকপ্রদ ক্ষিপ্রতার সহিত পট পরিবর্তন ঘটিলো··· চন্দ্রশেখর চমকিয়া খাড়া আর শক্ত হইয়া উঠিলেন·· তারপরই তাঁর মুখ শুকাইয়া উঠিতে লাগিলো—তাঁহাকে যেন সহসা কেন্দ্রচ্যুত আর আশ্রয়ভ্রষ্ট নিরালম্ব করিয়া তাঁহার অধিকারের-বাহিরে একটা স্থানে কেউ দাঁড় করাইয়া দিয়াছে··· সেখানে তিনি অতিশয় ক্ষুদ্র।—তারপর চন্দ্রশেখরের ললাটে ভ্রূভঙ্গি দেখা দিলো; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—তবে আর এখানে কেন? কেন এসেছো? চ'লে যাও—আর এসো না।

গুরুদয়াল এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভারি বিব্রত আর অবাক হইলো—বাবু অকারণে রুষ্ট হইয়া এমন রূঢ়ভাবে বিদায় দেওয়ায় ব্যথিতও হইলো···এবং অভ্যাসমতো বলিলো,—যে আজ্ঞে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রোজ আনে রোজ খায়, এ-কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে ; কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয় এবং রোজ যাহা খায় তাহা পুরাপুরি নহে।

দুই ভাই—কাশী আর শশী। শশী ছোটো এবং খঞ্জ, সন্তান সংখ্যা তারই বেশি। কাশীর একটি কন্যা, দুটি পুত্র ; শশীর দুটি পুত্র, দুটি কন্যা। এই একটি বেশির দরুন শশীর আন্তরিক লজ্জা কুণ্ঠা কিছু নাই ; তার মনে-মনে সে ষষ্ঠীর কৃপা আর চায় না। অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে ইহাদের, সংসার-সম্ভোগের আনন্দ আর পরিবেশোৎসব নষ্ট হইয়া গেছে। বউয়েরা তো আছেই—ভগিনীটি বিধবা হইয়া একটি পুত্রসহ ভাইয়েদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহারাও খায় এবং পরে—সুতরাং তাহাদের বাবদ খরচ আছে। এই দরিদ্র পরিবারের কর্তা কাশী ; সংসার প্রতিপালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব তাহারই। প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া ওঠে—অনাহারে ফেলিয়া রাখিবার উহারা কেহই নহে।

একটি গোরু ইহাদের ছিলো—বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী অবস্থায় ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিতো কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড়কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে—গৃহ-পালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে—বঞ্চিত করিতে যতোটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।

শাকপাতা কুড়াইয়া তাহাদের আংশিক উদরপূর্তি চলে, ইহা মিথ্যা নহে, বিস্ময়ের বিষয়ও নহে। দু-ভাইয়ের যা উপার্জন—ধন এবং ধান্য—তাহা সামান্য—পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য, প্রয়োজনের হিশাবেও সামান্য। অনন্ত পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ ধান্য তাহারা ঘরে তোলে তাহা অত্যন্ত কঠিন কৃপণের মতো বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াও বড়ো জোর পাঁচ মাস চলে ; একটি ধান দৈবাৎ উঠানে পড়িয়া থাকিলে সেই অপচয়ে কাশী আর শশী রাগিয়া আগুন হইয়া যায় ; চোখ বাড়াইয়া গাল দেয় : 'লক্ষ্মীছাড়ার দল।'

ধন উপার্জন করিতে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। বলিতে কি, খঞ্জ শশী দূরবর্তী পল্লি অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়তে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা—কাশী ছাড়া আর কেহ তা জানে না। কিন্তু

এই চাল বিক্রয়ের ব্যাপারটা বড়োই লোকসানের। আড়তের কয়েল রজনী হাজরা হৃদয়হীন অতি-হিশাবি চতুর লোক—ন্যায্য ভাবে ওজন করিয়া সঠিক মূল্যের পুরা প্রাপ্তির জন্যই শশীকে হাত জুড়িতে হয় অনেকবার—অন্নাভাবের অজুহাতে স্বয়ং রজনী কয়েলের এবং তার পরলোকগত বাপ-মায়ের দোহাই পাড়িয়া অনেক কাতরোক্তি তোশামোদ করিতে হয়—কিন্তু ফল হয় না; প্রবঞ্চক আর প্রভুভক্ত রজনী হাজরা যেন পণ করিয়া আছে, খঞ্জ ভিখারী শশীকে সে দামে ওজনে ঠকাইবেই।

যথোচিত প্রাপ্য না পাইয়া আর রজনীর নির্লজ্জতায় শশীর রক্ত বৃথাই উত্তপ্ত হইয়া উঠে—রজনীর তুমুল কর্মতৎপরতায়, অর্থাৎ চিৎকারে তার পাগল-পাগল ঠেকে।

লোক-খাটাইবার লোক অনেক আছে, এবং লোক-খাটাইবার লোক খুঁজিবার পথও অনেক আছে—তবু হঠাৎ এমন হয় যে, খাটিবার লোক খাটাইবার লোককে খুঁজিয়া পায় না। এমন বেকার অবস্থা মাঝে-মাঝে আসে বলিয়া কাশীদের আয়-আমদানি তেমন ভাবে একটানা আর প্রচুর নহে যাহাতে সম্পূর্ণ মিটিয়া মনে হয় দিন ভালোই যাইতেছে।

পাঁঠা কিনিয়া তাহার মাংসের ভাগ এবং চামড়া বিক্রয় দু-একবার করা হইয়াছিল, কিছু লাভ দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু তাদের এ-ব্যাবসা শুভক্ষণে শুরু হয় নাই—বাধা পড়িলো। তাহাদের বড়ো আদরের আর মমতার পাত্রী বিধবা ভগিনীটি এই নৃশংসতায় হঠাৎ একদিন আতঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠায় এবং প্রবোধ না মানায় তাহারা ঐ লাভজনক জীবহত্যার পথটা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দিফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।

তাহাদের জীবনে ঘটনা নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য কি দিক-পরিবর্তন নাই; কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটিলো—তাহা বর নয়, অভয় নয়, অভিসম্পাত নয়, নির্জীব স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বুদ্বুদ যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেলো—দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অঙ্গ তাহা নহে।

কাশীর ছেলে বিশু বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—বয়স দশ হইবে; তার দু-ভায়ের ছেলে-মেয়ে জন্মিয়াছে একবার এর একবার ওর, যেন পালা করিয়া।

ছেলে-মেয়েরা দরিদ্রের সন্তান, তাহাদের খেলাধুলাও দরিদ্রোচিত—একটা কাঠির মাথায় খানিক ন্যাকড়া বাঁধিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই

তাহাদের খেলা চমৎকার জমিয়া ওঠে। খানিক খানিক ধুলা হাতে করিয়া ছিটাইয়া-ছিটাইয়া পরস্পরের গায়ে দিতে পারিলেই তাহাদের মনে হয়, এ খেলাও ভালোই। ধুলা যদি ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া অন্যদিকে যায় তবে তো আরো আনন্দ।

কাশীদের বাড়ীর কঞ্চির ফটক খুলিয়া বাহির হইলেই একটু স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া যায়—স্থানটি দূর্বামণ্ডিত কিন্তু সব সঙ্কীর্ণ। তার পরেই কাঁচা পা-পথ—মানুষ চলে; এবং পাড়ার ভিতর বহু সংখ্যক গোরু-বাছুর ঐ পথে মাঠে চরিতে যায়, এবং চরিয়া ঘরে ফেরে। সুতরাং তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে শুকনো মাটি গুঁড়া হইয়া পথের ধুলা বিস্তর—দেড় আঙুল পুরু হইয়া ধুলা আগাগোড়া জমিয়া থাকে।

কাজেই কাশীর এবং শশীর ছেলে-মেয়েদের সুলভে খেলার বেশ সুবিধা আছে। তাহারা পথের ঐ ধুলার উপরেই খেলিতে বসিয়া যায়—ধুলা জড়ো করে, ধুলা উড়ায়, অঞ্জলি ভরিয়া ধুলা তুলিয়া আঙুলের ফাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয়—নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হাতের ধুলা মাটিতে পড়িতে থাকে। এক একবার ধুলা জড়ো করিয়া তার উপর হাত চাপড়াইয়া শক্ত করে; তারপর আঙুল ঢুকাইয়া ধুলার ঢিপির গায়ে করে অসংখ্য ছিদ্র, চারিদিকে ধুলার বাঁধ দিয়া একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়, আর সবাই মিলিয়া সেখানে করতলের ছাপ বসায়, বাঁধের ধুলায় বটের পাতা গুঁজিয়া-গুঁজিয়া দেয়, এবং নিজেরাই সেই কৃতিত্ব আর শোভা অবাক হইয়া দেখে; পথিকের ধমক খায়; গোরুর পাল আসিতে থাকিলে পলায়ন করে···

কিন্তু একদিন বড়ো লাভ হইয়া গেলো।

কাশীর ছেলে এবং মেয়ে, যথাক্রমে বিশু ও নারানী যথারীতি পথের ধুলায় উপস্থিত; শশীর ছেলে এবং মেয়েরা যথাক্রমে রসো এবং দাসী ও হাসিও আসিয়াছে।

আজ খেলা হইতেছে ধুলা ছাঁকার।

হাসি পথের উপর আড় হইয়া পড়িয়া খেলায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল; অধিনায়ক বিশু তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টানিয়া লইয়া তফাতে দূর্বার উপর বসাইয়া দিয়াছে; সেখানে বসিয়া সে অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া থামিয়া আর টানিয়া-টানিয়া কাঁদিতেছে।

উহাদের খেলা এখন নির্বিঘ্নে চলিতেছে। ধুলা আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া দুই করতলের সংযোগস্থলটি একটুখানি ফাঁক করিয়া ধুলা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—

ধুলা সমস্তটা মাটিতে পড়িয়া সকলের পরে নিঃশেষ কাহার হয় প্রতিযোগিতা চলিতেছে তারই···

বিশুই দু-বার জিতিয়াছে, প্রধান বলিয়া কতকটা গায়ের জোরেই।

শশীর পুত্র রসো বলিলো, 'এখানকার ধুলা ভালো নয়, ভাই।' বলিয়া সে খানিক সরিয়া বসিলো। এবার সে যেন একটু নির্লিপ্ত—পাল্লা দিবার উৎসাহ তেমন নাই। আপন মনেই ধুলা ছাঁকিতে-ছাঁকিতে তৃতীয়বার ধুলা ঝাড়িয়া ফুরাইবার পরই সে হঠাৎ ডান হাতটা মুঠা বাঁধিয়া বাঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—বাড়ির ভিতর গেলো না, গেলো অন্য দিকে।

—কীরে?—বলিয়া বিশু যখন লাফাইয়া উঠিলো, তখন রসো বহু দূরে চলিয়া গেছে, কিংবা কাছেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে আর দেখা গেলো না।

সূর্যাস্তের তখন বেশি বিলম্ব নাই। ছোটো বোন দুটিকে বাড়ির ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বিশু রসোর সন্ধানে গেলো; কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইলো ঢের: সাত-আটটা বাড়ির চারিদিকে এবং অভ্যন্তর—কিন্তু বৃথা; রসো কাহারো বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। পাড়ারই মথুর এবং তোষিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো; তাহারা বলিলো যে, রসোকে তাহারা দেখে নাই।

বিশু বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া 'রসো' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলো—রসোর সাড়া পাওয়া গেলো না। কিন্তু রসো তো আকাশে উড়িয়া যায় নাই, ডোবার জলে ডুবিয়াও লুকাইয়া নাই। এদিক-ওদিক তাকাইতে-তাকাইতে হঠাৎ বিশুর নজরে পড়লো সন্ধ্যামণি বোষ্টমির বাড়ির লাগাও তালগাছটার আড়ালে কে যেন রহিয়াছে—একখানা কালো হাত দেখা যাইতেছে···

বিশু পা টিপিয়া-টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলো। তালগাছের নিকটবর্তী হইয়াই সে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভীতিপ্রদ শব্দ করিয়া রসোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলো—যেন দৈত্য রসোকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সেই শব্দে এবং আবির্ভাবে রসো চমকিয়া উঠিয়াই ডান হাতটা তাড়াতাড়ি পিছন দিকে লইলো যেন পিছন দিকে হাত লইলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে—সে হাত সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিবার সাধ্য বা বুদ্ধি কাহারও নাই!

বিশু বলিলো—দেখি তোর হাতে কী!

বিশুর পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল, কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার বটে।

রসো বলিলো,—কিছু না। ঘাঁটিও না বলছি।

বিশু বলিলো;—বাড়ি আয়। বাবা তোকে ডাকছে।

—আমি এখন যাবো না।

—তবে দেখা, তোর হাতে কী রয়েছে।

—তোর মাথা···

—মার খাবি বলছি। বলিয়া বিশু তার লুকানো হাতের দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে যাইতেই রসো ঘুরিয়া দাঁড়াইল; এবং তারপর ক্রমাগত সেই ডান হাতখানাকে সম্মুখে আনা আর পশ্চাতে লওয়ার আবর্তন শুরু হইয়া গেলো। কিন্তু বিশুর বুদ্ধি তখন সজাগ বেশি। সে একবার কায়দা করিয়া রসোর ডান হাতের উপর ডানা চাপিয়া ধরিতেই তাহা শরীরের উপর আক্রমণে দাঁড়াইয়া গেলো, রসো শরীর মুচড়াইয়া-দুমড়াইয়া এমন করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলো যে, সন্ধ্যামণি বোষ্টমি, মথুর গাড়োয়ান, বিরিঞ্চি গরাই প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যক্তিগণ তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিলো, ব্যাপারটা কী! সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে না যাইয়া ওরা করিতেছে কী!

কিন্তু ঐ মানুষগুলি কাহারো সুহৃদ নহে—তাহারা সান্ত্বনা দিতে জানে না, বিচারের ধার ধারে না, কেবল 'কে রে?' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ছেলেমানুষের পেটের প্লীহা চমকাইয়া দিতে পারে। তাহারা করিলোও তাই—বিবদমান ছেলে দুটিকে তাহারা ধমকাইয়া কাবু করিয়া দিলো এবং অভাবনীয় প্রহারের ভয় দেখাইয়া অবস্থা এমন গুরুতর করিয়া তুলিলো যে, নিজের কর্তৃত্ব তুলিয়া অভিভাবকগণের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া ছাড়া বিশুর গত্যন্তর রহিলো না।

রসোর হাত ধরিয়া বিশু অভিভাবকগণের উদ্দেশেই যাত্রা করিলো—চলিতে-চলিতে পথে মাত্র একটি কথা হইলো: বিশু বলিলো,—বল না ভাই, তোর হাতে কী?

বিশুর প্রশ্ন রসো গ্রাহ্যই করিলো না।

রসো ক্রোধভরে ঘাড় গুঁজিয়া এবং দুঃখ-ভরে কান্নার একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে-করিতে দাদা বিশুর আকর্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করিলো। এখানে তার অভিভাবক ঢের, এবং তাদের শক্তিও ঢের—রসোর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিলো···এখানে আত্মসমর্পণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

শশী দাওয়ায় বসিয়া এবং ঠেশ দিয়া হুঁকা টানিতেছিল: বাতাসের তখন গতি ছিলো না—কাজেই মুহুর্মুহু আকর্ষণে ধুম নির্গত হইয়া শশীর সামনেই জড়ো হইয়াছিল, আর শশী মনে-মনে গাল দিতেছিল কয়েল রজনী হাজরাকে—আজও রজনী পৌনে দু-সের চালকে ওজনে এক সের ন-ছটাক দাঁড় করাইয়া নিজের হিশাব অনুসারে দাম দিয়াছে—তার আকুল প্রতিবাদ ফলপ্রদ হয় নাই।

আসামী রসোকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বিশু বলিলো—'কাকা রসো কী যেন পেয়েছে ধুলোর ভিতর—কিছুতেই দেখাবে না! ঐ দ্যাখো, ওর মুঠোর ভেতর রয়েছে…'

এই সংবাদে শশী ফুৎকার দিয়া সম্মুখের ধোঁয়া দিগ্‌বিদিক উড়াইয়া দিলো: তারপর বলিলো, 'তোর হাতে কী দেখা।' রসো সেই যে মুষ্টি বাঁধিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও আর খোলে না—হাত ঘামিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে, আঙুলে দারুণ যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে, তবু খোলে নাই।

বলিলো, 'না, আমি দেখাবো না। এ আমার।'

শশী অভয় দিলো: 'তোরই থাকবে—দেখা।'

কিন্তু, আর কারো নয়, পিতৃদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াও রসোর ভরসা হইলো না—মুষ্টি খুলিয়া সে দেখাইল না।

তখন শশী ছেলের অবাধ্যতায়, আর তার দুঃসাহস দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেলো; হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া আসিলো—রসোর একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইল, অর্থাৎ রসোকে সম্মুখে করিয়া সে দাঁড়াইয়া গেলো; ভয়ঙ্কর ভ্রুভঙ্গি পূর্বক গর্জন করিয়া বলিলো 'দেখা।…দেখাবিনে? তবে দেখ মজা।' বলিয়া রসোর যে-হাতে সেই সামগ্রী রহিয়াছে সেই ডান হাতখানা ধরিয়া শশী মুচড়াইয়া দিলো।

তাহাতেও রসোর মুষ্টি খুলিলো না।

তখন শশী তাহার মুষ্টিটাই তুলিয়া লইয়া তাহার উপ'র ঠক্ ঠক্ করিয়া দু-বার গাঁট্টা মারিলো; এইবার ফল দর্শিলো—ক্ষুদ্র রসোর শক্তিতে এবং জিদে আর কুলাইল না—মুষ্টি খুলিয়া হাতের সামগ্রী ছাড়া পাইয়া মাটিতে পড়িলো এবং ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে গড়াইয়া পড়িলো মাটিতেই। তখন স্পষ্ট দেখা গেলো জিনিশটা কী! রসো প্রাণপণ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহাকে ত্যাগ করা নয়, খালি দেখাইতেই রাজি হয় নাই সে-জিনিশটা কী তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেলো—শশীও দেখিলো, বিশুও দেখিলো, তাহা সোনা নয়, রুপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি…

কারখানার নূতন আনি—একটুও ময়লা হয় নাই; জাল জিনিশ নয়; ক্ষয় হয় নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিশ—অত্যন্ত নগদ জিনিশ মূল্য চার পয়সা; ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এতো যে, তার হিশাব করিতে বসাই ভুল।

মাটিতে সেই মহামূল্য জিনিশটি পড়িয়া থাকিবার অবসর পাইলো মাত্র দুইটি মুহূর্ত—তার বেশি নয়; কিন্তু সেই দুই মুহূর্তের মধ্যেই ভাবের যে-বন্যাটি বহিয়া

গেলো তাহা অত্যন্ত তীব্র…

সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল—কাশীর স্ত্রী, কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি—সবাই, কী করিয়া যে সেই দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিলো তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য ! সবারই ইচ্ছা হইলো যে, আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয়—একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের—অন্যের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য হইবে, কিংবা অন্যে দাবি করিতে ভুলিয়া যাইবে, কিংবা দাবি করিতে সাহসই পাইবে না, আজ সবাইকার নাগালের বাহিরে যাইয়া চিরকালের জন্য তাহা আপনার হইবে··

প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিলো—হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিলো

কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইলো তাই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইলো তাই, ভগিনী কুমারীর হইলো তাই, বিশু প্রভৃতির কী হইলো তাহা বলাই যায় না। লোভ হইলো না কেবল রসোর—সে তখন মৃত্তিকায় শায়িত এবং শোকে অভিভূত।

কিন্তু ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করিলো শশী, তৃতীয় মুহূর্তেই আনিটা নির্বিবাদে কুড়াইয়া লইয়া সে খুঁড়াইতে-খুঁড়াইতে যাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিলো, আনিটা রহিলো তার হাতের ভিতর—তাহার পর সে নির্বিকারের মতো হুঁকা টানিতে লাগিলো। বলা বাহুল্য মনঃক্ষুণ্ণ হইলো সবাই।

কিন্তু যে-জিনিশ কাহারও নয়, কাহারও পরিশ্রমের মূল্য হিশাবে যাহা ঘরে আসে নাই, তাহার উপর দাবি করিয়া শশীর এই হস্তার্পণে প্রতিবাদ কেহ করিলো না, কাঞ্চন আর মোক্ষদা সরিয়া গেলো—

কুমারী বলিলো, 'দাদা, প'ড়ে-পাওয়া পয়সায় হরির লুঠ দিতে হয়।'

শশী বলিলো, 'তুই হ'লে দিতিস্ ?'

কুমারী সে-কথার জবাব দিলো না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইলো, সে অপ্রতিভ হইয়াছে।

শশী পুনরায় বলিলো, 'হরির লুঠের নাম আর করিসনে ! আমরাই কোন্ হরির লুঠের তার ঠিক নাই।'

কুমারী এবার হাসিলো, বলিলো, 'ও-কথা বলতে নেই। হরি আবার দশটা-বিশটা আছে নাকি ?'

শশী কথা কহিলো না। এই আনিটা কী-প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিলো : চাল-ডালের প্রয়োজনে নহে—নিত্যব্যবহার্য এবং স্থায়ী একটি জিনিশ ক্রয় করিয়া তাহার মারফৎ প্রচুর আনন্দ পাইতে হইবে এবং

এই প্রাপ্তির সৌভাগ্যটা যাহাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাই অর্থাৎ একটি হুঁকা। কিন্তু সে-ইচ্ছা সার্থক হইবার পক্ষে বিঘ্ন ইহাই যে, একটা আনি যতো মূল্যবানই হোক, তাহাতে পছন্দসই হুঁকা একটি হয় না।

বড়ো বউয়ের পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভ আছে; সে ওদিক হইতে বলিলো 'বামুনকে দাও, পুণ্যি হবে।'

শশী বলিলো 'আর বামুন ডাকতে হবে না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাদের তো বেরুতে হয় না—পয়সার কষ্ট তোমরা বুঝবে কি! কেউ বলছেন হরির লুঠ দাও, কেউ বলছেন বামুনকে দাও, পুণ্যি করো—যেন আমাদের আর-কিছু দিয়ে দরকারই নাই। আমি বলছি, এ তোলা থাক; সবারই পারের কড়ি এতে হবে।'

তামাক-সেবনের বিলাস থাকা সত্ত্বেও শশী নিজের জীবন দুর্বহ মনে করে—সে বৈতরণীর দিকে তাকাইয়া আছে।

ছোটো বউ বলিলো, 'তোলা থাকবে কেন? মুড়ি-বাতাসা আনা হোক্, ছেলেরা ফুর্তি ক'রে খাক। ওরাই তো পেয়েছে আনিটা। ওতে আর-কারো দাবি নাই।'

শুনিয়া রসো মাটির উপর পাশ ফিরিলো।

শশী ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো 'উনি এলেন দাবি দেখাতে। আরে, দাবিই যদি আজকাল দেখানো যেতো, তবে রজনী হাজরার কাছে আমার ঢের পাওনা হয়।'

কুমারী জিজ্ঞাসা করিলো, 'সে কে?'

শশী বলিতে লাগিলো, 'কই, তখন তো হরির লুঠের হরিও আসেন না, পুণ্যির জাহাজ বামুনও আসেন না বিচার করতে। আমাকে সে ফাঁকিই দেয়!'—তারপর রাগের মাথায় শশী বলিয়াই ফেলিলো—'এ পয়সা আমারই হ'লো। আর একটা আনি পেলেই আমি হুঁকা কিনবো।'

এটা শশীর অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে করিয়া কুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো, 'তবে যে বলেছিলে, পারের কড়ি হবে?'

শশী বলিলো, 'হুঁকোও খানিক দূর সঙ্গে যায়।'

শশীর মনের আদৎ ইচ্ছা হুঁকা কেনাই, কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা যেমন তাহাতে একটা হুঁকা থাকিতেই আর-একটি হুঁকা কিনিয়া নিদারুণ অপব্যয় করিবে এরূপ প্রস্তাব করা ভালো হয় নাই—ইহাই মনে করিয়া শশী একটু ছলনা করিলো; বলিলো, 'হুঁকোর কথা আমি মিছে ক'রে বলেছি। দাদা আসুক,

সে কী বলে শুনে তবে ব্যবস্থা হবে।'

কিন্তু একটা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিয়া এখনই করা হইতেছে না দেখিয়া ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিতে বিশু অগ্রসর হইয়া গেলো; বলিলো, 'আমাকে দাও কাকা...'

—'তা হ'লেই গোল মেটে—না? কী করবি তুই?'

—'কাজ আছে।'—যেন কাজটা এমনই ব্যাপক আর গুরুপূর্ণ যে, বিস্তৃত করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়।

কিন্তু শশী তার কথার মর্ম বুঝিলো না; করিলো বিদ্রূপ; বলিলো, 'উঃ, কী কাজের লোক রে!'

ঐ বুঝি পাইয়া যায়! অত্যন্ত আতঙ্কিত আর ব্যগ্র হইয়া আর-আর ছেলে-মেয়েরা সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে দৌড়াইয়া আসিলো—প্রাণপণে চিৎকার করিয়া আর হাত পাতিয়া বলিতে লাগিলো—'ওকে দিও না, আমায় দাও।'

শশী তাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে চিৎকার করিতেছে, কুমারী তারস্বরে হাসিতেছে, এবং সর্বসমেত গোলমাল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন প্রবেশ করিলো কাশী।—কাশী অপর কোনো কাজ না পাইয়া রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ লইয়াছে—শুরকি মাথাইতে হয়, ইট টানিতে হয়—মালমশলা সাজ-সরঞ্জাম মিস্ত্রির হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

যে যাহাই হউক, সেখানে এতো কলরব নাই। কাশীকে দেখিয়াই এখানকার কলরব দ্বিগুণ হইয়া উঠিলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার আদ্যোপান্ত কাশীর জানা হইয়া গেলো। সবাই মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিলো যে রসো খেলিতে-খেলিতে রাস্তার ধুলার ভিতর একটা আনি পাইয়া গেছে; আনিটাকে রসোর হস্তচ্যুত করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; তাহা এখন শশীর জিম্মায় রহিয়াছে; কী-ভাবে তাহাকে ব্যবহারে লাগানো যায় তাহাই বর্তমানে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া আছে—বিভিন্ন ব্যক্তির মতে বিভিন্ন উপায়ে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছে: হরির লুঠ, ব্রাহ্মণকে দান, মুড়িভক্ষণ ইত্যাদি।

বড়ো বউ কাঞ্চন সবাইকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিলো—তাহার মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা সে দৃঢ় কণ্ঠেই বলিলো: বলিলো যে, পয়সা সচল পদার্থ; যাইতেই সে আসে; কিন্তু যাইবার সময় সে যদি মানুষের দেহে কিছু পুণ্য রাখিয়া যায় তার তাহাই ভবিষ্যতে কাজে লাগে—আর কিছু নয়।

স্ত্রীর মুখে এই পুণ্যপিপাসু কথা শুনিয়া কাশী চটিয়া গেলো এবং দেখা গেলো, শশীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাহার মতের মিল আছে। বলিলো, 'বাহাদুরি রাখো। শশী, তুই রেখেছিস তো আনিটা? রাখ্ তুলে।'

কুমারী বলিলো, 'হ্যাঁ, রেখেছে। আর একটা আনি পেলেই হুঁকো কিনবে।'

অপরাধী শশী প্রতিবাদ করিলো না; কিন্তু বড়ো বউ স্বামীর কাছেও বাধা পাইয়া সেই রাগে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলো। আনিটা তাহার হইলো না, আর কাহারও নিজস্ব তা কেন হইবে, এই রাগও তার যথেষ্ট ছিলো···

কলহের ভঙ্গিতে সে বলিলো, 'হুঁকো, কিনতে কাউকে আমি দেবো না। খেতে পাইনে পেট ভ'রে ছেলেপিলে নিয়ে, এদিকে বাবুয়ানি ক'রে তামাক খাওয়ার শখ তো আছে।'

বড়োবউয়ের ঝাঁজ দেখিয়া শশী ভারী নিস্তেজ বোধ করিলো; বলিলো, 'হুঁকো কেনার কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু তামাশা ক'রে বলেছি। পেটে আমাদের ভাত নাই তা তোমার মতো আমিও জানি, বড়োবউ!'

সন্ধ্যা তখন লাগিয়া আসিয়াছে—

ছোটো বউ একটা কুপি জ্বালিয়া শোবার ঘর দুখানাতে সন্ধ্যা দেখাইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল; দাঁড়াইয়া পড়িলো; বলিলো, 'ঝগড়ার দরকার কি? ফেলে দিলেই তো হয় অলুক্ষনে আনি!'

—'পয়সা হ'লো অলুক্ষনে! এই ভরসন্ধে বাতি হাতে ক'রে অমন কথা ব'লো না, ছোটোবউ।'—বলিয়া কুমারী শশীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শশীও দেখিলো, গতিক খারাপ; আনির মায়া ত্যাগ করিয়া স্থানত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; আনিটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া সে-ও ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া দূর্বার উপর বসিয়া গা ছাড়িয়া দিলো···

ছেলেরা দেখিলো, আনির দাবিদার, আপাতত কেহ নাই—বেওয়ারিশভাবে তা দাওয়ার মাটিতে পড়িয়া আছে; অভিভাবকগণ নির্লিপ্ত যেন। এ-সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ, ত্যাগ করিবার মতো নয়। রসো সবার আগে ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে অধিকার করিয়াই পলায়ন করিতে উদ্যত হইলো···

কিন্তু দাবিদার কেহ নাই ভাবিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া রসোর ভুল হইয়াছিল, কারণ বড়োবউ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলো; ধমক দিয়া বলিলো, 'দে পয়সা শিগগির—নইলে ভালো হবে না।'

ছোটোবউ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু ভাশুরের সামনে চেঁচায়—

তাহাতে লজ্জা নাই। চেঁচাইয়া সে বলিলো, 'তোমাকে ও দেবে কেন? আমাকে দেবে না কেন? আমাকে দেবে না কেন? ও-ই তো পেয়েছে!'

বড়োবউ বলিলো, 'এ যে শরিকের মতো তোমার-আমার আলাদা ক'রে ভাগ হ'লো!'

'তুমিও তো নিজের কথাই ভাবছো। ওটা তোমার নিজের হোক এ-ই তো তোমার মতলব?'

'অতো মতলববাজ মেয়ে আমি নই।' বলিতে-বলিতে রসোর হাত হইতে আনিটা ছিনাইয়া লইয়া বড়োবউ পার হয় দেখিয়া রাগে-দুঃখে ছোটোবউ কাঁদিয়া ফেলিলো, স্বামীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিলো—'ওগো, একটা বিহিত করো এসে। আমরা যদি কেউ না হই তবে তেমনি ব্যবস্থা আজ থেকে হোক।'

'কিছুই আপত্তি নাই।' বলিয়া বড়োবউ সদম্ভে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তাব অতি নিকটেই সহসা গর্জন করিয়া উঠিলো কাশী। বলিলো, 'খবদ্দার। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তোমাদের বাড কদ্দুর। ও-আনি আর কারো নয়, আমার। এ-বাড়ির সকলের বড়ো আমি—আমি যাকে দেবো এ তারই হবে। আমি খেটে-খুটে এসেছি—আমার মেজাজ ভালো নেই। এখুনি ও-আনি আমার হাতে না দিলে ভারি মুশকিল হবে।'

মুশকিলের কথায় বড়োবউ ভয় পাইলো না, কিন্তু অপরিমেয় ঘৃণার সহিত আনিটা স্বামীর সম্মুখে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেলো।

ছোটোবউ ছোট্টো করিয়া বলিলো—'ও একই কথা হ'লো।'

কিন্তু সে-কথা কাশীর কানে গেলো কিনা সন্দেহ। বলিলো, 'এ-আনি চারজনের একবেলার খোরাক—সেদিকে কারো হুঁশ নাই, কেবল পুঁজি করার লোভ। আচ্ছা।'—বলিয়া কাহাকে যেন শাসাইয়া কাশী রান্নাঘরে গেলো, শিল পাতিয়া আনিটা তাহার উপর রাখিলো, তারপর নোড়া তুলিয়া দিলো সেই আনির উপর প্রাণপণে তিন ঘা।

ছেলেমেয়েদের চোখ ছলছল করিতে লাগিলো, বড়োবউ আর ছোটোবউয়ের চোখে স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া এবং নির্নিমেষ হইয়া, জ্বালা করিতে লাগিলো।

নিজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়োবউ দানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলো এবং ঐ কারণেই ছোটোবউ চাহিয়াছিল বারোয়ারিভাবে মুড়ি-মিষ্টি খাওয়াইতে। কিন্তু প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াও দৈবদত্ত সুদর্শন আনিটার এই দুর্গতি কেহ কামনা করে নাই।

কাশী আনিটাকে থেঁতলাইয়া বিকৃত আর অকর্মণ্য করিয়া সেটাকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া শূন্যে-শূন্যে কোন্ গহনে পাঠাইয়া দিলো তাহার কিছুমাত্র উদ্দেশ রহিলো না।

———

## কলঙ্কিত সম্পর্ক

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ি ফিরিবে।

সাতকড়ি এতোদিন কোথায় ছিলো তাহার হিশাব দিতে হইলে মধুডাঙার সেই ঘটনাটা বিবৃত করিতে হয়।

কোন্ যুগে কার আমলে কি কোন্ রাজার রাজত্বের সময় মধুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ পর্যন্ত এদিককার কেহ মনে করে নাই। মধু হিন্দু ছিলো কি মুসলমান ছিলো উগ্রক্ষত্রিয় ছিলো কি সদ্‌গোপ ছিলো তাহাও কেহ জানে না—জানে কেবল ইহাই যে, বহুদিন পূর্বে মধু নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যু এই স্থানে বাস করিতো। স্থানের নাম আগে ছিলো পীতাম্বরপুর—তাহার পর মধুর নামে নাম প্রচলিত হইয়া এখন এই পীতাম্বরপুরকে সবাই বলে মধুডাঙা।

দিগন্তবিস্তৃত তৃণবৃক্ষহীন দুস্তর এই ডাঙার কোথায় নাকি মধুর দুর্গ ছিলো ভূগর্ভে—সরকারি কোনো গুপ্তচর সেই দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর মধুকে কোনোদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

মধু গেছে কিন্তু মধুডাঙা আছে; এবং পথপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র এই মধুডাঙা গ্রামে ঝুলনের দিন এক মেলা বসে। কিন্তু মধুডাঙার এই মেলা নামে মেলা—তেমন কিছু নয়। মাত্র দশ-বারোখানা দোকান বসে; বালতি-কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, হরেক রকমের খেলনা, আরশি-বসানো টিনের কৌটা, কাঠের চিরুনি, কাঠের মালা ফিতে, ঘুন্‌শি, সূচ, সুতা, পাঁপড় ভাজা, ঘুগ্‌নি, পান, সিগারেট আর নানান আকারের নানান স্বাদের নানান রঙের, আর নানান গন্ধের বিবিধ মিষ্টান্ন—বালক-বালিকার আর গৃহস্থের লোভনীয় এবং ক্রেয় যা তাহাই গোরুর গাড়িতে, কেহ নিজের মাথায় কি পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে, আর চট টানাইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু সমারোহটা ভিতরে বেশি।

রাধানাধব বিগ্রহের প্রশস্ত আর উচ্চশির মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির আর এদিক চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধু বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই বড়ো বড়ো আলো জ্বালাইয়া কীর্তন শুরু হইয়া গেলো। অসংখ্য লোক কীর্তনানন্দ আর কীর্তনরস গ্রহণ করিতে বসিয়া গেছে—দেড় মাসের শিশুটিকে লইয়া এক জননীও আসিয়াছেন—শতাধিক বর্ষ বয়স্ক এক অন্ধ বৃদ্ধকে আসিয়া বাড়ির লোকে একেবারে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেছে। সক্ষম লোকের তো কথাই নাই।

কীর্তনের আসরে অনেক লোক থাকিলেও সেখানেই সবাই নাই। বাহিরে গাছের তলায় স্থানে-স্থানে বৈষ্ণবীগণসহ বাবাজি বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কোনো কাজ নাই, গল্প চলিতেছে কেবল। ওদিকে কেউ ইট পাতিয়া আগুন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে—রাধামাধবের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ তাহার হয় নাই, যেমন হইয়াছে বৈষ্ণবীগণসহ ঐ বাবাজির। ধোঁয়ায়-ধুলায় স্থানটা বড়ো অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আরো যাহারা বাহিরে আছে তাহারা সবাই যেন ক্লান্ত—যে বেড়াইতেছে সে গা ঢুলাইয়া বেড়াইতেছে, যে বসিয়া আছে সে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া আছে, যে শুইয়া আছে সে পিঠ দুমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শুইয়া আছে, একটি ভিখারিনি বসিয়া বসিয়া নির্বিকার চিত্তে তার ছেলেটির দিকে তাকাইয়া আছে—ছেলেটি ধুলা লইয়া মুখে পুরিতেছে

দোকানগুলি খোলাই আছে। বাইশ-তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে একটি মনিহারি দোকানের সম্মুখে বসিয়া কাহারও জন্য যেন ঘুন্‌শি বাছাই কবিতেছিল, দুগাছা বাছিয়া লইয়া আর দাম দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলো, তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে—

মেয়েটি সরিয়া গেলো।

মেয়েটির অপরিচিত ঐ লোকটিই সাতকড়ি, প্রাণপ্রিয় দুইটি বন্ধুসহ সে মধুডাঙার মেলায় আসিয়াছে, ফুর্তি করিতে।

কী রকম ফুর্তি সে এতোক্ষণ করিয়াছে এবং কী রকম ফুর্তি সে রাতভোর করিতো তাহা কেহই জানে না, সে-ও জানে না, কিন্তু যে চরম ফুর্তিতে যে প্রচণ্ড বাধা পড়িয়া গেলো তাহা সবাই জানে। ফুর্তি চরমে তুলিতে যাইয়াই মধুডাঙার মেলা হইতে তাহাকে সবান্ধবে যাইতে হইলো গিরিধরপুরের থানায়—

ফুর্তি করা শেষ হইলো না, গুরুতর একটা অপরাধের দরুন আদালতের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইলো। সেই কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অর্থাৎ ফুর্তির শখ নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, সাতু কাল বাড়ি ফিরিবে। আজ মাসের কোন্ তারিখ তাহা এ-বাড়ির কেহ জানে, কেহ জানে না। কিন্তু এতো লোকের ভিতর কে একজন যেন নিঃশব্দে হিশাব রাখিতেছিল; হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিলো, কাল সাতু বাড়ি আসিবে। কাল ৭ই।

চারটি ভাইয়ের ভিতর সাতকড়ি দ্বিতীয়। ছোটো দু-ভাই বিদেশে থাকে; তবু বাড়িতে লোকের ভিড়, ভিড়ের ভিতর সাতকড়ির স্ত্রীও বর্তমান।

সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গনিতে শুরু করিয়াছিল; কিন্তু অন্যভাবে; স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরুদুরু বুকে ভয়ে-ভয়ে গনিতে ছিলো—গনিতে-গনিতে অবশ হইয়া একদিন সে গনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—শুরুর সূত্রটা মনে ছিলো, আর গণনার শেষে দিনটা বিভীষিকার মতো সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুক কাঁপাইয়া তাহাকে জর্জর করিতেছিল; কিন্তু একটি-একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তাহার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—আর সে ভাবিতে চাহে নাই; মনে-মনে চোখ বুজিয়া অন্ধ হইয়া সে সেই অগণ্য দিনের শেষ দিনটাকে প্রাণপণে অনন্ত অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছিল···

ভয়াবহ সেই দিনটা সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়াছে—মাখন চমকিয়া উঠিলো। মাঝখানে ছোটো একটা রাত্রি; সূর্য কাল আবার উঠিবে; তখন স্বামী আসিবেন—

মাখনের জীবন্মৃত শুষ্ক প্রাণ কণ্ঠাগত হইলো। সূর্যের উদয়াস্ত-ব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এতো সংক্ষিপ্ত তার কোনোদিন মনে হয় নাই; সাতকড়ি যেদিন যায় সেদিনের তখন কেবল প্রভাত; আজ এই সন্ধ্যা—

মাখনের মনে হইতে লাগিলো, মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে; নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই; বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে দেড় বৎসর কাটিয়া গেলো!

বাড়িতে আরো লোক আছে—সবাই সাতুর আপন; কেউ ভাই, কেউ ভাজ, কেউ মা, কেউ আর কিছু। কিন্তু এতোগুলি পরমাত্মীয় থাকিতেও মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন সকলের চেয়ে বেশি—সে-ই বেশি করিয়া জড়ানো। সে স্ত্রী; বাহির হইতে আসিয়া স্বামীর কোন্ ক্ষেত্রটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে কেহ কখনো

বোধহয় মন খুলিয়া বসে নাই ; তবু একটা স্থানে তাহার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোকে যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে ; একটি স্থানে সে সর্বস্ব, সর্বগ্রাসী, সতত জাগ্রত ; সে তাহার দাবি পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অণুপরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ, আর দাবি লঙ্ঘন সহ্য না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভুজার মতো দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মতো যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সে-ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই ; সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তাহার মুখ হেঁট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ি কতোবার আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই—সৌষ্ঠব শ্রী সৌন্দর্য সম্মান একমাত্র তাহারই হাতে। সবারই সেই মত ; বাড়ির বাহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান। মাকে ডিঙাইয়া একটি অগ্রজ, দুইটি অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই ; কেহ ইতস্তত সন্দেহ করে নাই ; শাশুড়ি যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন ; তাহার অস্তিত্বই যেন একটা অপরাজেয় অপরিহার্য শাসনবাণী—তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু আজ সে পরাস্ত—শাসনদণ্ড ধুলায় লুটাইতেছে ; সে আজ এতো তুচ্ছ অকর্মণ্য গুরুত্বহীন যে, তাহার থাকা না-থাকার একই মূল্য। দুনিয়ার লোকে কী বলিতেছে কী ভাবিতেছে তাহা সে জানে না ; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সে তো সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না! তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র ; স্বামীর সত্তার বাহিরে যে-জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সংযোগ তাহার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের আবহমণ্ডলে ফুটিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই ঐ।

ঐ পরিচয়ই চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন কী হইয়া গেলো—পৃথিবী তাহার পথ ছাড়িয়া উলটাইয়া পড়িলো ; যেখানে যে-বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিলো বলিয়াই সে সুখে ছিলো, স্বাভাবিক ছিলো, একটি বার চোখের পলক না পড়িতেই তাহারা মিলিয়া-মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তাহার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া গেলো…

স্বামী জেলে গেলেন—

যে-কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিলো, প্রচণ্ড আঘাতে সে এলাইয়া

পড়িলো ; যে-আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কম্পন দিয়া সাজানো ছিলো, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলো ; ভাবনার দলগুচ্ছ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্মিত যে-নীড় অনন্য ছিলো তাহার চিহ্নও রহিলো না ; মন্দিরের নিত্য অর্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেলো ; ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিলো ; যে-পথে সে আলো দেখিতো, যে-পথে সে গান শুনিতো, যে-পথে সুধা ঝরিতো, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তাহার আর কোনো সম্পর্ক রহিলো না···

কিন্তু তাহার এই রকম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিলো না ; তাহার মনে হইতে লাগিলো, একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে-ছড়াইতে যেখানে যতোদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে-কুটিরে, পথে-পাথারে, পৃথিবী যেখানে সত্যসত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—জীব-জগৎ শিহরিয়া কানে আঙুল দিয়া বসিয়া আছে···

এই দুর্বিষহ লজ্জা অখণ্ড গুরুভার আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুক জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিলো—'আমিও তোমার সঙ্গে আছি' বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেউ আসিলো না !

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এতো যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না ; মানুষ কোনোদিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই ; ভগবানের নাম যার বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই,—এ-জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই।

স্বামী এমনি অচিন্তনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন, মুক্তি পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। কাল ৭ই।

গৃহের আর সবাই উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্যন্ত ; বিমর্ষে থাকিয়া-থাকিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই শ্রান্তির মাঝেই যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি হইয়াছে ; তাহাদের মনে নাই ; কী কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতোদিন গৃহে নাই।

কিন্তু কোনোদিন একেবারে না থাকিলেই যেন ভালো হইতো।

রাত্রি তখন গভীর—

মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিলো···

এতোবড়ো আকাশের যেখানে যে জ্যোতি বিন্দুটি ছিলো, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে ; থইথই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে ; তাহার শ্বাস বহিতেছে না—

মাখনের ভয় করিতে লাগিলো…

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাহারা তাহাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে ; তাহাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই—কেবল চক্ষু দুটি দপদপ করিতেছে…

তাহাদের নির্মম অবিশ্রান্ত দণ্ডপ্রহারে আবর্তকেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে—আগে ধোঁয়া, তাহার পর ফেনমুখী হলাহল উদ্‌গিরিত হইতেছে…সেই জ্বালাময় হলাহলের পাত্র লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিলো ; কালোর মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ, তেমনি দৃঢ়, তেমনি মন্থর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। কতোদূর হইতে কালোর স্তরগুণ্ঠন ঠেলিয়া-ঠেলিয়া মূর্তি অগ্রসর হইতেছে—তাহার গতির বিরাম নাই ; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই—পথের শেষ নাই…

কবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তাহার হাতে দিবে !

বড়ো জা গোলাপ সর্বাগ্রে উঠিয়াছিল।

সে উঠানে নামিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলো ; এবং সেই চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিলো মাখন মূর্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ি ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

আজ এখনই ছেলে আসিবে যে ! আজ ৭ই।

গোলাপ দু-মিনিটে তিন বালতি জল তুলিয়া ফেলিলো ; নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিলো, 'কাকিমা ? কাকিমা ?'

সাতকড়ির দাদা সতীশ দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়াই ফিরিয়া গেলো।

গোলাপ নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিলো ; বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন ; এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিলো না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে, সে দৃশ্যটি সে-স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল !

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বউমা, কেমন আছো ?'

কিন্তু মাখনের মন ছিলো কুহেলিকাআচ্ছন্ন—শব্দ করিয়া উত্তর দিতে তাহার দেরি হইলো।

বিরাজ আবারও ঐ প্রশ্নই করিলেন ; কিন্তু মাখন কিছু বলিবার পূর্বেই সতীশ নামিয়া আসিলো—

বিরাজ বলিলেন—কোথায় যাচ্ছিস ?

—সাতুকে আনতে যাচ্ছি, মা···

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিলো—বউমা উঠোনে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন কী ক'রে ?

—তাই তো ওকে শুধোচ্ছি। তুই ভাবিসনে, ভালোই আছে।

অর্থাৎ সাতকড়িকে আনিতে যাইবার পক্ষে বউমায়ের জন্য উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

'যাই' বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেলো।

ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর ছিলো কিনা কে জানে, কিন্তু একা-একা, যেন অনিমন্ত্রিতের মতো, গৃহে প্রবেশ করিতে সে সংকোচ বোধ করিতে পারে—তাহারই নিবারণকল্পে বিরাজ এবং তাহার বড়ো ছেলে সতীশ পরামর্শপূর্বক সহজভাবে একটু চেষ্টা করিলেন—সতীশ আগুয়ান হইয়া তাহাকে আনিতে গেলো।

বিরাজ ও বড়োবউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন—

—অসুখ করেছে ?

মাখন নির্জীবের মতো বসিয়াছিল, বলিলো, 'না।'

—তবে, ভয় পেয়েছিলে ?

—না।

—তবে ?

মাখন বলিলো—'রাত্তিরে ঘুম হ'লো না, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন কেমন ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেছি জানিনে।'—বলিয়া মাখন উঠিলো।

নিতু তখন মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিলো।

অনেক বেলায় সতীশ ফিরিলো, কিন্তু একা।

ছোটোবউকে সুস্থভাবে চলিতে-ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সেদিকে নির্বিঘ্ন হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'সাতু কই ?'

সতীশ ধীরে-ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিলো—'সে এলো না।'

—এলো না? কোথায় গেলো?

এতোদিন দর্শন ও প্রাপ্তি আসন্ন হয় নাই—অনিবার্য বিলম্ব সহিতেছিল, কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতে-হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইলো। বিরাজের বুক ফাটফাট করিতে লাগিলো

সতীশ বলিলো—'চলো ভিতরে, বলছি।'

ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'তাকে আনতে পারলিনে কেন? কোথায় গেলো সে?'

—কী জানি কোথায় গেলো। জেলের বাইরে এসে সে বললো, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। ব'লে সে কী কাজে গেলো জানিনে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার—

সাতুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহার কী দুরবস্থা ঘটিলো তাহা সতীশ বলিলো না, বোধহয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে বিব্রত বোধ করিয়াই পাশ কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন, 'সে হয়তো তখুনি এসে তোকে না দেখতে পেয়ে অন্যদিকে চ'লে গেছে।'

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয় নয়—কিন্তু সতীশের নিকট হইতে কোনো জবাব আসিলো না।

বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিলো সে-জল নিজেও থামিলো না, তিনিও চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিঃশ্বাসও বহিতে লাগিলো· ·

কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিলো এই বেদনাটাই যে, যে-পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র! এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা—জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।

বিরাজের একবার চোখ মুছিবার সময় মাখন বলিলো, 'পথ চেয়ে আছো বৃথাই মা। দিনের আলোয় মানুষের সামনে দিয়ে আসার উপায় তাঁর নেই। তিনি আসবেন সন্ধ্যার পর।'

শুনিয়া বিরাজের পিত্ত জ্বলিয়া গেলো। তিনিও বধূর ভাবগতিক লক্ষ করিতেছিলেন। ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীব্রতর চক্ষে লক্ষ করিলেন,

বলিলেন, 'বউমা তোমার মান-অভিমান আর রাগের ভঙ্গি আমার ভালো লাগছে না। তোমার মুখ দিয়ে বিষ পড়ছে। অমন বিষমুখ ক'রে থেকো না তুমি, মুখ অমন বিষ ক'রে ছেলের সামনে যেতে তুমি পাবে না শুনে রাখো। তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো। আমরা তোমার গুরুজন। আমাদের সামনে—'

কিন্তু মাখন হঠাৎ পিছন ফিরিলো দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন—শেষ কথাটাই অত্যন্ত সতেজে বলিয়া দিলেন, 'যাও, কিন্তু সাবধান।'

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী মা?'

—'যাই, বলছি গিয়ে।'—বলিয়া বিরাজ ছোটোবউয়ের আচরণ অর্থাৎ তাহার দুঃখের আর ক্ষোভের কথা বড়ো ছেলের কানে ঢালিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু সুখ কি দুঃখ কিছুই পাইলেন না। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিলো, বলিলো, 'বড়োবউকে বলো, সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন।' বলিয়া সে মুখ নামাইল।

মায়ের নিঃশব্দ চোখের জল আর সবার মুখের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিতে বাহির হইলো। কিন্তু গম্য-অগম্য-ইতর-ভদ্র কোনো স্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিলো না—কোথায় গেলে সাক্ষাৎ মিলিবে সে সন্ধানও মিলিলো না।

এই সংবাদ বিরাজ পাইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং খানিক শুইয়াই রহিলেন, তারপর তিনি মুহুর্মুহু ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, মাখনের রকম দেখিয়া উৎকণ্ঠার উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিতে লাগিলো—তথাপি তাঁহার মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিলো। তাঁহার মুখে আজ ভাত উঠিলো না।

কিন্তু ফলিলো মাখনের কথাই।

সন্ধ্যার পর বার-দুয়ারের চৌকাঠে ঠাকুমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল, 'কাকা কখন আসবে ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?'

বিরাজ বসিয়া যেন বিশেষ ঘোরে ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন, 'তা জানিনে।'

—এতোদিন কোথায় ছিলো?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

নিতু বলিতে লাগিলো, 'কাকা অনেকদিন বাড়িতে আসেনি, নয় ঠাকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিলো এতোদিন? আমার জন্যে কী আনবে?'

পরম স্নেহাস্পদ বালক পৌত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠাকুমার কিছুমাত্র

উৎসাহ দেখা গেলো না। বালকের এমনি ধারা শতেক প্রশ্নে যে-মিনতি আর যে আগ্রহ দেখা দেয়, বিরাজের প্রাণের আনন্দপ্রবণ অন্তঃস্রোত তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাঁহার অজ্ঞাতেই মুহূর্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিলো মাত্র, কিন্তু মনে পড়িলো না যে সবই বিসদৃশ। কিন্তু চুপ করিবার পর বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়া গেলো, বিরাজ আনমনা হইয়া রহিলেন—

বিরাজ আনমনাই ছিলেন ; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক কাপড়ে-ঢাকা একটি লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁহার মুহূর্তও বিলম্ব হইলো না—'সাতু ?' বলিয়া তিনি প্রকৃত সজীব ব্যক্তির মতো লাফাইয়া উঠিলেন, সাতু গায়ে-মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিলো এবং পরক্ষণেই হৈ চৈ বাধিয়া গেলো। নিতু চিৎকার করিয়া সংবাদ রাষ্ট্র করিতে লাগিলো. 'বাবা, কাকা এসেছে, মা কাকা এসেছে, কাকিমা কাকা এসেছে।' বলিতে-বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিলো…

'আয় !' বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন-পিছন সাতু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিলো তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন। দাদাকে সে প্রণাম করিলো, বৌদিকেও প্রণাম করিলো, দাদার ছোটো ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই, 'এটা আবার কবে হ'লো ?' জিজ্ঞাসা করিয়া সাতু ডান হাতের দুটি আঙুলে তাহার গণ্ড স্পর্শ করিলো।

দাদার বিশেষ বিছু বলিবার ছিলো না। 'আমায় দাঁড করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি ?' বিস্মিত এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঠিয়াছিল ; কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বোধহয় চক্ষুলজ্জার বশেই সে নিঃশব্দে সরিয়া গেলো ; মাকে সন্তুষ্ট করিতেও সে কোনো সম্ভাষণই মুখে ফুটাইতে পারিলো না।

বৌদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিলো, 'ভালো আছো ?'

সাতু বলিলো, 'তোমাদের আশীর্বাদে।'—বলিয়া হাসিলো। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেলো। তাহার হেঁশেল ছিলো—মুৎফরক্কা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেলো।

বিরাজ ছেলেকে অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, হেঁশেলও নাই, ছেলের গায়েহাত বুলাইতে-বুলাইতে তিনি বলিলেন, 'বড়ো রোগা

হ'য়ে গেছিস। ভেতরে অসুখ নেই তো ?'

সাতু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলো। হাসিয়া বলিলো, 'না। কিন্তু বড়ো কষ্ট দিয়েছে, মা !'

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিলো—বলিলেন, 'আজ সারাদিন খেয়েছিস ?'

সাতু তাহাদের আড্ডায় যা খাইয়াছে সে-জিনিশ এ-বাড়িতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিলো, 'কিছুই খাইনি, মা।'

—কিছুই খাসনি ? আ-হা-হা…আর্তনাদ করিয়া বিরাজ হাঁকিলেন—ছোটো বউমা, রান্না হ'লো ?—বলিয়া উত্তরের জন্য একমুহূর্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন—এবং রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ছোটোবউ ব্যাধিকাতর দুর্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাশিয়া বসিয়া আছে…

খুবই লক্ষ করা—এ-ব্যাপারটা মুলতবি রাখিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন, 'বড়ো বউমা রান্না হ'লো ? সাতু সারাদিন কিছু খায়নি।'

'এই হ'লো মা'—বলিয়া বড়োবউ হাঁড়ি আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলো।

বিরাজ অবেলায় রান্নাঘরের আমিষ মাটি ভুলিয়াও মাড়ান না ; কিন্তু এখন বড়ো তাগিদ ছিলো, মুলতবি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে তিনি আমিষ মাটির উপর দিয়াই ছোটোবউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর লইয়া গেলেন ; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন, 'তুমি অমন ক'রে ব'সে আছো যে ?'

ইত্যবসরে তাঁহার বিরহী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরহিণী বউয়ের উচিত ছিলো বলিয়া বিরাজের মনে হইলো।

মাখন কথা কহিলো না ; তাহার মাথা মাটির দিকে আরো ঝুঁকিয়া পড়িলো।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন 'ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভালো নেই, বউমা। এমন সময়ে তুমি আর জ্বালিও না বলছি। ওঠো।'

মাখন মুখ খুলিলো না, বলিলো, 'উঠে কী করবো ?'

—করবে আবার কী ? নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ ক'রে থাকতে পারবে না।—বলিয়া মহা রাগত-

ভাবে মাথার মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন।

সাতু ইত্যবসরে তাহার দেড বৎসরের পরিত্যক্ত গডগড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহার প্রিয় তরকারিগুলি প্রস্তুত করিতে বধূদ্বয়কে হুকুম করিয়াই বিরাজ কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাতুর শ্রান্তিহারী এবং সুখজনক শৌখিন তামাক আর টিকেও আনাইয়া চাকরটাকে, কী কারণে কে জানে, সেদিনের মতো ছুটি অর্থাৎ বাহিব করিয়া দিয়াছেন।

সাতু চটপট তামাক সাজিয়া লইয়া টানিতে বসিলো। নিতু তার ছডানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলো 'কোথায় ছিলে কাকা এতোদিন ?'

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবাবও তাহারের উত্তরের আশা মিটিলো না, ভূতপূর্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গডিয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পডিলেন, বলিলেন, 'তোর সে-কথায় বারবারই কাজ কী বে লক্ষ্মীছাডা ? পালা এখান থেকে।'—বলিয়া নিতুর সোহাগ সুখ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে দাঁড করাইয়া দিলেন।

সাতু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে এবং ভৎ সনা দিয়া মায়ের এই চাপা দিবার চেষ্টায় তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইলো না, বলিলো 'আহা বসুক না!' বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল, কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের খবর শুনাইতে লাগিলেন, সাতু তাহা তামাক টানিতে-টানিতে শুনিতে লাগিলো।

আহারের ঠাঁই হইলো দুই ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সংসারে বেশি এবং প্রবল। দাদা সতীশের সঙ্গে, এবং মায়ের সঙ্গেও সাতু আহারে বসিয়া যথেষ্ট লিপ্ততার সঙ্গে সে আলোচনা করিলো এবং অকুণ্ঠিতভাবে আর দীর্ঘ ভাষায় স্বীকার করিলো যে, ঋণ যাহা হইয়াছে, তাহার কারণ সে-ই।

সতীশ ভাতের থালার দিকে এবং বিরাজ সাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া ঋণ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শুনিলেন—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

ভোজনে সাতু বৃক-তুল্য—

কিন্তু আজ তাহাকে অল্পেই তৃপ্ত হইতে দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন,

বলিলেন : 'কই, খেলিনে যে তেমন ?'

'পেটের খোল চুপশে গেছে মা, না খেয়ে-খেয়ে। ভেবো না, ক্রমশ আবার বড়ো হবে।' বলিয়া সাতু মাতৃহৃদয়কে অভয় দিয়া খুব হাসিতে লাগিলো।

আনন্দের মাঝেই আহার সমাধা হইলো। সাতু তামাক সাজিয়া লইয়া শয়ন-কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিলো।

মাখন ভাতের থালা সামনে লইয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলো।

গোলাপ কাতর স্বরে বলিলো, — 'খা'···

দু-গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই মাখন হাত টানিয়া লইলো। গোলাপ সেদিকে একবার বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলো—বলিলো না কিছুই।···

বহু যোজন দূরে ঝড় উঠিলে নাকি সমুদ্রের নির্বাত তটেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই ; মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাস বায়ু চালিত হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিলো, 'ভাই, আমার মাথা খাস···'

মাখন বলিলো, 'দিদি, আমায় বিষ দাও।'

বড়োবউ ছলছল চক্ষে বাম হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলো।

'ছোটো বৌমার খাওয়া হ'লো ?' জানিতে চাহিয়া বিরাজ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন—অকারণেই তাঁহার মনে হইতেছিল ছোটোবউ ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করিতেছে।

বড়োবউ বলিলো—'হয়েছে'।

ছোটোবউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিলেন, 'তবে ব'সে আছো কেন ? হেঁশেল বড়ো বউমা সারবে'খন, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে।'—বলিতে-বলিতে তাঁহার নজরে পড়িয়া গেলো সাতুর খাওয়া থালাখানা। থালাখানা তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধহয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোটোবউ ভাত লয় নাই দেখিয়া অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিলো তাহা বলা যায় না। কিন্তু সেকথা তিনি মোটেই তুলিলেন না ; কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিলেন, 'কথা বলছো না যে ?'

কী কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু ধিক্কার যেন ছিলো—তাহাকে নির্বিষ করিতেই তিনি তাঁহার ক্ষমার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া মরিতেছেন ; বধূর মুখের কথায় যদি তাই একটু পান ; কিন্তু মুশকিল এই যে, এই কথা লইয়া গলা

চড়াইবার উপায় নাই।

আরো মুহূর্ত দুই অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের ঝাঁজ যেন গলিয়া-গলিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিলো : 'কথা কইছো না যে তবু? কার হাতে তুমি পড়েছো তা জানো? আমার হাতে। আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।'

বলিবার কিছু ছিলো না বলিয়াই মাখন তথাপি কিছু বলিলো না। বড়ো বউ মধ্যস্থ হইয়া আসিলো; বলিলো, 'তুমি যাও, মা। আমি ওকে দিয়ে আসছি।'

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিলো না। পাথরে আঘাত কে কতো করিতে পারে! মনে-মনে ছোটো বউমার মাথা চিবাইতে-চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড়োবউ যাইয়া মাখনের হাত ধরিলো।

বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে-টানিতে সাতকড়ি মধুডাঙার মেলার ঘটনাই চিন্তা করিতেছিল—সেখানকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আর দুর্বিপাকের বহর ভাবিতেছিল, দৈব নিতান্তই বিমুখ; নতুবা ধরা পড়িবার তো কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না! সঙ্গীরা পাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনোদিকেই ত্রুটি হয় নাই—মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পায়-পায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল—ঘূণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

দোকানপাট বন্ধ হইয়া মেলার স্থানটা ক্রমে নিদ্রিত নির্জন হইয়া গেলো। কীর্তন তখন তুলে চলিতেছে, জমিয়াছে বেশ; কীর্তনওয়ালা ঘামিয়া-নাহিয়া উঠিয়াছে—তবু তার বসিবার নামটি নাই; খোল বাদকগণ যেন নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে···

নাটমন্দিরের ভিড়ের বাহিরে একটা টিনের চালার কাঠের খুঁটি ঠেশ দিয়া বসিয়া মেয়েটি ঢুলিতেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হরি-ধ্বনিতে চমকিয়া সজাগ হইয়া সে বোধ করি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের আওতায় বাতাস ভালো বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে-ধীরে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল···

তারপর যা ঘটিলো তা চক্ষের পলকে—মেয়েটির মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িলো, সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীর বেগে চলিতে লাগিলো।

অদূরে বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো-অকেজো ছোটো-বড়ো গাছে আর ঝোপে-জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। কিন্তু বিধাতা এমনি অপ্রসন্ন যে, গভীর রাত্রে বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন দর্শককে পূর্ব হইতেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, সে-পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিলো।

তারপর মামলা ; অত্যন্ত তোড়জোড় ; অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়, কত কি বিশৃঙ্খলা, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট !...

তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ; দেহের শক্তি যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিদারুণ দাসত্ব সহ্য করিতে হইয়াছে।

দুঃসহ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতুর কিন্তু নিঃশ্বাস পড়িলো না—মেয়েটির মুখখানা তার মনে পড়িলো—নয়নাভিরাম, কালোর উপর উল্‌কির ফোঁটা ; স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ; চক্ষু দুটি আয়ত ; সিন্দুর শঙ্খ নাই ; অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই ; নিতান্তই গেঁয়ো হাবা—দেখিলেই তা বোঝা যায়। মেলায় একা আসিয়াছিল, না সঙ্গীসাথী কেহ ছিলো কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন তার দশা, তাই বা কে জানে !

সাতু উহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে-ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিলো, মাখন আসিয়াছে—সে আরো দেখিলো যে সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর...

বলিলো, 'এতোক্ষণে দেখা দিলে ! এসো।'

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষমানা কি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটির মতো সরাসরি শয্যায় না যাইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইয়া দাঁড়াইল—তার সোহাগপূর্ণ সাদর আহ্বান সে শুনিতে পাইতেছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিলো না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের এ মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই ; কিন্তু প্রাণের আঁশে-আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে-মাঝে তা ফুটিতো ; তার উপর, কোথায় ভয়াবহ দণ্ডপাণি একজন শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্য একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিবার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক, দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিলো—সুখে-দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা-

অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিলো, অভিমান-বোধ ছিলো , আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিলো—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এতোবড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিলো। সে দৃষ্টির অর্থ কী সাতু তাহা বুঝিলো না—সে বুঝিলো না যে, দু-জনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের, অনভ্যস্ত আত্মা যেন এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিয়াছে—পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্ছিতার বিহ্বল দৃষ্টি— নিঃশব্দ আর্তনাদ··

সাতু হাসিতে লাগিলো, বলিলো—'বড়োই অভিমান যে ! ডাকছি, তা আসা হচ্ছে না ! ঢঙ দেখলাম বিস্তর। নেও হয়েছে, এসো এখন, না আমাকেই উঠতে হবে !'

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোঁক গিলিলো—তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া সর্বাঙ্গ যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে···

সাতু উঠিতে-উঠিতে বলিলো, উঃ।—বলিয়া বিরক্তি আর শ্লেষ প্রকাশ করিয়া সে উঠিলো।

মাখন কেবল সরিয়া-সরিয়া যাইতে লাগিলো—কোথায় সে যাইতে চায় সে জ্ঞান তাহার নাই, যাইবার স্থান নাই। তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়া সে কেবল সরিয়া দেয়ালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ করিয়া সে চলিয়াছে—তাহাব স্থূল অবয়ব কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তাহার পিঠের চামড়া কাটিয়া গেলো।

সাতু অগ্রসব হইয়া আসিতেছে—

তাহার স্পর্শটা আসিয়া মাখনের সর্বশরীরে যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিদ্ধ হইতে লাগিলো···

কিন্তু দেহ-সংকোচনের অবকাশ আর নাই—পরমুহূর্তেই তার সঙ্কুচিত আড়ষ্ট সর্বাবয়বে যেন রুদ্ধ বায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিলো—সর্বান্তঃকরণ বিদ্যুতের আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল···

সাতু তাহা দেখিলো—এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই ; কিন্তু সাতু

তাহা গ্রাহ্য করিলো না; তা করিবার মতো মন তাহার হইলে সে জেলে যাইতো না। বলিলো, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, এবটা কথা আছে না? অমন ক'রে চাইলে কী হবে! আমার—'

বলিতে-বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থমকিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গিটি বড়ো অসাধারণ—তাহার উদ্দেশ্য যেন শুধু আত্মরক্ষা নয়, তাহার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতোই দুর্জয় হউক, আর এখানে-সেখানে সে যতোই ভুল করুক, এবার সে ভুল করিলো না, আর, ভয় পাইলো; হটিয়া আসিয়া বলিলো, 'মারবে নাকি?'

মাখন বলিলো, 'আমায় ছুঁয়ো না।'

'যদি ছুঁই?'

'ভালো হবে না।'

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিলো—

নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইলো, তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তাহার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে—আঁচলে তা ঢাকা আছে।

সাতু ফিরিলো; প্রাণভয়ে পলাইবার মতো করিয়া ছুটিয়া যাইয়া দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিলো, 'মা?'

বিরাজ অবশ্য তখন জাগিয়াই ছিলেন—একডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুলকণ্ঠ কানে বাজিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—'কী রে? কী হ'লো রে?'—বলিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিতে-করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিলো, 'বউকে বের ক'রে আনো; ও-ঘরে আমি যাবো না। মারবে বলছে।'

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন: 'মারবে বলছে?'

'তা পারে। ওর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখ—ছুরি-ছোরা বোধহয় ওর কাছে আছে।'

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বড়ো কষ্টে দীর্ঘ দিন তাঁহার কাটিয়াছে; উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া-পড়িয়া অবিরাম ঝমঝম করিয়া বাজিয়াছে, শ্রান্ত শক্তিহীন হইয়া গেছে, ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই ভালো লাগে নাই; তাহার উপর, এই বধূরই পিছনে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিরক্তিতে আর বধূর অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাঁহার রক্ত তখনো ফুটিতেছিল…

এখন ছুরি লইয়া সেই বধূ তাঁহার পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচমকা এই খবর পাইয়া তাঁহার মাথার হাড় পর্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিলো—

'কই ?' বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশে ধাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ—হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় বুঝিবার হুঁশ লোপ পাইয়া গেছে...

চোখে পড়িলো, বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁহার চোখে পড়িলো না; ছোবা-ছুরির ভয়ও তিনি করিলেন না, লাফাইয়া যাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন, ঘাডে ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান পার কবিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন—

বলিলেন, 'যা চুলায়।' বলিয়া ঘাডে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর খিল আঁটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপরে সতীশের কানে গেলো খিলের শব্দটা, জিজ্ঞাসা করিলো, 'সদর দরজা কে খুলেছে ?'

সাতু উত্তব করিলো,—'মা'।—তারপর অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিলো, 'জেলই আমার ছিলো ভালো।'

———

## আঠারো কলার একটি

নাচনসাহা গ্রামনিবাসী বেণুকর মণ্ডলের কয়েক বিঘা জমি আছে, তা চষবার লাঙল এবং লাঙল টানবার বলদ আছে, কারো কাছে কিছু পাওনা আছে, কারো কাছে কিছু ঋণ আছে, গৃহ-সংলগ্ন খানিক পতিত জায়গা আছে—সেখানে বাসি-উনুনের ছাই ঢালা হয়; স্তূপীকৃত ছাই বিছিয়ে দেয় আর মাটি খুঁড়ে শাক জন্মানো হয়—এটুকু শখ বেণুকরের আছে...

এ-সব ছাডা তার স্ত্রী আছে, জানকী, আর আছে মনে একটা ক্ষোভ। আর কেউ নেই, আর কিছু নেই!

বেণুকরের রূপও কিছু আছে, তবে জাঁকালো তেমন নয় এবং বুদ্ধিও কিছু আছে, তবে ধারালো তেমন নয়—তবে কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং দেনা-পাওনার হিশাবে তার ভুল হয় না।

আবার এও উল্লেখযোগ্য যে, একটা দোষ তার আছে—ভোরে তার ঘুম ভাঙে না, রোদ উঠলে ভাঙে।

বেণুকরের বয়স এই ছাব্বিশ চলছে—স্ত্রী জানকীর বয়স এই উনিশ। চার বছর হ'লো তারা বিবাহিত হয়েছে।

বিবাহিত জীবনের চার বছর সময়টা কম নয়—

মুহূর্তের পর মুহূর্ত অতীত হ'য়ে খুব ধীরে-ধীরে সময়টা কাটছে।

সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, বেণুকরের সম্ভোগের ধারণায় একটা পরিচ্ছন্নতা আর আকাঙ্ক্ষায় একটা স্থৈর্য এসেছে। ভূষণহীন আটপৌরে অবস্থায় এসে জীবনের বহিরবয়বটা নিস্তরঙ্গ হ'য়ে চার বছর বিবাহিত জীবন যাপন করা হ'লো দেখে এমন একটা ধীরতা আর সন্তোষ মানুষের কাছে মানুষ আশা করে; কিন্তু এটা করে পরের বেলায়, নিজের কথা নিজের মন জানে। পারিবারিক শ্রান্তি ও জড়তাকে সংযম মনে ক'রে মানুষ নিজের বেলায় ঐ ভুলটি করে—করতে বাধ্য হয়…

কিন্তু মনের ভিতরটা আকুল হ'য়ে নিঃশব্দে ছটফট করলে তার বিরুদ্ধে বাধাটা কী!

বলতে কি, বেণুকর মণ্ডল আকুল হ'য়েই থাকে এবং তার মনে একটি ক্ষোভ আছে।

বেণুকরের এই ক্ষোভের জন্ম কোথায় অনুসন্ধান করতে গেলে এই নিদারুণ সত্য বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে, তারা চার বছর হ'লো বিবাহিত হয়েছে এবং অল্পায়ু মানুষের পক্ষে চারটি বছর খুবই দীর্ঘ সময়। সুতরাং খুবই দীর্ঘ চারটি বছরের অবিরাম সাহচর্যবশত স্ত্রীর ভঙ্গি আর গঠন যদি চোখের সামনে পুরোনো হ'য়ে উঠতে থাকে তবে উপায় কী! প্রতিরোধ করবার উপায় মানুষ খোঁজে, কিন্তু পায় না। এই নিরুপায় অবস্থাটা বড়োই লোভের সৃষ্টি করে—বেণুকরের তাই করেছে।

জানকীর বয়স এই উনিশ। তার বয়স যখন পনেরো ছিলো তখন হ'তে চার বছর ধ'রে উঠতে-বসতে অষ্টপ্রহরের সঙ্গিনী রূপে স্বামী বেণুকরের জীবনে সে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে—কেবল ভাবের দিক দিয়ে নয়, কাজে-কর্মেও। জানকী চাষের কাজে, বলদ পালনে, শাক উৎপাদনে অনুকম্পা আর সহযোগিতা ক'রে বেণুকরকে মুগ্ধ করেছে;

কিন্তু এই ক্রমাগত সহযোগিতার ফলেই যদি পনেরো বছরের স্ত্রীকে, চার বছর পরে উনিশ বছরে একটু স্তিমিত আর দূরবর্তী ব'লে বেণুকরের মনে হয় তবে

তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে—সেটা তার অনন্যসাধারণ বিকৃত মনের অপরাধ না-ও হ'তে পারে। মানুষ মাত্রেই মনে-মনে স্বভাবতই অধার্মিক এবং মানুষ মাত্রেরই স্নায়ুরোগ ভিতরে থাকেই—এটাই তার কারণ। পনেরো বছরের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হ'য়ে উনিশ বছরে উপনীত হ'তে যে-সময়টা কেটেছে তা আয়ুকে ক্ষয় করেছে, কিছু দান করেছে, কিছু অপহরণ করেছে—বেণুকর তা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু মদিরায় অজানা জিনিশের ভেজাল মিশিয়ে তাকে হীনবল ক'রে দিয়েছে এইটাই বড়ো সাংঘাতিক—বেণুকরের মনে ওতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের এই ক্ষোভটি সাংঘাতিক এবং তা না জন্মালে যৌবনের ওপর নূতন-নূতন সজ্জা প্রসাধনের প্রয়োজন হ'তো না—কটাক্ষ-কৌশল বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো। তার ওপর, এই চার বছর ধ'রে যে যৌবনোদ্দামতাকে একমাত্র জানকীরই নিজস্ব শক্তি, অর্থাৎ টেনে রাখবার কলাময় রজ্জু ব'লে বেণুকরের মনে হ'তো, তা যেন এখন আর হয় না। বেণুকরের মনে ক্ষোভ আছে বলা হয়েছে, সেই ক্ষোভের উৎপত্তি ঐখানে। জানকীর রক্তাধর আর শুভ্র দশন তেমনি চমৎকারই আছে—দেহের নিবিড়তাও তেমনি অশেষ—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আর এমন কিছুরই উদ্ভাবন সেখানে নেই যাব নাম দেওয়া যায় লীলাময়িত্ব, আর যা তাকে নিত্যই নূতন ক'রে তুলবে এবং বেণুকরের লুব্ধতা আর প্রীতি আর আকর্ষণ এবং তারপরে তৃপ্তির আর অন্ত থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই কথাটাই যে, স্ত্রীর পক্ষ হ'তে মানসিক একটা সৃজনলীলা—রূপের পর রূপের আবর্তন আর রসের অন্তে রসের উদ্ভব দেখবার জন্য লাঙল আর বলদের মালিক চাষী গৃহস্থ বেণুকর মোড়ল লালায়িত হ'য়ে উঠেছে। তার মনে হয়, দূর, একঘেয়ে আর ভালো লাগে না।—

জানকী রাঁধে যেমন সুন্দর, গোছালোও তেমনি, আর দ্রুত কাজ সারতেও তেমনি পটু। সে জানে সবই—সূচ হাঁটিয়ে ছেঁড়া কাপড় সূক্ষ্মভাবে রিপু করতে যেমন জানে, তেমনি জানে ঢেঁকি পাড়িয়ে চাল, চিঁড়ে প্রস্তুত করতে; কিন্তু জানে না যে, বস্তু হিশেবে তার স্বকীয়তা এবং দর একটু ক'মে এসেছে—

আজ হঠাৎ তা জানা গেলো।

ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালবার পর কিছুক্ষণ গৃহস্থ বধূর হাতে কাজ থাকে না। চারদিকে তখন শাঁখ, ঘণ্টা বাজতে থাকে। মানুষ যখন বর্বর ছিলো—বাসস্থানকে সুরক্ষিত করতে শেখেনি, সন্ধ্যাকে বন্য জন্তুর ভয়ে ভয়ঙ্কর মনে হ'য়ে তখন ঐ প্রচুর ধাতব শব্দ উৎপন্ন করবার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু এখন বাজে আরতির সময় মন্দিরে। সে যাই হোক, এই সময়টা বিরামের সময়।

বেণুকরের গৃহেও এই সময়ে কর্মবিরতি দেখা দিয়েছে—ব'সে-ব'সে নিবিষ্টভাবে হুঁকো টানছে আর জানকী অদূরে পা মেলে ব'সে—উভয়েই নীরব হুঁকো টানতে-টানতে প্রদোষ অথচ শুভ এই সময়ে বেণুকরের দৈবাৎ মনে হ'লো, জীবনের মধুস্বাদে যে-অপরিমেয় নিবিড়তা ছিলো তা যেন আর নেই—তৃষ্ণা যেন নিঃশেষ হ'য়ে মিটছে না—কে যেন দ্রাক্ষারসে জল ঢেলে দিয়েছে।·· তার পূর্বোক্ত ক্ষোভটা অকস্মাৎ পূর্ণবেগে জেগে উঠলো।

হুঁকো টানা বন্ধ ক'রে বেণুকর আকাশের দিকে তাকালো—সেখানে কিছুই ছিলো না, কিছুই তার চোখে পড়লো না। তেল ফুরিয়ে দীপের শিখা যখন নিবে আসে তখন একটা নিঃশব্দ হাহাকার যেন কোথায় ওঠে, মনে কি শিখায় তার ঠিক নেই···তেমনি একটা পরাজিত অশক্তের শোকের ছায়া যেন আকাশে রয়েছে, কিন্তু বেণুকর মণ্ডলের সে-চোখ নেই যে-চোখে আকাশের বর্ণ, ভাষা, গতি সচেতনভাবে প্রতিফলিত হয়। তবু সে খানিকক্ষণ আকাশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো···তারপর সে চোখ নামিয়ে তাকালো স্ত্রী জানকীর দিকে—তাকিয়ে মলিনভাবে একটু হাসলো, যেন একটা উদ্বেগ সে গোপন করতে চায়।

জানকী স্বামীর চোখের ওঠা-নামা লক্ষ করেছিল, জিগগেশ করলো, 'কী ?'

বেণুকর বলল, 'কিছু না। তবে শুধোচ্ছিলাম একটা কথা।'

মিষ্ট কণ্ঠে জানকী বললো, 'বলো শুনি।'

বেণুকর আবার একটু হাসলো। তার ধারণা, হাসির দ্বারা তার পশ্চাদ্বর্তী কথার পথ সুগম হচ্ছে। তারপর বললো, 'শুনি, মেয়েমানুষের আঠারো কলা—সত্যি নাকি ?'

বক্তা কী বলতে চায় তা জানকী তৎক্ষণাৎ বুঝলো, বললো, 'সত্যি নয়। কলা আঠারো তো নয়ই, তার ঢের বেশি—কেউ বলে ছত্রিশ, কেউ বলে চুয়ান্ন।'

দেখা গেলো, জানকী একদা যে কুড়ির ঘর পর্যন্ত নামতা কণ্ঠস্থ করেছিল তা সে বিস্মৃত হয়নি। বেণুকর বিস্মিত হ'লো, কয়েকবার হুঁকো টেনে বললো, 'এতো ? কিন্তু তোর তো তার একটাও দেখিনে !'

'তা আশ্চর্য কি এমন। দেখাইনে তাই দেখো না।'

বেণুকর চুপ ক'রে রইলো। একটা মানুষ যা দেখাতে পারে কিন্তু দেখায় না, সেটাকে দেখাও ব'লে তার কাছে আবদার করা যেতে পারে ; কিন্তু আবদার ক'রে, আদায় করার মতো জিনিশ স্ত্রীলোকের কলা নয়—সংখ্যায় তা যতোই হোক।

জানকী জিগগেশ করলো, 'কার ঢঙ দেখে ভালো লেগেছে ? না কেউ সুর

ধরিয়ে দিয়েছে ?'

বেণুকর বললো 'তা সব কিছু নয়। অমনি মনে হ'লো, বললাম।'

'দেখবে ?'

বেণুকর এবার লজ্জা পেলো। মনে-মনে যার অভাব অনুভব ক'রে বেণুকর তৃষিত হ'যে উঠেছিল, সেই জিনিশটা দিতে চাইতেই ব্যাপার কেমন বেখাপ্পা হ'য়ে উঠলো। উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে ব'লে যে-দান অমূল্য ক'রে পাওয়া হয, তা জানিয়ে-শুনিয়ে দিতে গেলে ভালো লাগে না—কেমন লাগে তা ভাবাই যায় না।

বেণুকর হুঁকো রেখে মুখ নামিয়ে রইলো—

জানকী বললো, 'চাষার ঘরে কলা। আচ্ছা দেখাবো।'

শুনে বেণুকর খুব অপদস্থ হ'য়ে মুখ ফিরিযে প্রস্থান করলো।

বৈশাখের শেষ। বৃষ্টিতে মাটি একটু ভিজলেই চাষের কাজ শুরু করা যায়, কিন্তু মেঘের দেখা নেই। বৃষ্টির অভাব দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হ'যে উঠেছে—এমন সময় দেবতা একদিন দয়া করলেন—তুমুল গর্জন ক'রে একদিন বিকালে মেঘবারি বর্ষণ করলো। জল প্রচুর নয়, তবে সূত্রপাত হিশেবে আশাপ্রদ—কৃষিজীবীরা আনন্দিত হ'য়ে উঠলো—মাঠে এবার লাঙল চলবে।

বেণুকর বললো, 'যাক বৃষ্টি তো হ'লো।'

জানকী বললো, 'এবার আমায় ছেড়ে বলদের আদর হবে।'

বেণুকর বললো, 'ধ্যেৎ।'

স্বর খানিক তিক্ত ক'রে জানকী বললো, 'ধ্যেৎ কেন ?'

তারপর মনের কথাটা চেপে বললে, 'কালই মাঠে বেরুতে হবে তো।'

'হবেই তো।'

'আগে চষবে কোন মাঠটা ?'

চার বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার ফলে জানকী তাদের সব জমিই চেনে।

বেণুকর বললো, 'পুবের মাঠে তিন কিত্তে এক লাগাও—তাতেই হাত দেবো আগে। দু-দিন লাগবে। দক্ষিণ দিকটা নামো—কাজেই উত্তর থেকে লাঙল দিতে হবে। তবে তাড়াতাড়ি তেমন নেই।' ব'লে ক্ষেত্রকর্ষণের ব্যবস্থা ক'রে বেণুকর আকাশের দিকে চাইলো—আকাশে মেঘের আনাগোনা রয়েছে।

পরদিন প্রত্যুষে নয়, সকাল বেলা, রোদ ওঠবার পর গুড়-মুড়ি আর জল খেয়ে বেণুকর লাঙল আর বলদ নিয়ে, আর হুঁকো আর কলকে প্রভৃতি নিয়ে

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মাঠের উদ্দেশে বেরুচ্ছে এমন সময় জানকী পিছু ডাকলো ; বললো, 'টানাকাঠির বাক্‌শো নিয়েছো ?'

বেণুকর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'এঃ, প্রথম দিনটাতেই পিছু ডেকে ফেললি ! নিয়েছি।'

জানকী বললো, 'ঘরের যুবতী বউ পিছু ডাকলে ভালো হয়।'

বেণুকর বললো, 'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ কেন ?' তারপর জানকী বললো, 'কাঠির বাক্‌শো মাটিতে নামিয়ে রেখো না, ভিজে উঠবে।'

বেণুকর বললো, 'বেশ।' ব'লে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু সেদিন দু-কিতার বেশি জমিতে লাঙল দেওয়া সম্ভব হ'লো না—রোদের তেজ খুব, আর অতিরিক্ত রোদ সহ্য ক'রে, তাড়াতাড়ি করবার দরকারও তেমন নেই।

খেতে ব'সে বেণুকর বললো, 'দক্ষিণের খানা বাকি রইলো ; কাল ওটা হ'লেই ও মাঠটা শেষ হয়।'

পরদিন সকালবেলা বেণুকর আবার মাঠে যাবে ; কিন্তু তার আগে অর্থাৎ খুব ভোরে জানকীকে শয্যা ত্যাগ করতে দেখা গেলো এবং তারপর আরও দেখা গেলো, ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি আর ধারালো একটা খুরপি নিয়ে সে পুবের মাঠের দিকে ছুটছে …

চাষের কাজে সে অবশ্যই যায়নি—গিয়েছে অন্য কাজে।—

সকালবেলা, সূর্যোদয়ের খানিক পরে, গুড়-মুড়ি আর জল খেয়ে বেণুকর আগের মতো মাঠে লাঙল দিতে এসেছে। রাত্রির গরমের পর গ্রীষ্মের প্রাতঃকাল ভারি স্নিগ্ধ লাগায় বেণুকর সানন্দে লাঙলে বলদ জুড়লো। পাচনখানা বাগিয়ে ধ'রে সে আল ছেড়ে খেতে নামলো…

বলদ তার আদেশ বোঝে—চলে থামে তার কথায়। তার আদেশে বলদযুগল লাঙল টেনে চলতে শুরু করলো…চতুষ্কোণ ক্ষেত্র বেড়ে লাঙল মন্থর গতিতে চলতে লাগলো… লাঙলের জোরে নিচেকার শুষ্ক মাটি পিণ্ডের আকারে উৎপাটিত আর স্বতন্ত্র হ'য়ে লাঙলের ফালে খনিত মৃত্তিকার দু-পাশে যেন গজিয়ে উঠতে লাগলো…দেখতে ভারি আরাম, যেন অপরূপ নূতন কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে ! বেণুকরের কৃষি-স্ফূর্তি বেড়ে গেলো।

কিন্তু তার কৃষি-স্ফূর্তি স্থায়ী হ'লো না। লাঙল দু-বার ক্ষেত্রের চারকোণ বেড় ঘুরে এসে তৃতীয়বারের মাঝামাঝি আসতেই উন্মূলিত মাটির দিকে চেয়ে

বেণুকর বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হ'য়ে রইলো...মাটি কেটে আর মাটি ওলোটপালোট ক'রেই লাঙল এই পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু ঠিক এই স্থানটিতে লাঙল কেবল নীচের মাটিই উপরে তোলেনি, মাটির নীচ থেকে আরো কিছু তুলেছে...লাঙলের ফালে আধ হাত আড়াই পোয়া মাটির ভেতর থেকে উঠেছে, ফুল নয়, ফল নয়, শস্য নয়, শামুক নয়, কচ্ছপের ডিমও নয়, টাকার ঘটিও নয়, জীবন্ত একটি মাগুর মাছ! কৃষিজীবী বেণুকর মণ্ডল কৃষিকর্ম, বলদ, লাঙল, খেত, খামার, ধান, কলাই, বৃষ্টি, বৈশাখ, ছায়া, রৌদ্র প্রভৃতি সমুদয় বিস্মৃত হ'য়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো মাগুর মাছটির দিকে – অপূর্ব আবির্ভাব তা...দেড় পোয়া সাত ছটাক ওজনের জলবাসী মাছ মাটির ভিতরেও কেমন তরতাজা বলিষ্ঠ ছিলো। কাৎ হ'য়ে কানে হেঁটে মাছটি খোঁড়া মাটির গুঁড়ো আর ঢেলার ভেতর দিয়েই চলবার চেষ্টা করছে!

মাগুরটির দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থেকে-থেকে বিস্ময়ের পর বেণুকরের মনে জন্মালো অনন্ত আনন্দ। এরই নাম অদৃষ্ট—ঈশ্বর যদি দেন তো ছাপ্পর ফুঁড়েই দেন, কথাটা সত্যি; কিন্তু তার চাইতেও কল্যাণের কথা এই যে, ঈশ্বর যদি দেন তো মাটির ভিতর সজীব মাগুর মাছ রেখে দেন! ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মানুষের প্রতিদিনের আহার ব্যাপারের দিকেও ব্রহ্মাণ্ডপতির কেমন নজর দেখো! তুচ্ছ বেণুকর আহার করবে ব'লে স্নেহবশত তিনি কী আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটিয়েছেন!

লাঙল, বলদ এবং হুঁকো-কলকে মাঠে রেখেই বেণুকর মাগুর মাছের মাথা আঙুলে চেপে ধ'রে আর স্নেহময় ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতি কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হ'য়ে বাড়ির দিকে দৌড়লো...

জানকী হয়তো বৈশাখের অখাদ্য বেগুন ভাজবার আর বড়ি-পোস্ত করবার আলু-কুমড়োর টক রাঁধবার কথা ভাবছে। আজ আর সে-সব কিছু নয়—আজ খালি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত—আর কিছু নয়। মাগুর মাছের মাথার চাইতে লেজই মিষ্ট বেশি...

পথে দেখা রাজীব হাজরার সঙ্গে—রাজীবের ইচ্ছা হ'লো, দাঁড়িয়ে দুটি কথা কয়, আর, মাটি-মাখা মাগুর মাছ হাতে ক'রে বেণুকরের বাড়ির দিকে দৌড়োবার কারণটা কী তা জিজ্ঞাসা করে! কিন্তু বেণুকর থামলো না—

'পেয়ে গেলাম দৈবাৎ—'ব'লে রাজীবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাব দিয়ে সে তেমনি দ্রুতপদে অগ্রসর হ'য়ে গেলো।

পিছনে দুপদাপ শব্দ শুনে জানকী ঝাঁটা থামিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো—সে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিলো। চেয়ে দেখলো, স্বামী অসময়ে বাড়ি এসেছেন, হাতে

তাঁর তাজা মাগুর মাছ. আর মুখময় হাসি।

'শোন এক তাজ্জব ব্যাপার!' ব'লে শুরু ক'রে বেণুকর মৎস্যপ্রাপ্তির ইতিহাস বললো…পরিশিষ্টে নীতি-হিশেবে সে এটাও বললো যে ঈশ্বর যখন দেন তখন শুক্‌নো মাটির ভিতর মাগুর মাছ রেখে দেন—খাওয়াবার উদ্দেশ্যে।…তারপর অধিকতর পলকের সঙ্গে বললো, 'নে মাছ রাখ্। এই মাছের ঝোল আর ভাত. আর কিছু না আজ।'

আদ্যন্ত শুনে জানকী প্রশ্ন করলো. 'মাছ কোথায় পেলে গো? দিব্যি মাছটি তো!'

প্রশ্নের জবাবে কথার সুরে আদর ঢেলে বেণুকর বললো, 'শুনলি কী তবে এতোক্ষণ। মাঠে লাঙল দিচ্ছি—হঠাৎ দেখি, মাটির ভেতর থেকে উঠেছে লাঙলের মাটির সঙ্গে এই মাছ!' ব'লে সে চোখ বড়ো ক'রে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু জানকী এই কথা শুনে বললো, 'মিছে কথা।'

'মিছে কথা! তোর দিব্যি, ভগবানের দিব্যি।'

'তবে রাখো এই হাঁড়ির ভেতর—খানিক জল দিয়ে রাখো।'

হাঁড়ির ভেতর জল দিয়ে মাগুর মাছ তখনকার মতো জিয়িয়ে রাখা হ'লো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরম সহানুভূতির সঙ্গে। জল পেয়ে মাছ ক্রীড়াশীল হ'য়ে উঠেছে—সেই দিকে তাকিয়ে বেণুকর বললো, 'আজ এই মাছের ঝোল আর ভাত খাবো। সকাল-সকাল ফিরবো মাঠ থেকে।' ব'লে বেণুকর মাঠের উদ্দেশে ফিরে দাঁড়ালো—

যেতে-যেতে দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে বললো, 'কী অদেষ্ট দেখ্।'

জানকী বললো, 'হুঁ।'

জানকীর সকাল-সকাল রান্না শেষ হয়েছে। বেণুকরও সকাল-সকাল মাঠ হ'তে ফিরেছে।—বললো, 'চান করতে চললাম। ভাত বাড়ো।'

জানকী বললো, 'বেশ এসো গে।'

মাগুর মাছের ঝোল খাবার ব্যগ্রতায় বেণুকর ষোলো আনা আরাম আদায় ক'রে স্নান করতে পারলো না—পুকুরের জলে তাড়াতাড়ি, দুটো ডুব দিয়ে সে উঠে পড়লো…

তার ফিরবার সাড়া পেয়ে জানকী জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাত বাড়বো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ কাপড় ছাড়ছি।'

কাপড় ছেড়ে এসে বেণুকর পিঁড়িতে বসলো; বললো, 'আন্ দেখি।'

জানকী থালায় দিলো ভাত আর বাটিতে দিলো ঝোল।

বেণুকর ঝোলের দিকে চেয়ে বললো, 'আবার হিঞ্চের ঝোল করেছিস কেন? তোর বড়ো রান্নার শখ।'

জানকী প্রশংসা পেয়েও কথা কইলো না—

বেণুকর শাকের ঝোল মেখে বাড়া-ভাতের চা'র ভাগের এক ভাগ খেয়ে তিন ভাগ রেখে দিলো মাগুর মাছের ঝোলের জন্য। বললো, 'মাছ দে।'

মাঠের মাটির ভেতর মাগুর মাছ পেয়ে বেণুকর যতোই বিস্মিত হোক্, দিশেহারা হয়নি—সে-বিস্ময়ের অন্ত ছিলো, তাতে তার মস্তিষ্কের পরিস্থিতি একেবারে নষ্ট হয় নি, কিন্তু মাছ চাওয়ার পর জানকীর কথায় তার যে বিস্ময় জন্মালো সে-বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা মাপ-পরিমাপ ওজন-আধার কিছুই যেন নেই ··তা এতোই বেশি। জানকী স্পষ্ট বললো, 'মাছ কোথায় পাবো?'

বেণুকর জন্মাবধি ঠাট্টা বোঝে না, বুঝলে কথাটকে ঠাট্টা মনে করতে পারতো—বিস্ময় দুঃসহ হ'য়ে তার মাথা এমন ঘুরে উঠতো না।

শরীর খাড়া ক'রে বেণুকর বললো, 'মাছ কোথায় পাবি? যে-মাছ এনে দিলাম তখন, তা কী হলো?'

'মাছ তুমি কখন আনলে?'

'মাছ আমি কখন আনলাম? মাছ আনিনি? কুকুর-বেড়াল দিয়ে খাইয়েছিস বুঝি?'

'নেও, এখন থামো। আর একটু শাক-ঝোল দেই, খেয়ে ফেলো ভাত ক'টি। আর খ্যাপামি ক'রো না মাছ-মাছ ক'রে।'

'খ্যাপামি করবো না মাছ-মাছ ক'রে? দে বলছি মাছের ঝোল শিগগির, নইলে ভালো হবে না।' ব'লে বেণুকর চোখ দুটো এমন লাল ক'রে তুললো যে, তার সম্মুখে প্রতিবাদ আর না চলবারই কথা।

কিন্তু জানকী বললো, 'মন্দই বা কী করতে পারো মিছিমিছি?'

'মন্দই বা কী করতে পারি মিছিমিছি? এখনো বলছি ভালো-ভাবে—রাগাস্ নে বেশি

'মাছ কোথায় পাবো যে তোমায় ঝোল বেঁধে খাওয়াবো? কী মুশকিলেই ফেললে তুমি আমাকে।'

'কী মুশকিলেই ফেললাম তোকে? তবে দেখ্ মুশকিল কাকে বলে।' ব'লে বেণুকর এঁটো হাত বাড়িয়ে জানকীর চুল ধরতে যেতেই, তাতেই স্বামীর সেই যৎসামান্য প্রচেষ্টাতেই, ভয় পেয়ে জানকী এমন চিৎকার করলো যে, বেণুকরই চমকিয়ে হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আশেপাশে অনেক লোক বাস করে—

বিপন্না প্রতিবেশিনীর আর্তনাদ শুনে তাদের তিন-চার জন দৌড়ে এলো···

'মোড়ল রয়েছো? কী হ'লো ম'ল্যান?'—প্রবীণ নধরগোপাল চৌধুরী উঠোন হ'তে প্রশ্ন ক'রে এগুতে লাগলো।

নন্দগোপাল চৌধুরী উকিলের মুহুরি ছিলো। ৺বৃত্তির পয়সা চুরি ক'রে একবার এবং উকিলের টাকার হিশেব মিলোতে না পেরেও চোখ গরম করায় আর-একবার মার খেয়ে গ্রামে এসে বসেছে। নধরের এক ছেলে কলকাতায় এক দোকানে বেচা-কেনার কাজ করে। ভয়ঙ্কর আদালতের ভয়াবহ জটিল সব ব্যাপার তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার, এই জন্যে এবং ছেলের মারফৎ কলকাতার আভিজাত্যের সঙ্গে সংযুক্ত ব'লে নধরের গ্রামে প্রতিপত্তি খুব—বিবাদের মীমাংসায় কর্তা সাজতে তার যেমন আনন্দ, তেমন আর কিছুতেই নয়···

এই নধর চৌধুরী বেণুকর এবং জানকীকে প্রশ্ন ক'রে জানতে চেয়েছে ব্যাপার কী—

কিন্তু রান্নাঘরের ভেতর থেকে বেণুকরের কোনো জবাব আসলো না—জবাব দিলো জানকী। বললো: 'আমাকে অনর্থক মারতে উঠেছে।'

'কেন?' ব'লে নধর চৌধুরী প্রভৃতি—বেণুকরের রান্নাঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো···

জানকী মাথার কাপড় একটু টেনে দিলো; বললো, 'শোনো তোমরা ওকে শুধিয়ে। কী বলছে সব আবোল-তাবোল মাছ-মাছ ক'রে।'

বেণুকর বললো, 'কী বলছি সব আবোল-তাবোল মাছ-মাছ ক'রে?··· শোনো নধর-দা; সক্কাল বেলা গেলুম মাঠে লাঙল দিতে। দু-বেড় চষতেই দেখি, একটা মাগুর মাছ, এতোবড়ো তাজা মাগুরটা—মাটির ভিতর থেকে উঠে পড়েছে।'

বিবাদের বিষয়ের জটিলতা দেখে নধর পুলকিত হ'লো; বললো, 'আচ্ছা। মাটির ভেতর মাগুর মাছ! তারপর?' বলতেই তার দৃষ্টি বিচারকের দৃষ্টির মতো সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠলো।

বাদী বেণুকর বলতে লাগলো, 'ছুটে এলুম ঘরে। বললাম, এই মাছের ঝোল আর ভাত খাবো আজ—রাঁধ ভালো ক'রে। ব'লে মাছ ঐ হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে গেলুম আবার মাঠে।···চান ক'রে খেতে বসলুম—দিলো হিঞ্চে শাকের ঝোল খালি। রাগ হয় না মানুষের?'

প্রতিবাদিনী জানকী বললো, 'শুনলে লোকের কথা। মাছ নাকি এনে দিয়েছে।'

বিচারক নধর চৌধুরী উভয় পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ শুনে বললো, 'বেণু, ভাই, ঠাণ্ডা হও। মাঠের জল শুকিয়েছে কার্তিক মাসে। এটা হচ্ছে গিয়ে বোশেখ। মাটির ভেতর মাগুর মাছ তো তাজা কি মরা কোনো অবস্থাতেই থাকতে পারে না।'

'বললেই হ'লো থাকতে পারে না। আমি দেখলাম, পেলাম, হাতে ক'রে বাড়ি নিয়ে এলাম—আর তুমি পঞ্চায়েতি ক'রে ব'লে দিলে আন্দাজের ওপর, থাকতে পারে না।'

সকলে হাসতে লাগলো। কালীপদ বললো, 'মাথা বিগড়েছে।'

জানকী বললো, 'সেই মাছের ঝোল রাঁধিনি ব'লে আমায় মারতে উঠেছে।'

'মারবোই তো।' ব'লে বেণুকর পুনরায় রুখে উঠতেই কালীপদ প্রভৃতি রান্নাঘরে ঢুকে তাকে ধ'রে ফেললো।

নধর চৌধুরী বললো, 'অকারণে মার-ধোর ক'রো না, বাপু! মাছ তুমি পাওনি! অসম্ভব কথা বললে চলবে কেন? আদালতে এ-কথা টিঁকবে না। · দেখি চোখ।' ব'লে নজর ক'রে বেণুকরের চোখ দেখে নধর চৌধুরী বললো, 'লাল হয়েছে।'

গুণময় পাল বললো, 'শুনছো, বেণুকর, হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় একটু ব'সো।—এখুনি সেরে যাবে। বোশেখের রোদ হঠাৎ মাথায় লাগলে চোখে অমন সব ভ্রম লোকে দেখে। সে-বার আমারই হয়েছিল অমনি। মাঠ থেকে ফিরছি ঠিক দুপুরবেলা লাঙল আর গোরু দুটো নিয়ে, কিন্তু মনে হচ্ছে, গোরু যেন দুটো নয়, চারটে।' বলতে-বলতে গুণময়ই ঘটিতে ক'রে জল এনে বেণুকরের হাত ধুয়ে তাকে ঠাণ্ডা জায়গায় বসিয়ে দিলো, জানকীকে বললো, 'ভয় নেই, ভালো হ'য়ে যাবে।'

বেণুকর একবারে নিরে শেষ হ'য়ে গেলো—তার তখন প্রায় অচেতন অবস্থা···

বারান্দায় সে ঘাড় গুঁজে ব'সে রইলো—হাত নেড়ে জানালো, তোমরা এখন যাও।

প্রতিবেশীগণ বেরিয়ে গেলো—

হিতসাধকগণের অগ্রণী নধর চৌধুরী ব'লে গেলো, 'আর যেন চেঁচামেচি শুনিনে।'

খানিক চুপ ক'রে থেকে জানকী একটু হাসলো ; তারপর বললো, 'আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না ! এ তারই একটি।...রাগ ক'রো না, তোমার পায়ে ধরি।' ব'লে জানকী সত্যই স্বামীর পা ধ'রে বললো, 'মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দি'গে।'

বেণুকর উঠে খেতে গেলো, কিন্তু রাগের জ্বালায় কথা কইলো না।

———